

# ସମାଜତନ୍ତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାମ୍ଭବବାଦ

ଅନିଲ ରାୟ

মূল্য ২।।০ টাকা

Printed & Published by S. C. Ghosh,  
Presidency Printing Works, Dacca.

## ভূমিকা

মার্ক্সবাদ পড়িবার ও বুঝিবার জন্য একখানা 'হাণ্ডবুক' হিসাবে এই বইখানা প্রকাশিত হইল।

দন্ডম্ জেলে ১৯৪২ সনে কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল রাজ-বন্দীদের মধ্যে। অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু 'ভারতীয় সভ্যতা' সম্বন্ধে, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন 'বাংলা সাহিত্য' সম্বন্ধে, শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 'পার্লামেন্টারী রীতিনীতি' সম্বন্ধে এবং লেখক 'মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্র' সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

দন্ডম্ জেলে সেই সকল আলোচনা-সভার লেখকের প্রদত্ত বক্তৃতার নোট হইতে এই বইয়ের উদ্ভব হইয়াছে। মার্ক্সবাদ একটা জীবনদর্শন এবং তাহার সকল দিকের যথাযথ আলোচনা করিতে হইলে একখানা বিস্তৃত পুঁথি লেখার দরকার হইয়া পড়ে। বর্তমানে তাহা সম্ভব নয়, তাই সম্প্রতি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাই পুস্তকাকারে বন্ধুদের অনুরোধে প্রকাশ করা হইল। জেলখানায় প্রয়োজনমত বইপত্র পাওয়া অসম্ভব এবং তজ্জনিত অসম্পূর্ণতাও এই বইয়ে থাকিবে তাহা স্বাভাবিক। তবু এই পুস্তকের দ্বারা কিছু জিজ্ঞাসা, কিছু আলোচনা ও বিতর্ক উদ্দীপিত হইলেই ইহার মার্থকতা স্বীকৃত হইবে।

সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা বোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাত্য। এই পুস্তকের মতে, ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যাই (Pluralistic Interpretation) বিজ্ঞান-

সম্মত এবং সবগুলি একবাদী বা monistic ব্যাখ্যাই একদেশদর্শী। মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা একবাদী। কেবল ভৌতিক বা আর্থিক ব্যাখ্যা (Materialistic বা Economic Interpretation) নয়, যাহার নাম ইতিহাসে চিদ-ভৌতিক (Psycho-materialist Interpretation) ব্যাখ্যা তাহাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে। কেবল ভৌতিক জগতের শক্তিই নয়, চিংলোকের বা মনোজগতের শক্তিগুলিও সমাজ ও জীবনের বিবর্তনে প্রভাবশীল। সমাজবিকাশের মূলে কেবল একপেশে নিয়ন্ত্রণবাদ (One-sided determinism) যারা কল্পনা করেন তারা একদেশদর্শী। এই দৃষ্টিতে Economic determinism, genetic determinism तथा ভৌগোলিক, যৌন, সামাজিক, বংশতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণবাদ প্রভৃতি সবই ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক, দৃষ্টিভঙ্গীতে Functional Correlation বা Interaction, ক্রিয়া-সহসম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদই সমাজ-ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক নীতি। মার্ক্সবাদ আর্থিক নিয়ন্ত্রণবাদী হওয়ায় যান্ত্রিকতাবাদী বা mechanist ব্যাখ্যার অধোগত হইয়া পড়িয়াছে। বহুবাদী ব্যাখ্যার সহিত এইখানে মার্ক্সবাদের মতবিরোধ।

শ্রেণীসংগ্রামকে মার্ক্সবাদ ইতিহাস ব্যাখ্যার মূলতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বহুবাদী ব্যাখ্যায় শ্রেণীসংগ্রাম একটা সামাজিক ঘটনা হিসাবে স্বীকৃত এবং ইহার প্রভাবও স্বীকৃত। কিন্তু ডায়ালেকটিক-তত্ত্বের সহিত শ্রেণীসংগ্রামের যোগ এবং বিশ্ব-ইতিহাসের ও সংস্কৃতির একমাত্র সৃজক ও নিয়ামক হিসাবে শ্রেণীসংগ্রামের সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা, এই দুইটি মার্ক্সবাদী তত্ত্ব বহুবাদী ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা সঙ্গত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার-প্রণীত 'Political Philosophies since 1905' নামক পুস্তকে আমাকে শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা

ভিত্তিহীন এবং ইহাতে আমার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী আমি নই। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী মতবাদ আমার কাছে অগ্রহণীয়। শ্রেণীসংগ্রাম একটা সত্য ও বাস্তব ব্যাপার। সমাজে ইহা রহিয়াছে এবং একদা ইহার বিলুপ্তি হইবে, সকল মানুষের চেপ্টার সেইদিকেই লক্ষ্য হওয়া উচিত। শ্রেণীসংগ্রামের অবসানই সামাজিক প্রচেষ্টার আদর্শ। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামকে ডায়ালেকটিক নামক দুর্বোধ্য বিশ্বনাতির একটা প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা একান্ত কাল্পনিক। তাছাড়া শ্রেণীসংগ্রামকে বিশ্বসংস্কৃতির উৎপাদক বলিয়া বিশ্ববিবর্তনের একমাত্র মূল বলিয়া মনে করাও অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক। এই পার্থক্যটুকুই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীসংগ্রামের অর্থনৈতিক ভূমিকা বা role সম্বন্ধে তেমন নয়, ষতটা ইহার মার্ক্সকল্পিত দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা সম্বন্ধে আপত্তি রহিয়াছে। আশা করি, সমাজ-তত্ত্ববিদ শ্রেণী শ্রীযুক্ত বিনয় সরকার মহাশয়ের কাছে এই পার্থক্যটুকুর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় হইবে না।

এই বইর শেষ প্রবন্ধ 'সাহিত্যে শ্রেণীবাদ' চলিত ভাষায় লেখা। উহা মাসিক 'জয়শ্রীতে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

বইখানায় অনেক ভুলত্রুটি রহিয়া গেল। আশা করি, এই ত্রুটি মার্জনীয় হইবে। এখানে উল্লেখ থাকুক যে, সহকর্মী শ্রীযুক্ত সুনীল দাস মহাশয়ের পরিশ্রম ব্যতীত এই বই বাহির হওয়া সম্ভব হইত না।

৪৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা—২৬

ফোন : সাউথ— ১৩৪৫

সাম্রাজ্যবাদীর দালান  
অনিল রায়



# সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

## প্রথম অধ্যায়

■ মার্ক্সবাদের মূলকথা	..	...	১
দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী বা দ্বান্দ্বিক জড়বাদ	...	....	৩
( Dialectical Materialism )			

## দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সমালোচনা—			
ডায়ালেকটিক নীতি	...	....	১৫
জড়বাদ ( Materialism )	...	....	২৫

## তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যা (১) ....	...	....	৩৭
(Materialistic Interpretation of History)			
সমাজবিবর্তনে দ্বান্দ্বিক নীতি বা ডায়ালেকটিক		...	৬০

## চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাসের জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যা (২) ....	....	....	৪২
মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রসংক্রান্ত থিয়োরী	....	...	৪২
(Theory of State)			
মার্ক্সবাদী ধর্মসংক্রান্ত থিয়োরী	..	...	৪৪
( Theory of Religion )			
পরিবার সংক্রান্ত থিয়োরী	...	....	৪৫
(Theory of Family)			

### পঞ্চম অধ্যায়

জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যার সমালোচনা ... .. ৭৬

### ষষ্ঠ অধ্যায়

মর্গান-মাক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা ... .. ১২৪

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ ... .. ১৩৬

### সপ্তম অধ্যায়

মাক্সবাদী ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা ... .. ১৬০

ধর্মের উৎপত্তি

ধর্মের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ ... .. ১৭৫

### অষ্টম অধ্যায়

মাক্স-মর্গানী বিবাহ ও পরিবার-তত্ত্বের সমালোচনা—

পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি ... .. ১৮১

পরিবার ও বিবাহের ভবিষ্যৎ ... .. ১৯৩

### নবম অধ্যায়

সাহিত্যে শ্রেণীবাদ ... .. ১৯৪

### পরিশিষ্ট

(১) হব্‌হাউস, ছইলার, গিন্সবার্গ সংকলিত সংখ্যা-তালিকা ... .. ২১২

(২) এই পুস্তকে উল্লিখিত গ্রন্থ-তালিকা .... .. ২১৪





# সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ

## প্রথম অধ্যায়

### মার্ক্সবাদের মূলকথা

সমাজতন্ত্রবাদের সহিত মার্ক্স আরও তিনটি মতবাদ যোগ করিয়া একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শন (Philosophy of life) গঠন করিয়াছেন। এই মার্ক্সীয় দর্শনকে মার্ক্সবাদ (Marxism) বা কম্যুনিজম্ (Communism) বলা হইয়া থাকে। ১৮৪৮ সালে ‘কম্যুনিষ্ট ইস্তাহাদ’ (Communist Manifesto) নামক পুস্তকে মার্ক্স স্বয়ং ‘কম্যুনিষ্ট’ এই নামটা ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার পর ১৯১৯ সালে লেনিনও “কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক” (Communist International) নামক প্রতিষ্ঠান গঠনের সময় ‘কম্যুনিষ্ট’ আখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন।

সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমষ্টিবাদকেই বোঝা যায়। সম্পত্তিকে ব্যক্তির হাতে না রাখিয়া সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করাই সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য। ইহার উপায় হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ এবং পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষির মালিকানা-স্বত্ব রাষ্ট্রের অধীনে আনিয়া সমাজের সকল ব্যক্তির কল্যাণের জগু রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালনা। কিন্তু মার্ক্স এই সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করিয়া ইহার একটি দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি দান করিবার চেষ্টা করিলেন। সমাজের ও পৃথিবীর মূলে কোন্ শক্তি কাজ করিতেছে, ঐ শক্তি কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করিতেছে, পৃথিবীতে ও সমাজে পরিবর্তন কেন হয় এবং কিরূপে হয়

ইত্যাদি রহস্যকে নির্ণয় করিবার চেষ্টায় তিনি পৃথিবীর ও সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত মতবাদ দাঁড় করাইয়াছেন। সমাজতন্ত্র কেন প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে একদিন অব্যর্থভাবে কেন প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সমাধান দিয়াছেন বলিয়া মার্ক্স দাবী করেন। এই কারণে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ তাহাদের এই কম্যুনিজমকে আখ্যাদান করিয়াছেন “বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ” (Scientific Socialism)। কেবল কাল্পনিক একটা আদর্শ হিসাবে নয়, বৈজ্ঞানিক কারণে ও বাস্তব জগতের অব্যর্থ নিয়মেই সমাজতন্ত্র আবির্ভূত হইবে বলিয়া মার্ক্স মনে করেন। কেবল আবির্ভূত হইবে নয়। আবির্ভূত হইতে বাধ্য মার্ক্সের পূর্বে যে সব সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাদিগকে মার্ক্স “কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ” (Utopian Socialism) নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

১৮৪৮ সালে মার্ক্স ‘কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার’ বা ‘Communist Manifesto’ নামক পুস্তকে তাঁহার মতবাদ বিবৃত করেন। ঐ পুস্তকে ইউরোপে মধ্যযুগের সামন্ত-প্রথা হইতে শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়া পুঁজিবাদ বর্ধনতন্ত্রের আবির্ভাব কিরূপে হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপর “অর্থশাস্ত্রের আলোচনা” (Critique of Political Economy) নামক পুস্তকে তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার পর ১৮৬৭ সালে “মূলধন,” বা ক্যাপিটাল (Capital) নামক পুস্তকে তাঁহার “উদ্ভূত মূল্যতত্ত্ব” (Theory of Surplus value) নামক বিখ্যাত মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া সমাজের পুঁজিবাদী মূল প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মার্ক্সবাদ বলিতে নিম্নলিখিত মতবাদগুলি বোঝা যায়।

- (১) দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদ বা Dialectical Materialism
- (২) ইতিহাসের জড়বাদী বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (Materialistic

Interpretation of History বা Economic Interpretation of History) (৩) উৎসৃত্ত-মূল্যতত্ত্ব ও সমাজতন্ত্রবাদ বা Theory of Surplus value and Socialism. (৪) রাষ্ট্রের ক্রমবিলুপ্তিবাদ বা Theory of withering away of the state. (৫) বিবাহের ও পরিবারের বিলুপ্তিবাদ বা Theory of abolition of marriage and family.

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে মার্ক্স যে দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাই মার্ক্সবাদ (Marxism) বা কম্যুনিজম্ (Communism)। ইহাতে মার্ক্সবাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইবে যে সমাজতন্ত্রবাদ বা সোশ্যালিজম্‌এর (অর্থনৈতিক সমষ্টিতন্ত্রবাদের) সহিত মার্ক্স একটা দার্শনিক মতবাদ ও একটা সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ যোগ করিয়াছেন। আসল সমাজতন্ত্রের সহিত এই মার্ক্সবাদী দর্শনতত্ত্ব (Dialectical Materialism) বা সমাজতন্ত্রের Materialistic Interpretation of History) কোন অন্তর্নিহিত সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ সোশ্যালিজম্ বা মার্ক্সবাদকে সমর্থন করিলেই যে মার্ক্সবাদী দর্শন ও সমাজসম্বন্ধীয় মতকেও সমর্থন করিতে হইবে তাহা ঠিক নয়। মার্ক্সবাদের পাঁচটি মততত্ত্ব সম্বন্ধে একটা একটা করিয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

## দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী বা দ্বান্দ্বিক জড়বাদ

### ( Dialectical Materialism )

মার্ক্স তাঁহার পূর্ববর্তী বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল (Hegel) কর্তৃক প্রবর্তিত ডায়ালেকটিক (Dialectic) বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী নীতি গ্রহণ করিয়া ইহাকে জড়বাদের বা Materialism এর সহিত যোগ করিয়া এই

Dialectical Materialism বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদ নামক দর্শনতত্ত্ব গঠন করিয়াছেন। “তর্কবিজ্ঞান” (Science of Logic) নামক পুস্তকে হেগেল এই ডায়ালেকটিক নীতিকে ব্যাখ্যা ও বিবৃত করিয়াছেন। জড়বাদ পৃথিবীতে একটা পুরাতন মতবাদ, বিশেষ করিয়া ১৮শ শতকে ফরাসী দেশে নূতন বিজ্ঞানের সহিত জড়বাদেরও প্রাদুর্ভাব হয়। এই ফরাসী জড়বাদের সহিত হেগেলীয় ডায়ালেকটিক বা দ্বন্দ্বিক নীতির সংযোগ সাধন করিয়া মার্ক্স ও তাহার দর্শনতত্ত্ব “দ্বন্দ্বিক জড়বাদ” এর প্রবর্তন করেন।

### ডায়ালেকটিক বা দ্বন্দ্বিক নীতি

ডায়ালেকটিক নীতিকে হেগেল ও মার্ক্স একটা বিশ্বজনীন নীতি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। পৃথিবীর যত পরিবর্তন ঘটিতেছে সমস্তই এই নীতি অনুসারে ঘটিতেছে। মানুষের মনে যে সমস্ত চিন্তা ও ইচ্ছা ও অনুভূতি উঠিতেছে তাহাও এই নীতি অনুসারে উঠিতেছে ও বিলয় পাইতেছে। মানব-সমাজে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, যত বিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যত সভ্যতার জন্ম, স্থিতি ও লয়, সমস্তেরই মূলে এই ডায়ালেকটিক নীতি রহিয়াছে। এক কথায় মানুষের মনে ও চিন্তা-জগতে এবং বাহিরের পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহা সমস্তই ডায়ালেকটিক পদ্ধতিতে ঘটিয়া থাকে। এই বিশ্বজনীন নীতি হেগেলই প্রবর্তন করিয়াছেন।

এরিষ্টটল তাহার তর্ক-শাস্ত্রে যে তিনটি যুক্তি-বিচারের সূত্র (Laws of Thought) প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাদিগকে হেগেল ভুল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এরিষ্টটল প্রবর্তিত তিনটি নীতি এই—(১) তাদাত্ম্যনীতি বা অভেদনীতি (Law of Identity) (২) স্ববিরোধ নীতি (Law

(Law of Contradiction) (৩) মধ্যবর্জন নীতি (Law of Excluded middle.)

(১) তাদাত্ম্য বা অভেদ (Law of Identity) :—ক = ক, রাম রামই বটে (A is A, Ram is Ram), প্রত্যেক বস্তু সেই বস্তুই বটে (A thing is itself.)। ইহার অর্থ এই যে কোন বস্তু যাহা তাহা অপেক্ষা বিপরীত বস্তু হইতে পারে না। যাহা যাহা, তাহা গাহাই! একই বস্তুকে এক অর্থে এক সময়ে ব্যবহার করিয়া সেই মুহূর্তেই তাহাকে তাহার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা অসম্ভব। রামকে রাম বলিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে “রাম না” বলা অযৌক্তিক। কারণ এইরূপ করিলে কোনও প্রকার চিন্তা করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি কোন বস্তু ও তাহার বিরুদ্ধ-বস্তু একই বস্তু হয়, তবে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর কোনও পার্থক্য থাকে না।

(২) স্ববিরোধ নীতি (Law of Contradiction) :—ক ‘না-ক’ নয় (A is not not-A)। রাম ‘না-রাম’ নয় (Ram is not not-Ram)। একটি বস্তু ‘না-বস্তু’ নয় (A thing is not not-itself)। এই নীতিটি প্রথম নীতির বা অভেদ তত্ত্বেরই একটা প্রকারভেদ মাত্র। অভেদ বা Identity নীতিকেই অণু ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। রাম “রাম নহে” ইহা হইতে পারে না; অর্থাৎ রাম রামই বটে, না-রাম” হইতে পারে না।

(৩) মধ্যবর্জন নীতি (Law of Excluded middle) :—ক, হয় ক, নয় তো না-ক (A is either A or not A)। রাম হয় রাম-নয় তো ‘না-রাম’ (Ram is either Ram or not-Ram)। কোন বস্তু হয় সেই বস্তু নয় তো ‘না-বস্তু’ (A thing is either itself or not itself)। কোন বস্তু হয় সেই বস্তুই আছে, নতুবা সেই বস্তু নয়।

“হাঁ” কি “না” এই দুইটির একটিকে এক সময় কোন বস্তু সম্বন্ধে বলা চলে। হাঁ ও না এই দুইটি বিরুদ্ধ কথা কোন বস্তু সম্বন্ধে একই সঙ্গে ও একই সময়ে বলা চলে না। ইহাদের মধ্যে কোন আপোষ বা মধ্যবর্তী অবস্থা কল্পনা করা যায় না। হয় রাম রামই বটে, নতুবা রাম নয়—এই দুইটি এক সঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়। রামও বটে রাম নয়ও বটে—ইহা নিতান্ত বাতুলতা বই আর কিছু নয়।

এরিষ্টটল-এর তর্ক শাস্ত্রের মতে এই নীতিকে মানিয়া না চলিলে কোনও প্রকার মননা বা চিন্তাকার্য সম্ভব নয়। তাই এই নীতি তিনটিকে চিন্তার মৌলিক নীতি বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু হেগেল ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এরিষ্টটল-এর নীতিগুলি গোড়াতেই ক্রটি-যুক্ত।

হেগেলীয় ডায়ালেক্টিক নীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইহাকে তিনটি মূল নীতিতে ভাগ করা হইয়াছে।

(১) বিরুদ্ধ সমন্বয় বা বিরোধী-তাদাত্ম্যনীতি বা Law of Identity of Opposites, (২) বিনশনের বিনশন বা Law of Negation of Negation, (৩) পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তনের উদ্ভব বা Quantitative Changes lead to Qualitative changes.

(১) বিরোধী-তাদাত্ম্য বা বিরোধীর সহানুপ্রবেশনীতি বা Law of Identity of Opposites, বা Interpenetration of Opposites, ক ক নয়—(A is not A). রাম রাম নয়—(Ram is not Ram). একটি বস্তু একই সময়ে সেই বস্তু এবং নয়-বস্তু—(A thing is itself and not itself at the same time). একই সময়ে হাঁ, হাঁ-ও বটে না-ও বটে—(Yes is both yes and no simultaneously). পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুই স্ববিরোধী। প্রত্যেকটি বস্তুই নিজেকে নিজের বিরুদ্ধতা করিতেছে। প্রত্যেকটি বস্তুকেই “সেই

বস্তু” ও “সেই বস্তু না” উভয়ই বলা চলে। হেগেলের মতে প্রত্যেক বস্তুই প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। কোন বস্তুই একই অবস্থায় একই সত্তা হিসাবে স্থির হইয়া থাকে না। যাহা যে প্রকার আছে, পর মুহূর্তে তাহার বিরুদ্ধ সত্তা পর্যন্ত পরিণত হইতেছে। রাম রামও বটে, রাম নাও বটে, যাহা রাম তাহাই “না-রাম”। কারণ রাম পরিবর্তিত হইতেছে। পূর্ব মুহূর্তে যে রাম ছিল পর মুহূর্তে সে রাম আর নাই। রাম পর মুহূর্তে “না-রাম” বা not-Ram হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে রাম রামও বটে এবং ঠিক পূর্বের রাম নাই বলিয়া রাম না-ও বটে। অতএব যিনি রাম তিনিই “না-রাম”। সুতরাং রামই “না-রাম” এবং এই প্রকার প্রত্যেকটি বস্তুই পরিবর্তনের দরুণ নিজের বিপরীত স্বরূপ ধারণ করিতেছে। অর্থাৎ একই সময়ে প্রতি বস্তু সেই বস্তুও বটে আবার তাহার বিপরীত বস্তুও বটে। ইহা এবং না, itself—সত্তা এবং not itself—না-সত্তা একই সঙ্গে একই সময়ে একই সত্তারূপে বর্তমান আছে। ইহাকে বিরুদ্ধ তাদাত্ম্য বা Identity of Opposites বলা হয়। ইহা এরিষ্টটল-এর তাদাত্ম্য-নীতি Law of Identityর বিপরীত অর্থসূচক।

(২) বিনশনের বিনশন বা Law of Negation of Negation :— হেগেল ও মার্ক্সের মতে প্রতি বস্তু পরিবর্তিত হইতেছে। পরিবর্তনের মূল অর্থ হইল বিনশন বা বিলুপ্তি। প্রত্যেক বস্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বিনষ্ট বা বিলুপ্ত বা negate করিতেছে। এই বিনশন বা Negation বিশ্ব-সংসারের অন্তর্নিহিত একমাত্র মৌলিক নীতি। জড়-জগতে, উদ্ভিদ-জগতে, পশু-জগতে মানব-জগতে যত পরিবর্তন ঘটিতেছে সবই এই বিনশন বা Negation নীতির প্রকাশ। প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তি যে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছে তাহাই তাহার ক্রমবিকাশ। সমাজ, ব্যক্তি বা জাতির ক্রমবিকাশের মূলে এই বিনশন রহিয়াছে। ক্রম-

বিকাশের মুখে প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তু বা সমাজ নিত্য নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই অবস্থান্তরের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পূর্ব অবস্থাকে বিলুপ্ত করিয়া পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। পূর্বের অবস্থা বা স্তরকে বিলুপ্ত বা বিনষ্ট না করিয়া পরবর্তী অবস্থা বা স্তরের উদ্ভব হইতে পারে না। এইখানে হেগেল একটি বিশেষ ফর্মুলা বা পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেকটা পরিবর্তনের বা ক্রমবিকাশের তিনটা ধাপ বা স্তর আছে। প্রথম স্তরের নাম স্থিতি বা Thesis; দ্বিতীয় স্তরের নাম প্রতিস্থিতি বা Antithesis; তৃতীয় স্তরের নাম সংস্থিতি বা সমন্বিত স্থিতি বা Synthesis।

একটা বীজ তাহার ক্রমবিকাশের ফলে তিনটা ধাপকে পার হইয়া উচ্চতর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। বীজের স্তর বা অবস্থাকে স্থিতি বা Thesis বলা চলে। প্রতি মুহূর্তেই বীজ বীজের বিপরীত বা “না-বীজ” বা not seed হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তের এই সব পরিবর্তন আমাদের চোখে না পড়িলেও বীজটা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া চারা গাছে পরিণত হইতেছে। তাই “চারা গাছকে” বীজের প্রতিস্থিতি বা বিরুদ্ধ সত্তা বা Antithesis বলা যাইতে পারে। স্থিতি বা প্রথম স্তরকে বিনষ্ট করিয়া বা negate করিয়া প্রতিস্থিতির (চারাগাছ) উদ্ভব হইয়াছে। ইহার পর চারাগাছও পরিবর্তিত বা ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া তৃতীয় স্তর বা বৃক্ষে পরিণত হয়। এই “বৃক্ষ” হইল সমন্বয় বা Synthesis। প্রতিস্থিতিকে বিনষ্ট করিয়া সমন্বয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। এই কারণে সমন্বয়কে বলা হইয়াছে দুইটা বিনশনের বা Negation-এর ফল। এইরূপে বৃক্ষ আবার পরিবর্তনের গতিতে বীজ ও অগ্ৰাণ্ড অবস্থান্তরে পরিণত হইতেছে। সুতরাং, এই মতে, সমস্ত পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশই ক্রমান্বয় বিনষ্টি বা Negation of Negation-এর ফল। পৃথিবীতে সমস্ত বস্তুই



এইরূপ অহরহ বিনষ্টির মধ্য দিয়া যাইতেছে। এই বিনষ্টি-তত্ত্বই সৃষ্টির-মূলতত্ত্ব।

(৩) পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন বা Quantitative Changes lead to Qualitative Changes।

প্রত্যেক বস্তুরই পরিবর্তন হইতেছে, সেই পরিবর্তনের অর্থই হইতেছে বিনশন। প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যেক বস্তু আপনাকে বিনাশ বা negate করিতেছে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তের সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলি আমাদের চোখে পড়ে না। পরিবর্তনের পরিমাণ যখন খুব বেশী হয় তখনই আমাদের চোখে বস্তুর মধ্যে একটা রূপান্তর ধরা দেয়, হেগেল ও মার্ক্সের ডায়ালেক্টিক নীতির ইহা একটা তত্ত্ব যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন জমা হইতে হইতে একটা বিশেষ অবস্থায় সূর্যহৎ একটা পরিবর্তন ঘটয়া যায়। সামান্য সামান্য পরিবর্তনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া একটা বিশেষ সময়ে হঠাৎ একটা নূতন বস্তুর আবির্ভাব হয়। যখন এই নূতন বস্তুর আবির্ভাব ঘটে তখন একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া ইহারা মনে করেন। এই নূতন অবস্থায় বস্তুটি একটি নূতন স্তরে উপস্থিত হইয়াছে। এখানে একটা বিন্দুতে বা জায়গায় আসিয়া যেন একটা আকস্মিক বিপ্লব ঘটয়া গেল। যেন অতি ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন হইতে হইতে বস্তুটি একটি লম্ফ বা একটি 'Sudden Jump' দিয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন বস্তুতে পরিণত হইল। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, জল হইতে বরফ উদ্ভব এই নীতির একটি প্রমাণ। জলের উপর ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিলে এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে এমন একটা সময় আসিবে যখন হঠাৎ জল বরফে পরিণত হইবে। এখানে ঠাণ্ডার পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হইল। তেমনি জলের উপর ক্রমশই বেশি উত্তাপ প্রয়োগ করিতে করিতে যখনই ১০০° উত্তাপ

দেওয়া হয় তখনই অকস্মাৎ জল বাষ্পে পরিণত হইতে আরম্ভ করিবে। বাষ্প ও বরফ দুইই জল হইতে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। এই প্রকার নূতনত্বের আবির্ভাব পৃথিবীতে সদাই ঘটিতেছে এবং এই প্রকার পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে নূতন বস্তুর আবির্ভাব ঘটিতেছে। স্থিতিকে বিনাশ করিয়া একরূপ ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন হইতেই প্রতিস্থিতির আবির্ভাব ঘটিতেছে; প্রতিস্থিতির মধ্যেও ক্রমিক পরিবর্তন বা বিনষ্টির ফলে সময়ের আবির্ভাব হইতেছে।

### সমাজে ডায়ালেক্টিক্-এর প্রয়োগ

হেগেল তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক ‘ইতিহাসের দর্শন’ বা “Philosophy of History”তে উপরোক্ত ডায়ালেক্টিক্ নীতি অনুসারে সমাজের ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষের সমাজ-জীবনেও পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই পরিবর্তন হেগেলের মতে বিনশন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সমাজ প্রতিমুহূর্তে নিজেকে বিনাশ করিয়া চলিয়াছে। এই বিনষ্টি বাড়িতে বাড়িতে সমাজকে এক একটা অবস্থায় এক একটি নূতন স্তরে রূপান্তরিত করিতেছে। সমাজেও পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে এই বিশেষ স্তরগুলিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই গুণগত পরিবর্তন এক একটা বিপ্লবাত্মক ঘটনা এবং সমাজের ক্রমবিকাশের এই অব্যর্থ ডায়ালেক্টিক্ নীতির ফলে যুগে যুগে সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। এই ডায়ালেক্টিক নীতি অনুসারে ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় বিপ্লব বা Revolution সংঘটিত হয়। প্রত্যেকটী সমাজও এই ডায়ালেক্টিক্ নীতি অনুসারে পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। সুতরাং অব্যর্থ নিয়মে কতকগুলি বাঁধাধরা বিশিষ্ট ধাপের মধ্য দিয়া সমাজের জীবন চলিতে বাধ্য।

মার্ক্স হেগেলকে অনুসরণ করিয়া সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশকে এই ডায়ালেক্টিক নীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্থিতি এবং প্রতিস্থিতি এই দুইটী বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়া সমাজ ক্রমেই নূতন সময়-এর স্তরে উপস্থিত হইতেছে। প্রত্যেকটি স্থিতি নিজেকে বিনাশ করিতেছে। স্থিতির গর্ভেই একটা বিরুদ্ধ প্রতিস্থিতির উদ্ভব হয়। ঐ প্রতিস্থিতি স্থিতিকে ক্রমেই অধিকতর বিলুপ্তির দিকে লইয়া যাইতেছে অর্থাৎ বিনাশ করিতেছে। এই বিনাশনের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃদ্ধি পাইতে পাইতে স্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়া প্রতিস্থিতির পরিপূর্ণ রূপ লইয়া আবির্ভূত হইতেছে। এই নিয়মে প্রতিস্থিতির মধ্যেও তাহার বিপরীত শক্তিরূপে একটা নূতন প্রতিস্থিতির জন্ম হইতেছে। পূর্বের প্রতিস্থিতিতে এই নূতন বিরুদ্ধ শক্তি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন সময়রূপে আবির্ভূত হইতেছে।

সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস মার্ক্স, ডায়ালেক্টিক নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে প্রাচীন সমাজকে বিলুপ্ত বা negate করিয়া মধ্যযুগে ফিউডাল সমাজ বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আবির্ভূত হইয়াছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ প্রাচীন সমাজের “প্রতিস্থিতি” আবার সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে বিলুপ্ত করিয়া ধনতান্ত্রিক (Capitalism) সমাজের জন্ম হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজকে বিনাশ বা negate করিবার জন্ম ধনতন্ত্রের গর্ভেই তাহার “প্রতিস্থিতি” সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হইবে। সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া ভবিষ্যতের অব্যর্থ সময়রূপে আবির্ভূত হইবে। সমাজের ক্রমবিকাশেও ডায়ালেক্টিকের উপরোক্ত তিনটি নীতি অমোঘরূপে কাজ করিতেছে।

### দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী জড়বাদ বা **Dialectical Materialism**

মার্ক্সের দর্শনের নাম দ্বন্দ্বিক জড়বাদ। ফরাসী দেশে ১৮শ শতকে যে জড়বাদ প্রচলিত ছিল তাহার সহিত ডায়ালেক্টিক নীতিকে যুক্ত করিয়া এই দ্বন্দ্বিক জড়বাদ গঠিত হইয়াছে। জড়বাদের মূল সূত্র দুইটি :—

(১) জড়-শক্তি বা (Matter) জগতের আদিম ও একমাত্র সত্য পদার্থ।

(২) জড় হইতে প্রাণ (Life) ও মনের (Mind) উৎপত্তি হইয়াছে।

এই দুইটি সূত্র একত্রে ইহাই বুঝায় যে সৃষ্টির পূর্বে জড় উপাদান ও তাহাতে গতি (Motion) ছিল। এই সব জড় উপাদান নানাপ্রকার বিচিত্র ধরণে সংযুক্ত হওয়ার ফলে কোন বিশেষ অবস্থায় প্রাণ-শক্তির জন্ম হইয়াছে। নানাপ্রকার জড়-বস্তুর সমবায়ে প্রাণ-শক্তির উদ্ভব কি করিয়া হইল এ কথার উত্তরে ১৮শ শতকের বৈজ্ঞানিক জড়বাদীরা বলিয়াছেন যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার ফলেই প্রাণশক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী-দেহ একপ্রকার জটিল বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহাদের যে গতি ও প্রাণ দেখা যায় তাহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মস্তিষ্ক হইতেই আলোকচ্ছটার মত ইহা নির্গত হয়। মানুষের চিন্তাশক্তি ও মন মস্তিষ্কের সৃষ্টি মাত্র। উদ্ভিদের মন না থাকিলেও প্রাণ আছে। উহার এই প্রাণ-শক্তি আর কিছু নয় শুধু তাহার অন্তর্গত জড়কণাগুলির সমবেত প্রকাশ মাত্র। কার্য-কারণের অব্যর্থ নিয়মে কতকগুলি উপাদান একত্র হইলে প্রাণ ও মন দেখা দিবেই। বিজ্ঞানের মূলনীতি কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা (Causality)। কারণগুলি বর্তমান থাকিলে কার্য বা তাহার ফল দেখা দিবেই, জগতের সমস্ত

বস্তু সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ এই নিয়মে বাধা। কারণগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ষোল আনা না থাকায় আমরা সমস্ত কার্য বা ঘটনাকে বুঝিতে বা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি না। তেমনি প্রাণ এবং মনের সমস্ত কিছু রহস্য আমরা এখনো উদ্ঘাটন করিতে পারি নাই, তাহার কারণ, এই যে সমস্ত উপাদান ও শক্তি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণজ্ঞান এখনও হয় নাই। যে সব উপাদান যে প্রকারে সংযুক্ত হইয়া উদ্ভিদ, জন্তু ও মানুষ গঠিত হইয়াছে এক সময় সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে বিজ্ঞান সব উপাদান এইরূপে একত্র করিয়া ইহাদের সৃষ্টি করিতে পারিবে।

সংক্ষেপতঃ, জড়-শক্তি (Matter) হইতেই মন ও প্রাণের উৎপত্তি এবং এই বিশ্বপৃথিবী জড়-শক্তি (Matter) হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই জড়বাদের সারভঙ্গ।

মার্ক্স এই তত্ত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাহার মতবাদ জড়বাদ (Materialism)। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্সের ডায়ালেক্টিক নীতিকে যোগ করায় মার্ক্সবাদীদের মতে ইহা পূর্ববর্তী অগ্র সমস্ত জড়বাদ হইতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইয়াছে এবং পৃথক হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে পূর্ববর্তী জড়বাদকে যান্ত্রিক জড়বাদ (Mechanistic Materialism) বলিয়া আখ্যাত করিয়া মার্ক্স তাহার দ্বন্দ্বিক জড়বাদের (Dialectical Materialism) বিশিষ্টতা দাবী করিয়াছেন। পূর্ববর্তী জড়বাদ অনুসারে জড়শক্তি হইতে মনের বা প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে—কার্য-কারণের যান্ত্রিক নিয়মে।

জড়কণাগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে মন ও প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। কাজেই জড়বস্তুকে ও জড়-প্রকৃতির নিয়মগুলিকে জানিতে পারিলেই আমরা মনের ও প্রাণের তত্ত্বকে জানিতে পারিব। জড়বস্তু ব্যতীত প্রাণ বা মনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মার্ক্স এই মতবাদের ক্রটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি মানুষকে ও প্রাণীর প্রাণ ও

মনকে যান্ত্রিক সমাবেশের ফল বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মতে, পূর্বের জড়বাদ কিছুটা ভুল করিয়াছে। তাহারা মন ও প্রাণকে জড়বস্তুর যান্ত্রিক ফল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ, মার্ক্সের মতে জড়বস্তু হইতে মন ও প্রাণের উৎপত্তি হইলেও মন ও প্রাণ জড় হইতে উচ্চতর বস্তু এবং ইহা সম্পূর্ণ একটী নূতন আবির্ভাব। এই নূতন আবির্ভাব যান্ত্রিক উপায়ে সৃষ্ট হয় নাই। ডায়ালেক্টিক নীতি অনুযায়ী পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে হইতে গুণগত পরিবর্তন ঘটয়া একটী নূতন স্তরের আবির্ভাব হইয়াছে। মার্ক্সবাদী এই যান্ত্রিক জড়বাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একটী নূতন ধরণের জড়বাদ প্রবর্তন করিয়াছে বলিয়া দাবী করেন। ইহাদের মতে এই নূতন জড়বাদের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহারা মনকে একটী নূতন সত্তা বলিয়া স্বীকার করেন এবং জড়জগতের নিয়মের দ্বারা মনোজগতের ও প্রাণজগতের ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। সংক্ষেপে এই বলা চলে যে জড়শক্তি (Matter) হইতেই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই জড়বস্তু (Matter) দ্বান্দ্বিক বা ডায়ালেক্টিক নীতির ফরমুলা অনুসারে নিজেকে পরিবর্তিত করিয়া চলিয়াছে। “অর্থশাস্ত্রের আলোচনা” (Critique of Political Economy) নামক পুস্তকের মুখবন্ধে এবং “পুঁজিবাদ” (Capital) নামক পুস্তকের ভূমিকায় এবং “ফয়ারবাক সম্বন্ধে এগার সূত্র” (Eleven Theses on Feuerbach) নামক পুস্তকে মার্ক্স এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এঙ্গেলসের ‘ফয়ারবাক’ (Feuerbach), “ডুয়েরিং-বিরোধী” (Anti-Duhring), ‘প্রকৃতি ও ডায়ালেক্টিক’ (Nature and Dialectics) নামক পুস্তকগুলিতে, লেনিনের ‘প্রত্যক্ষবাদী সমালোচনা এবং জড়বাদ’ (Empirio-Criticism and Materialism) পুস্তকে, বুখারিনের ‘ঐতিহাসিক জড়বাদ’ (Historical Materialism) পুস্তক প্রভৃতিতে এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সমালোচনা

### ডায়ালেক্টিক নীতি

মার্ক্সের এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদ দাঁড়াইয়া আছে ডায়ালেক্টিক নীতির উপরে, কিন্তু এই হেগেলীয় ডায়ালেক্টিক নীতি নিতান্ত ক্রটিপূর্ণ এবং অযৌক্তিক। বহু দার্শনিক পণ্ডিত এই ডায়ালেক্টিক নীতিকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার ভুল-ক্রটি দেখাইয়া দিয়াছেন। যুক্তি বিচারে ইহা প্রমাণ হয় যে এরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র ও তাহার যুক্তি বিচারের মৌলিক সূত্রই (Fundamental Laws of Thought) নিভুল এবং চিন্তা ও জড়জগতের মৌলিক সত্য। অভেদনীতি (Law of Identity) ইত্যাদি ব্যতীত আমরা কোনই চিন্তা করিতে পারি না। জগতের সব ঘটনা ও ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝিতে বা চিন্তা করিতে হইলে বা তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে এরিষ্টটল কর্তৃক প্রবর্তিত নীতি তিনটিকে মানিতেই হইবে। হেগেল নিজেই ভুল করিয়া অবাস্তব ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। কোথায় কি করিয়া হেগেল ভুল করিয়াছেন তাহাই দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ “বিরোধী-তাদাত্ম্য” (Identity of Opposites) নামক হেগেলীয় ডায়ালেক্টিক নীতির প্রথম সূত্র অবাস্তব, অসম্ভব ও অযৌক্তিক। প্রতি বস্তুই তাহার বিপরীত বস্তুতে—প্রতিস্থিতিতে পরিণত হইতেছে; রাম পরিবর্তিত হইয়া “না-রাম” হইতেছে, অতএব রামই “না-রাম” এ কথা ঠিক

নয়। যে রাম সে কখনও তখন তখনই সেই মুহূর্তে “না-রাম” হইতে পারে না। পরিবর্তন ঘটিতে কিছুটা সময়ের দরকার হয়। পরিবর্তন হইলে একটা প্রক্রিয়া ; যে কোন প্রক্রিয়া ঘটিতে কিছু সময় অতিক্রান্ত হইবেই। কাল পদার্থকে (Time factor) বাদ দিয়া কোন প্রক্রিয়া বা পরিবর্তনই ঘটিতে পারে না। রামের কিছুটা পরিবর্তিত হইতেও কিঞ্চিৎ সময় লাগিয়াছে, কাজেই রাম পরিবর্তিত হইয়া “না-রাম” হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিলেও একথা বলিতে হয় যে কিছুক্ষণ পরে রাম “না-রাম”-এ পরিণত হইয়াছে। রাম একই সময়ে “না-রাম” হইতে পারে না, যে মুহূর্তে রাম রামই আছে ঠিক সেই মুহূর্তে রাম রামই আছে। হয়ত পরমুহূর্তে কিছু পরিবর্তিত হওয়ার ফলে রাম “না-রাম” হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই পরিবর্তনকে বুঝিতে বা বুঝাইতে ডায়ালেকটিকের বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি মোটেই খাটে না। যে বস্তু যাহা, সেইক্ষণেই সেই বস্তু তাহা নয়, এ কথা বাতুলের প্রলাপ বই আর কিছু নয়। আমাদের বক্তব্য রাম একই সময়ে (simultaneously বা at the same time) “না-রাম” হইতে পারে না, পরবর্তী সময়ে (subsequently) হইতেও বা পারে। বীজ প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু পরিবর্তনের ফলে ও পরে পরে সময়ান্বেষণের ফলে না-বীজ (not-seed) হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে বীজও বটে এবং না বীজও বটে, একথা অসম্ভব। দুইটা বিরুদ্ধ বস্তু বা সত্তা একই সময়ে একই অর্থে একই সত্তা হইতে পারে না।

তা ছাড়া যদি একই মুহূর্তে রাম “না-রাম” ও বটে, তবে কোনও পরিবর্তন সম্ভব হয় না। কারণ রাম ও “না-রাম” একই সময়ে ও একই সঙ্গে ঘটিলে একে অন্যকে খণ্ডন ও বিলুপ্ত করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে অবশিষ্ট শূন্য বই আর কিছু থাকে না। পরিবর্তনকে



বুঝিতে হইলেও অ্যারিষ্টটলের তাদাত্ম্য নীতিকেই ( Identity ) অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ বস্তু কিঞ্চিৎ সময়াতিক্রমে স্বরূপে পৃথক বা বিভিন্ন হইতে পারে। পরবর্তী কালে ( subsequently ) বস্তু ভিন্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে—একই কালে নয়।

দ্বিতীয় নীতি—বিনশনের বিনশন বা Negation of Negationঃ মূলতঃ ভুল। বস্তুতঃ, পরিবর্তন (Change) আর বিলুপ্তি (Negation) একই বস্তু নয়। “বীজ” হইতে প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনে যে “চারাগাছ” বাহির হইল, তাহা বীজের বিলুপ্তির বা Negation-এর ফলে নয়, তেমনি চারাগাছ হইতে “বৃক্ষের” পরিণতি ও বিনাশ বিলুপ্তির পরিচায়ক নয়। এ-স্থলে ক্রমবিকাশে কোনও বিলুপ্তি (“Negation”) ঘটিতেছে না। বীজের বৃক্ষে পরিণতিকে বিনাশ (Negation) বলা ভুল। ইহা হইল “বিকাশ” (Development), বিবৃদ্ধি (Growth) বা পূর্ণতা-প্রাপ্তি (Culmination)—তেমনি রাম বালক হইতে যুবকে পরিণত হইল তাহাও রামের বিনাশ (Negation) নয়। রামের পূর্ণতা-প্রাপ্তি। পূর্ণতা যাহা তাহাকে বিনাশ বলিব কেন? বিকাশকে বিনাশ বলা ভাষা ও ভাবের উপর জুলুম বই আর কিছু নয়। ম্যাক্ টেগার্ট ( Mac Tegar ) ১৯শ শতকের একজন নামকরা হেগেলপন্থী। তাঁহার “হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের আলোচনা” ( Studies in Hegelian Dialectic )” নামক পুস্তকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে জীব-জগতে যে ক্রমবিকাশ ঘটে তাহাতে বিনাশ ( Negation ) ঘটে না। সেখানে হেগেলীয় বিনাশকে (Negation) বিকাশ (Development) অর্থেই বুঝিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আমাদের মতে বিনাশ (Negation) সত্য সত্যি ঘটে না; কাজেই “বিকাশ” অর্থে আমরা বিনাশ শব্দ কেন ব্যবহার করিব? হেগেল ও মাক্সের

এখানে বিনাশ বা (Negation) শব্দ ব্যবহার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ হইয়াছে।

বিনষ্টি (Negation) যদি না ঘটে তবে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, “পরিবর্তন” (Change) ঘটে, বিনাশ নয়। বস্তুমাত্রই কতকগুলি উপাদান লইয়া তৈরী। যেমন ‘রাম’ বলিতে বা ‘আপেল’ বলিতে আমরা কতকগুলি গুণের সমষ্টি একটা মানুষ ও একটি ফল বুঝিয়া থাকি। রামের মধ্যে পরিবর্তন ঘটয়াছে, তার অর্থ এই যে রামের অন্তর্গত কতক উপাদান বা গুণ আর বিद्यমান নাই এবং কতকগুলি গুণ বা উপাদান পূর্ববৎ বর্তমান রহিয়াছে। কোন বস্তুর আংশিক গুণ বা স্বরূপের কিছু ঘটতি ঘটিলে তাহার সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। তাহার আংশিক পরিবর্তন ঘটে মাত্র। রাম কৃশ ছিল, স্থূল হইয়াছে। ইহাতে দৈহিক গুণে কিছু উপাদান বিলুপ্ত হইয়া নূতন গুণ বা উপাদানের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার অর্থ ইহা নয় যে রামের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি হইয়াছে। রামের পূর্ব স্বরূপ কিছু অংশে বিद्यমান রহিয়াছে, তাই তাহাকে রাম নামে আখ্যাত করি। রামের কিছু পূর্বসত্তা আছে, কিছু পূর্বসত্তা আর নাই। এই অবস্থাকে বিনাশ বলা অগ্রায় ও ভুল; পরিবর্তন (Change) বলিলে ভুল হইবে না। কয়েকটি উপাদানের অবর্তমানতা ঘটিলে পরিবর্তন (Change) এবং সব উপাদানের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিলে বিনাশ (Negation) বলা হয়। বিনাশ (Negation) শব্দটি এখানে অপপ্রয়োগ।

এ ছাড়া এখানে আর একটা ভুল রহিয়াছে। বীজ একেবারে “না-বীজ-এ,” রাম একেবারে “না-রামে” পরিণত হইতেছে, একথায় গুরুতর ভুল রহিয়াছে। এখানে বিনাশ হয় না, পূর্বেই বলিয়াছি।

“না” শব্দটির এখানে অপব্যবহার ঘটিয়াছে। বালক-রাম যুবক-রামে পরিণত হইল। হেগেলের ও মার্কসের মতে যুবক-রাম হইল প্রতিস্থিতি (Anti-thesis); এখানে ‘প্রতি’ (Anti) শব্দও বিরুদ্ধতার (Opposition বা Negation) সূচক। কিন্তু যুবক-রাম তার পূর্বের সত্তার ‘বিরুদ্ধ’ (“Anti”) হইবে কেন? বালক-রাম ও যুবক-রামে কোন বিরুদ্ধতা নাই। বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে (Croce) তাঁহার পুস্তক “হেগেল দর্শনের কোন্ট্রাক্ট জীবিত ও কোন্ট্রাক্ট মৃত”-এ (What is living and what is dead of Hegel) হেগেলের এই ত্রুটি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও দেখাইয়াছেন, বিরুদ্ধতা (Opposition) এবং পার্থক্য বা পৃথকত্ব (Distinction) এই দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। হেগেলীয় ঐক্যবাদের মতো পার্থক্যবাদের মতো ‘বিরুদ্ধ’ (Opposite) এবং ‘পৃথক’ (Distinct) এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই ফেলিয়াছে। সত্য এবং সত্য এই দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ সত্তা বা বস্তু। ইহাদের একটি যেখানে আছে সেখানে অপরটির বিদ্যমানতা অসম্ভব। বাহ্য সত্য তাহাই সত্য হইতে পারে না। কিন্তু সত্য ও সৌন্দর্য এই দুইটি বস্তু সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নয়—তবে এরা পৃথক বটে। হেগেল ও মার্ক্স পৃথিবীর বস্তুগুলির মধ্যে একই সঙ্গে বিনাশ বা বিরোধ (Negation, Contradiction বা Opposition) নীতির ক্রিয়া দেখাইয়াছেন। বিশ্বসংসারে সর্বত্র পরিবর্তনের মধ্যেই এই সম্পূর্ণ বিরোধিতা বা বিনাশ (Opposition বা Negation) ঘটিতেছে। ইহাই সার্বজনীন বিশ্বনীতি। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে কেবল বিরুদ্ধতা, বিলুপ্তি ও বিনাশই ঘটিতেছে। এই কয়েকটি তত্ত্ব বিশ্বের সব ঘটনা ও বস্তুর তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। পূর্বের দৃষ্টান্তে দেখা গেল পৃথিবীতে দুই প্রকারের পদার্থ বা

প্রক্রিয়া রহিয়াছে—পৃথকত্ব ও বিরুদ্ধতা। কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তু বিরুদ্ধতার (Negation) সম্বন্ধ থাকিতেও পারে; যেমন সত্য অসত্যের মধ্যে। কিন্তু বস্তুতে বস্তুতে তাহা ব্যতীত অল্প যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা বিরুদ্ধতা নয়, পৃথকত্ব (Distinctiveness) মাত্র। একটী বস্তু অপর বস্তু হইতে বিভিন্ন মাত্র, যেমন সত্য ও সৌন্দর্যের মধ্যে বিরুদ্ধতা, অসামঞ্জস্য বা শত্রুতা আমরা কল্পনা করি না। এই পৃথকত্ব ভেদও (Difference) বিশ্বের একটী তত্ত্ব বটে। কাজেই স্থিতি ও প্রতিস্থিতির মধ্যে কেবলমাত্র বিরুদ্ধতাকেই (Opposition) বলা যায়। এর মধ্যে বিনাশকেই (Negation) এক মাত্র সত্য বলিয়া নির্ধারণ করায় এই ডায়ালেকটিক একপেশে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উইলিয়াম জেম্‌স্ (William James) নামক আমেরিকার (১৯শতাব্দীর) বিখ্যাত দার্শনিকও এই বিনাশ বা বিরোধিতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমাদের দেশের শ্রোত্রে হেগেলীয় দার্শনিক ব্রেজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'New Essays in criticism' এবং 'Positive Science of the Hindus'-এ হেগেলের এই অবাস্তব তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন।

তৃতীয় নীতিও (পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সঙ্গতিশীল বলিয়া বিবেচিত হয় না। পরিমাণের ক্ষুদ্র পরিবর্তন হইতে ক্রমসঞ্চিত পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে এক সময় হঠাৎ গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়া যায়—একথা সঠিক নয়। আমরা বলিতে চাই পরিমাণ (Quantity) এবং গুণ (Quality) একই সঙ্গে জড়িত হইয়া বিদ্যমান; যখন পরিমাণের ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনও ঘটে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে গুণেরও পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। পরিমাণের পরিবর্তন অর্থই আনুষঙ্গিক গুণগত পরিবর্তন। কাজেই

রিমাণগত পরিবর্তন জমিয়া জমিয়া এক সময়ে আকস্মিকভাবে গুণের পরিবর্তন হয়, তাহা ঠিক নয়।

এই প্রসঙ্গে জৈন দর্শনের “অনেকান্তবাদ” বা “শ্রাদ্ধবাদ” নামক তত্ত্ববাদের আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতির সহিত জৈন ডায়ালেকটিক বা অনেকান্তনীতির কোন সাদৃশ্য নাই। আমাদের দেশের কোন কোন মাক্সবাদীরা জৈন অনেকান্তবাদকে ভুল বোঝিয়া বা স্বেচ্ছায় বিকৃত করিয়া ইহাকে মাক্সীয় বা হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতির সমর্থক বলিয়া প্রচার করেন। জৈন অনেকান্তবাদ অ্যারিষ্টটলের প্রদাত্যনীতি (Law of Identity)কে বজায় রাখিয়া প্রত্যেক বস্তুই যে অপর বস্তুরাজির সহিত সম্পর্কিত তাহাই প্রচার করিয়া থাকে! কোন বস্তুকে বুঝিতে হইলে, ইহা কী এবং কী নয় এই দুই তত্ত্বই বুঝিতে হইবে। ‘ঘট’কে বুঝিতে হইলে ঘট কি কেবল তাহাই বুঝিতে চলিবে না, ঘট যে বৃক্ষ নয়, টেবিল নয়, খাট নয়, তাহারও জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু একই অর্থে, একই সময়ে কোন বস্তু হাঁ এবং না দুইই হইতে পারে না। তবে বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন দৃষ্টিতে একই বস্তু সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কল্পনা বা বিবৃতি করা চলে। নাম সম্বন্ধে ভাল এবং মন্দ দুইই বলা চলে, কিন্তু একই অর্থে একই স্থানে দুই একই কালে নয়। যেমন নাম দৈহিক বিষয়ে ভাল হইতে পারে এবং একই সঙ্গে অন্য অর্থে—যেমন বুদ্ধির বিষয়ে ভাল নাও হইতে পারে, কিংবা একসময়ে নাম ভাল হইলেও অন্য সময়ে নাম মন্দ হইতে পারে।

এই তত্ত্বটি জৈন অনেকান্তের মূল কথা। “অনেকান্তবাদ” অর্থ এই যে পৃথিবীতে কোন বস্তু বা ভাবই “একান্ত” বা Absolute নয়। প্রত্যেক বস্তুই অন্য সব বস্তুর অপেক্ষা রাখে অর্থাৎ জগতের প্রত্যেকটি বস্তুই একে অন্নের সহিত এমন ভাবে জড়িত ও সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ যে কোন একটিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আলাদা করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। টেবিলকে

বুঝিতে হইলে যে সব বস্তু টেবিল নয় বা না-টেবিল তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। অর্থাৎ টেবিল সম্বন্ধে পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান তখনই হইতে পারে যখন খাট, পালঙ্গ, চেয়ার দরজা, আল ইত্যাদি সব বস্তু হইতে টেবিলকে আমি পৃথক করিয়া চিনি লইতে পারি। যতক্ষণ এই পার্থক্যজ্ঞান না হয় ততক্ষণ বস্তু স্বরূপ জ্ঞানও পূর্ণভাবে হইতে পারে না। তাই পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু জ্ঞানের সহিত প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান জড়িত। তাই 'হাঁ'-র জ্ঞান ও 'না'-র জ্ঞান, ইতি-বাচক ও নেতি-বাচক জ্ঞান এই দুই প্রকারের জ্ঞান সম্পর্কিত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে বিভিন্ন ভাবে জানা অসম্ভব। এই মতবাদকে দার্শনিক আপেক্ষিকতাবাদ (Relativity) বলা যায়। জৈনদর্শনের অনেকান্তবাদ এই আপেক্ষিকতাবাদ বই আর কিছু নয়। হেগেলের বিনশন (Negation) এবং জৈনদর্শনের 'নাস্তি-তত্ত্ব' এক জিনিষ নয়।

এই অনেকান্তবাদ সাতটি ধাপে সম্পূর্ণ একটি যুক্তির দ্বারা এই উপরোক্ত তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কারণে, এই যুক্তিকে “সপ্তভঙ্গী গ্রায়” বলা হইয়া থাকে।

(১) প্রথম ভঙ্গ :- শ্রাদ্ অস্তি এব সর্বন্ ইতি সদংশ-কল্পন-বিভজনে প্রথমোভঙ্গঃ। অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া যাক “সব বস্তুই আছে”। এখানে সত্তার দিকে বা অস্তিত্বের দিককে ধরিয়া লইয়া তাহার উপরেই জোর দেওয়া হইতেছে। ইহাই প্রথম ভঙ্গ বা ধাপ। অর্থাৎ, অংশতঃ এক অর্থে (In a certain sense) একটি বিশেষ দিক হইতে “ঘট আছে” এ কথা বলা চলে।

(২) দ্বিতীয় ভঙ্গ :- শ্রাদ্ অস্তি এব সর্বন্ ইতি পর্যুদাস-কল্পন-বিভজনে দ্বিতীয়া ভঙ্গঃ। অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া যাক “সব বস্তুই নাই”। এখানে পর্যুদাস বা অস্বীকৃতির দিক বা না-থাকার দিককে ধরিয়া লইয়া

তাহার উপর জোর দেওয়া হইতেছে। ইহাই দ্বিতীয় ভঙ্গ। অর্থাৎ, অংশতঃ (partly) কোন বিশেষ অর্থে (in a certain sense) একটি বিশেষ দিক হইতে “ঘট নাই” এ কথা বলা চলে।

(৩) তৃতীয় ভঙ্গঃ—শ্রাদ্ অস্তি এব শ্রাদ্ নাশ্রিত্তি এব ইতি ক্রমেণ সদংশাসদংশ কল্পনা-বিভাজনেন তৃতীয়োভঙ্গঃ। অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া যাক্ ‘আছেও বটে নাইও বটে’ এখানে অস্তিত্বের দিক ও নাশ্রিত্ত্বের দিক, আছে এবং নাই এই দুই দিক কল্পনা করিয়া লইয়া দুইদিকের উপরেই সমান জোর দিলে তৃতীয় ভঙ্গ হইবে। অর্থাৎ অংশতঃ (partly) কোন বিশেষ অর্থে বস্তু আছে এবং অপর কোন বিশেষ অর্থে বস্তু নাই বলা চলে।

(৪) চতুর্থ ভঙ্গঃ—শ্রাদ্ অব্যক্তম্ এব ইতি সমসময়ে বিধিনিষেধয়োঃ অনির্বচনীয় কল্পনা বিভাজনেন চতুর্থ ভঙ্গঃ। অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া যাক “সব বস্তুই অব্যক্তব্যও বটে” এখানে একই কালে Positive ও negative, বিধি ও নিষেধ, স্বীকার ও অস্বীকার এই দুই প্রকার বিপরীত উক্তির জগ্ অনির্বচনীয় বলিয়া কল্পনা করাও জোর দেওয়া হইয়াছে, ইহাই চতুর্থ ভঙ্গঃ।

অর্থাৎ অংশতঃ বা কোন বিশেষ অর্থে ঘটটি অনির্বচনীয়। বাস্তবিকই এক অর্থে ঘটকে বর্ণনা করা অসম্ভব। এক অর্থে যেমন “আছে” বলা চলে তেমনি অগ্ অর্থে নাই বলাও চলে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঠিক যে একই মুহূর্তে এই বিরুদ্ধ উক্তি দ্বারা আসল বস্তুটিকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই বলা হইতেছে যে কোন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ভাষার অতীত বা অনির্বচনীয় বা অব্যক্তব্য।

(৫) পঞ্চম ভঙ্গঃ—শ্রাদ্ অস্তি এব শ্রাদ্ অব্যক্তব্যম্ এব ইতি বিধি প্রাধাত্মেন যুগপদ বিধিনিষেধানির্বচনীয়-খ্যাপনা-কল্পনা-বিভাজনেন পঞ্চমো ভঙ্গঃ। অর্থাৎ কোন একবিশেষ অর্থে ঘট আছে ইহাও বলা চলে, আবার কোন এক বিশেষ অর্থে “ঘট” অনির্বচনীয় ইহাও বলা চলে।

(৬) **ষষ্ঠ ভঙ্গ** :—শ্রাস্তি এব শ্রাদ্ অবস্তবাম্ এব ইতি নিষেধ প্রাধায়েন যুগপদ নিষেধাবিধি-অনির্বচনীয়-কল্পনা-বিভজনয়া ষষ্ঠোভঙ্গঃ অর্থাৎ, কোন এক অর্থে ঘট নাই এবং কোন অপর অর্থে “ঘটটি অনির্বচনীয়” ইহাও বলা চলে ।

(৭) **সপ্তম ভঙ্গ** :—শ্রাদ্ অস্তি এব শ্রাদ্ নাস্তি এব শ্রাদ্ অব্যক্তবাম্ এব ইতিক্রমাৎ সদংশাসদংশ প্রাধায়ে কল্পনয়া যুগপদ বিধিনিষেধানির্বচনীয় খ্যাপন কল্পনা বিভজনয়া চ সপ্তমোভঙ্গঃ । অর্থাৎ কোন অর্থে “ঘট আছে” অথবা কোন অর্থে ঘট নাই এবং অপর এক অর্থে ঘট অনির্বচনীয় ।

উপরোক্ত সপ্তভঙ্গী গ্রামের তাৎপর্য এই যে একই অর্থে একই স্থানে ও কালে দুইটি বিরুদ্ধগুণের অস্তিত্ব সম্ভব নয় । কিন্তু বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন স্থানে ও কালে বিরুদ্ধ সংজ্ঞা একই বস্তু সম্বন্ধে প্রয়োগ করা সম্ভব । জৈন অনেকান্তবাদ বলে যে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর পার্থক্য আছে এবং পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধও আছে । এক অর্থে যেমনি ভেদ আছে অথবা অর্থে তেমনি অভেদও আছে । জৈন দর্শন জগদ্ব্যাপী সম্বন্ধ-জালের অস্তিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছে । পৃথিবীতে ভেদ ( Distinction ) যেমন আছে তেমনি অভেদ ( Relation ) সম্পর্কও রহিয়াছে । জৈন দর্শনের এই তত্ত্ব সম্বন্ধে কাহারই কোন আপত্তি থাকিতে পারেনা । কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শনের ডায়ালেকটিক যে ভাবে বিনাশ বা প্রতিস্থিতির অর্থ পরিকল্পনা করিয়াছে তাহাতে আতিশয্য দোষ ঘটয়! এই দর্শন ক্রটিযুক্ত হইয়াছে । হেগেলীয় দর্শন যদি ভেদাভেদ-তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা করা হয় তবে এই ক্রটি থাকে না । কিন্তু মার্ক্সবাদীগণ যে অর্থে ডায়ালেকটিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহাতে ডায়ালেকটিকতত্ত্ব একপেশে হইয়া দাঁড়ায় ।



জড়বাদ ( Materialism )

জড়বাদ বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হয় না। ১৮ শতকে জড়বাদের প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। ঐ সময় লা মেট্রি ( La Mettri ) হেলভেসিয়াস ( Helvetius ) প্রমুখ পণ্ডিতেরা ( Encyclopedist ), জড়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ যুগ নূতন জড়বিজ্ঞানের যুগ ও যন্ত্রের যুগ। মানুষকে, সমাজকে, প্রাণীমাত্রকে, উদ্ভিদকে, নূতন বৈজ্ঞানিকরা যন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন। আত্মা বা মন তাহাদের কাছে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নয়। শুধু জড় কোষগুলিরই সমবায়ের ফলমাত্র। কিন্তু ১৯ শতকের শেষ দিকে বায়লজি (Biology) নামক জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমেই বৈজ্ঞানিকদের মূল ভাঙিতে লাগিল। জীববিজ্ঞানীরা পূর্বে মনে করিতেন, প্রাণশক্তি জড় বস্তু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা বলিতেন যে কোন বস্তু পাচিয়া গেলে কিছুদিনেই তাহার মধ্যে কীটশ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইহাতেই তাহারা ধারণা করিয়াছিলেন যে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়। এই মতকে জীববিজ্ঞানীরা জড়জবাদ ( Abiogenesis ) নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন।)

কিন্তু কিছুদিনের গবেষণার ফলেই ইহা প্রমাণিত হইল (যে জড় বস্তু হইতে প্রাণশক্তির উৎপত্তি কোন সময়েই হয় না।) জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে বাতাসে জীবন্ত ও সূক্ষ্ম বীজাণু রহিয়াছে। এই সব বীজাণু পচা ( Putrefied ) বস্তু হইতে খাণ্ড-গ্রহণ করিয়া কীটরূপে আবির্ভূত হয়। আসলে বায়ু-নিরুদ্ধ আঁধারের মধ্যে মৃতদেহ বা পচাবস্তু হইতে কোন কালেই জীবন্ত কীটের উদ্ভব হয় না। পাস্তুর (Louis Pasteur) ফরাসীদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি ঊনবিংশ শতকে জড়বাদকে সর্বশেষ আঘাত দিলেন। তাহার জীববৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার প্রমাণিত করিল যে প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হয় ( Life out of Life ) অর্থাৎ প্রাণজবাদ ( Biogenesis ) নামক মতবাদই সত্য।

মানুষ এখন পর্যন্ত জগতের সমস্ত রহস্যভেদ করিতে পারে নাই মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। কাজেই যে যুগে মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞান যতটুকু রহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছে ততটুকু সত্যকে সম্বল করিয়াই সেই যুগে মানুষকে চলিতে হয়। মানুষের অভিজ্ঞতা (Experience) যুক্তি ও পরীক্ষা—এই তিনটি উপায়ে যে সত্য সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সত্যই সেই যুগের বৈজ্ঞানিক সত্য। কাজেই বর্তমান জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে যে সত্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জড়বস্তু হইতে প্রাণের উৎপত্তির সমর্থন পাওয়া যায় না।

মানুষের অভিজ্ঞতায় কখনও দেখা যায় নাই যে অতীত কালে বা বর্তমানে পৃথিবীতে জড় হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে যাহারা এ কথা বলেন, তাহারা মানুষের যুগান্তব্যাপী অভিজ্ঞতা হইতে এ সম্বন্ধে কোন নজীর দেখাইতে পারিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ পাস্তুর প্রমুখ জীববিজ্ঞানীদের পরীক্ষায়ও জড়বাদের সমর্থন মিলে নাই এবং প্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তির প্রস্তাবই অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা দুই দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, যুক্তির দ্বারাও জড়বাদ সমর্থিত হয় না। জড়বাদী বলেন যে অজ্ঞাত অতীতকালে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে পৃথিবীর বিশেষ কোন অবস্থায় একদা মাত্র জড় হইতে প্রাণের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। এখন বর্তমান কালে কেন কোথাও জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়না তাহা প্রশ্ন করিলে জড়বাদী বলেন, এখন প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে কাজেই এখন আর জড় হইতে প্রাণের উদ্ভবের প্রয়োজন নাই; তাই আমাদের অভিজ্ঞতায় এখন এমন ঘটনা ঘটেনা। ) কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে বিজ্ঞানের প্রথম আবিষ্কার হইল এই যে প্রকৃতির নিয়মগুলি চিরন্তন ও শাশ্বত প্রাকৃতিক বিধানের কোন সময়ে কোন ব্যতিক্রম হয় না, তাহার

চিরকাল একই ভাবে অব্যর্থরূপে কাজ করিয়া যায়। কাজেই পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ বছর পূর্বে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছিল, একথা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। কিছুক্ষণেবু জন্ম জড় হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় এবং তাহার পর ঐ নিয়ম নাকচ হইয়া যায় একথা হাস্যকর। প্রকৃতি খামখেয়ালী ও উচ্ছৃঙ্খল নয় ইহাই বিজ্ঞানের ভিত্তি। কাজেই জড়বাদের এই উক্তি নিতান্ত অযৌক্তিক ও বিজ্ঞান-বিরোধী গৌজামিল মাত্র।

এই কারণে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি জীব-বিজ্ঞানীরা আজকাল সমর্থন করেন না। স্বার্থ বা ব্যক্তিগত রুচির জন্য কোন কোন বিজ্ঞানী এখনও জড়বাদকে মানিয়া লইয়াই চলিয়াছেন। কিন্তু ডার্কইন, বেগস, পাস্তুর, ড্রিস, জে, এস, হ্যালডেন, জে, এ, টমসন্ (Darwin, Bergson, Pasteur, Driesch, J. S. Haldane, J. A. Thompson) প্রমুখ জীব-বিজ্ঞানীরা আজ জড়বাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাণশক্তি জগতের ও সৃষ্টির একটা মৌলিক ও আদিম শক্তি। তাহার নিত্য নূতন পথে নব নব রূপে ক্রমবিকাশ হইতেছে। এই ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে নানা উদ্ভিদ, নানা শ্রেণীর প্রাণী, জীবজন্তু ও মানব আবির্ভূত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বেগসেঁ তাঁহার অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও দার্শনিক মনোভা দ্বারা বর্তমান যুগে জড়বাদকে খণ্ডন করিয়া প্রাণশক্তির জটিল সৃষ্টিশক্তিকে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার বইগুলি (Creative Evolution, Matter and Memory ইত্যাদি) বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের ও দর্শনের স্তম্ভস্বরূপ। প্রাণশক্তিকে তিনি Elan Vital আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে এই Elan Vital আপন অন্তর্নিহিত শক্তির উচ্ছ্বাসে

আপনাকে নানা সৃজনের মধ্য দিয়া বিচিত্ররূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। তাই এই ক্রমবিকাশ সৃজনপর (Creative Evolution)। এই ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ স্তরে জড়বস্তু দেখা দেয়।

তবু বর্তমান কালেও ক্রাউথার (Crowther) ও জে, বি, এস, হ্যালডেন (J. B. S. Haldane) প্রমুখ লেখকেরা জড় হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ ধরিয়া লইয়াই চলিতে চাহেন। তাহারা বলিতে চাহেন যে

যান্ত্রিক জড়বাদ (Mechanistic materialism) প্রমাণ করিতে না পারিলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধার জন্ত জড়বাদী ও যান্ত্রিকনীতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব। জড় হইতে প্রাকৃতিক নিয়মে

ও কার্যকারণ শৃঙ্খলার অব্যর্থ পরিণামে প্রাণ ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। এই পদ্ধতিকে (Mechanistic Theory) অনুসরণ করিয়াই বিজ্ঞানীদের চলা উচিত, নতুবা গবেষণা ও পরীক্ষা চালাইবার কোন সুবিধা বা কারণ থাকে না।

কিন্তু ইহারাও জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্তমানের বিজ্ঞানের যে গভীর অজ্ঞতা রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জড়বাদী জে, বি, এস, হ্যালডেন (J. B. S. Haldane) ও স্বীকার করিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও কেবল মাত্র যান্ত্রিক পদ্ধতিকে স্বীকার করিয়াই বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতে পারে না, বরং প্রাণশক্তির সামঞ্জস্য-বিধায়িনী শক্তিকে (Harmonising power) স্বীকার করিয়াই বিজ্ঞানের গবেষণা ও পরীক্ষা আজকাল সম্ভব হয়। হ্যালডেনের উক্তিতে তাই পাই—\* “কারণ সামান্য কিছু দূর অগ্রসর হলেই দেখা যাবে যে মতামতে কেউ কঠোর যান্ত্রিকতাবাদী হলেও কার্যতঃ অল্প আরেকটি নীতি গ্রহণ না করলে চলেই না।”

\* ‘For when one gets a little further one finds that even if one is a rigid mechanist in theory, in practice one needs another principle.’ (J. B. S. Haldane)

প্রাণীদেহ কেবলই যন্ত্রমাত্র নয়, কেবলমাত্র জড় ( Matter ) এবং গতির ( Motion ) যান্ত্রিক ও অন্ধগতির প্রতিঘাতের ফল বলিয়া প্রাণীদেহকে বৃত্তিতে চেষ্টা করিলে বিফল হইতে হইবে। হ্যালডেন ( Haldane ) বলিতেছেন— “জীবদেহ শুধু যন্ত্রই নয়, যন্ত্র বা মেশিনের থেকেও অতিরিক্ত কিছু।”†

ক্রাউথার ( Crowther ) অনুমান করিতেছেন যে কোলয়ড ( Colloid ) যে নীতিতে গঠিত হয় সেই নীতিতেই কোলয়ড হইতে প্রাণ-কণিকা হয়তঃ একদা সৃষ্টি হইয়াছিল। তবে কিরূপে হইয়াছিল এ প্রশ্নের জবাবে ‘জানিনা’ একথা ছাড়া অন্য জবাব দিতে পারেন নাই। ক্রাউথারের ভাষণ— ‡ “কোলয়ড থেকে যে কি করিয়া কোন কোন ধাপে পার হইয়া যে প্রাণ-কণিকা বিবর্তিত হইয়া উঠিল তাহা আজও অজ্ঞাত।”

এইরূপে বীজানু ( Bacteria ) লইয়াও এই দল খুব আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু ক্রাউথারই বিজ্ঞানের অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিতেছেন যে, কি ভাবে যে জীবাণু জটিল পদার্থ নিঃসরণ করিয়া নানা বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার খেলা দেখায় তাহা রসায়ন শাস্ত্রের অজ্ঞাত। “ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণু জারক-রসগুলির মধ্যে যে সব জটিলবস্তু নিঃসারণ করিয়া দেয় তাহা রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত করিবার দিন আজো বহু দূর।”¶

† ‘Organism is something more than a machine.’

‡ ‘The exact steps of evolution from colloid to living particle are not yet known.....’

¶ “Chemists are far from able to make the complicated substances bacteria exude into fermenting juices.”

এক কথায় রসায়ন বিজ্ঞান যে তিমিরে সে তিমিরেই আছে। ১৮ শতকে যে যান্ত্রিক জড়বাদ অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সৃষ্টি-রহস্যকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, বিংশ শতকের বিজ্ঞানের আজ সেই গর্ব ধূলিসাৎ হইয়াছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী প্রাণবাদকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী আজও সংস্কার ও গর্বকে ছাড়িতে না পারিয়া এখনও জড়বাদ ও যন্ত্রবাদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন।

জড়বাদীরা আর একটি যুক্তি দিয়া থাকেন ভূতত্ত্ব হইতে। পৃথিবী এক সময় জ্বলন্ত বাষ্পময় ছিল। তখন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তারপর পৃথিবী কিছু শীতল হইলে অন্তকূল

ভূতত্ত্ব  
(Geological)

আবহাওয়ার এক সময় প্রথম প্রথম কণিকা উদ্ভূত হয়। ইহাতেই জড়বাদীদের মতে প্রমাণ হয় যে

আগে জড় পৃথিবী এবং পরে পৃথিবীতে সূক্ষ্ম আকারে প্রাণের উৎপত্তি হয়। আগে জড় বস্তু, পরে প্রাণশক্তি। জড়বাদীদের এই যুক্তির কোন সঙ্গত ভিত্তি নাই। অতি আদিমকালে যখন জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র ছিলনা, তখন কি প্রকারে কোন্ পথে প্রথম প্রাণ-কণিকার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা আজ জানিবার উপায় নাই। শুধু কল্পনা ও অনুমান করা চলে কিন্তু পরীক্ষামূলক প্রমাণ দিবার পথ নাই। যুক্তির সাহায্যে ও বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে সর্বাপেক্ষা অধিক সঙ্গত মতবাদকেই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রাণের শক্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গঠিত হইয়াছে এই পৃথিবীর বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে। এই পৃথিবীতে আমরা যত প্রকার প্রাণী দেখিয়াছি এবং প্রাণীদের যে প্রকার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি তাহা হইতেই অনুমান করিয়া লইয়াছি প্রাণের ধর্ম ও

বিশেষত্ব কি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অগণিত তারা, নক্ষত্র ও লোকলোকান্তরের মধ্যে আমাদের পৃথিবী একটি নগণ্য ধূলিকণামাত্র। অপর কোন লোক সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। কেবল এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর অভিজ্ঞতা হইতে আহরণ করিয়া যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে তাহাই সম্বল করিয়া প্রাণ সম্বন্ধে চরমতত্ত্ব জানিবার দাবী করা অযৌক্তিক। পৃথিবীতে আমরা জড়বস্তুর সহিত অসম্পর্কিত স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রাণের প্রকাশ দেখি না। যেখানেই প্রাণ আছে সেখানেই স্থূল দেহও আছে। দেহ ব্যতীত কোন প্রাণ আমাদের চোখে পড়ে না। প্রাণকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইলে কোন না কোন উপযুক্ত আধার বা আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইতে হয়। হয় উদ্ভিদ-দেহ, নতুবা জন্তুদেহ, কিংবা মানবদেহ—কোন না কোন স্থূল আশ্রয়ের সহিত জড়িত হইয়া প্রাণ প্রকাশিত হয়। এই পৃথিবীর অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই আমরা জানিতে পাই। (কাজেই যতদিন পৃথিবীতে যোগ্য আধার গঠিত হইবার উপায় ছিল না ততদিন প্রাণেরও প্রকাশিত হইবার উপায় ছিল না।) মূল জীবদেহ গঠিত হইয়াছে পৃথিবীর কোন এক বিশেষ অবস্থায়। তাহা ধরিয়া লইলে প্রাণশক্তিও সেই বিশেষ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। তাহার পূর্বে আমরা বর্তমান আকারে ও রূপে প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখি নাই। যেমন রেডিও যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে আমরা রেডিও তরঙ্গের অস্তিত্ব জানিতাম না। কিন্তু রেডিও তরঙ্গ পূর্বেও ছিল, কেবল উপযুক্ত যন্ত্রের (Apparatus) অভাবে সেই তরঙ্গের কোন বাহ্য অভিব্যক্তি আমরা দেখিতাম না। ইহা হইতে একথা প্রমাণ হয় না যে পূর্বে রেডিও তরঙ্গ বিद्यমান ছিল না। আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে আমাদের ইন্দ্রিয়ে ঐ তরঙ্গের সূক্ষ্ম অস্তিত্ব ধরা পড়ে নাই। সেইরূপ

জড় উপাদানের একটা বিশেষ অবস্থায় যখন স্থূল জীবদেহ গঠিত হওয়ার সম্ভব হইল তখনই সেই দেহকে আশ্রয় করিয়া প্রাণশক্তি আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার পূর্বেও ছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে ভিন্ন স্বরূপে ও ভিন্ন প্রকৃতিতে। প্রকাশ ছিল না এই কারণে তাহার অস্তিত্বও ছিলনা, যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকাশ এবং অস্তিত্ব এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু অস্তিত্ব থাকিলেও প্রকাশ না থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকাশ থাকিলে আমরা অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া থাকি। এই কারণে এক সময়ে বর্তমান আকারে ও দেহে প্রাণের প্রকাশ না থাকিলেও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল মানুষের ইন্দ্রিয় গোচর না হইয়াও। বিশেষতঃ বর্তমান বিজ্ঞানের পরীক্ষায় জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি (জড়জবাদ—Abiogenesis) হয় না বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিব? না যাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রত্যাখ্যাত তাকে হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই অতীত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব? আমাদের মতে বর্তমানে স্বীকৃত ও গৃহীত প্রাণজবাদ (Biogenesis) তত্ত্বের উপরেই অতীত ইতিহাসও গঠিত হওয়া উচিত। যাহা প্রকৃতিতে আজ ঘটিতেছে তাহা পূর্বেও ঘটিয়াছে। জড় হইতে প্রাণ উৎপন্ন অতীতে হইলে বর্তমানেও হইত। অতীতে কেবল বিশেষ এক সময়ে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তাহা এখন আর হয় না, একথা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কাজেই পৃথিবীর উত্তম অবস্থায়ও প্রাণ কূটস্থ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল এই সিদ্ধান্তই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসন্মত।

জড়বিজ্ঞানীরা ১৯শতক পর্যন্ত জড়বাদ ও যান্ত্রিক মতবাদেরই সমর্থক ছিল। কিন্তু জড়-বিজ্ঞান অর্থাৎ রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান বর্তমানে যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে জড়বাদ আজ



বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাও সমর্থিত হওয়া খুস্কিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।  
 বর্তমান বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান-শাস্ত্র ( **Physics** )  
 পদার্থ বিজ্ঞান  
 ( **Physics** ) আজ জড় বস্তুকে একটা অজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য পদার্থে  
 পরিণত করিয়াছে। বর্তমান পদার্থ-বিজ্ঞান ও  
 ( **Physics** ) আজ জড়বাদকে সমর্থন করে না। ইহা বড় বড়  
 বৈজ্ঞানিক মহারথী, যথা—এডিংটন ( **Eddington** ) হোয়াইটহেড,  
 ( **Whitehead** ) জেমস জীনস ( **James Jeans** ), বাট্রাণ্ড রাসেল  
 ( **Bertrand Russel** ), ওলিভার লজ ( **Oliver Lodge** ), ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক  
 ( **Max Planck** ), আয়েনষ্টাইন ( **Einstein** ) প্রমুখগণ বলিতেছেন।  
 পদার্থ বিজ্ঞানের আধুনিক পরিণতি এই হইয়াছে যে জড়ভূত বা **Matter** স্থূল  
 ওজনদার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভারী পদার্থ আর নয়। জড়ভূত বা **Matter**কে  
 বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞানীরা দেখিতেছেন পৃথিবীর উপাদান জড়ভূত (**Matter**)  
 আর জড়পদার্থ নয়। জড়ভূত (**Matter**) সূক্ষ্ম শক্তির পূঞ্জীভূত বাহুরূপ মাত্র।  
 ইলেকট্রন, প্রোটন ( **Electron, Proton** ) এই দুই প্রকারের বৈদ্যুতিক  
 শক্তি আমাদের কাছে জড়বস্তুর রূপ ধরিয়া দেখা দিতেছে। ১৯১১ সাল  
 হইতে এই ইলেকট্রন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া বিজ্ঞান জগতে বিপ্লব সাধন  
 করিয়াছে। তাই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানের মহারথীদের মধ্যে এডিংটন, হোয়াইট-  
 হেড, জীনস ইত্যাদি বলিতেছেন যে (বিশ্বজগতের আড়ালে এক সর্বব্যাপী  
 মহামন রহিয়াছে যাহার চেতনা ও শক্তি সৃষ্টিক্রমেই প্রকাশিত  
 হইতেছে। এমন কি যুক্তিবাদী রাসেল পর্যন্ত বলিতেছেন যে জড়বাদের  
 মৃত্যু হইয়াছে। ) তাঁহার মতে বিশ্বসংসারের আড়ালে এমন এক  
 সত্তা আছে যাহার দুইদিক হইল জড় এবং চৈতন্য। একই সত্তা একদিক হইতে  
 জড় এবং অণুদিক হইতে মন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এ বিষয়ে সকলেই  
 একমত যে জড়বাদ আজ বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না।

আসল কথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। মানুষের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞা যতদূর পর্যন্ত যায় তাহা হইতে অনেক দূর বিজ্ঞান তাহার যন্ত্রপাতিস যাইতে পারে না। বিজ্ঞানের মূলনীতি হইল কার্যকারণবাদ বা Causality এই মূলনীতিও আজ নববিজ্ঞানের আলোকে ক্রটিযুক্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। অনিশ্চয়তাবাদ বা Theory of Indeterminism আসিয় বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাহার পর Theory relativity বা আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কার করিয়া বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান আইনষ্টাইন জড়বাদ ও সনাতন প্রাকৃতিক নিয়মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তির এক সমাধান দিয়াছে এবং পূর্ববর্তী যান্ত্রিক জড়বাদ (Mechanistic Materialism) হইতে ইহা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া দাবী করিয়াছে। কিং যদিও মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ দাবী করেন যে তাঁহাদের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ প্রকৃতপক্ষে নূতন ও যান্ত্রিক জড়বাদ হইতে পৃথক তবুও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এই মার্ক্সীয় জড়বাদও যান্ত্রিক জড়বাদেরই নামান্তর মাত্র। জড় হইতে প্রাণ ও মনের উৎপত্তি হইবে এ' কথা এই উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। তবে যান্ত্রিক জড়বাদী মতে জড় হইতে বিশেষ একটা সমাবেশের জন্ম স্বভাবতঃই ও অব্যর্থক কার্যকারণ প্রভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়। অপরপক্ষে মার্ক্সীয় জড়বাদী মতে, জড় হইতে ডায়ালেক্টিক নীতি অনুসারে উচ্চতর একটা সমন্বয় বা Synthesis হিসাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়। মার্ক্সবাদী বলেন, প্রাণ ও মন উভয়ই একটা উচ্চতর আবির্ভাব মাত্র; অর্থাৎ জড়ের সমবায় পরিবর্ত হইতে হইতে কোন এক স্তরে প্রাণ ও মন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ নূতন বস্তুরূপে উদ্ভূত হয়। মার্ক্সবাদীর এই ডায়ালেক্টিক নীতি বস্তুতঃ জড় হইতে প্রাণ

আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করিতে বা বুঝিতে সহায়তা করেনা। (একটা উচ্চতর আবির্ভাব বা একটা আকস্মিক বিপ্লব বা একটা আমূল পরিবর্তন বলিলেই প্রাণের জন্ম-রহস্য উদ্ঘাটন করা হইল না।) সমস্তা সমস্তাই থাকিয়া গেল। আসল প্রশ্ন হইতেছে, জড় হইতে কিরূপে প্রাণের উদ্ভব হইল? এই প্রশ্নের কোনই সমাধান মার্ক্সীয় সূত্র বা Formula দ্বারা হইল না। বরং যান্ত্রিক জড়বাদ কারণিকবাদের (Law of Causality) উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং এই কারণে অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু মার্ক্সীয় মতবাদ বিজ্ঞানের কারণিকতার (Causality) বিরোধী। ডায়ালেক্টিক নীতির সহিত কারণিকতা (Causality) নীতির সামঞ্জস্য হয় না। একটিকে আনিলে অপরটিকে অগ্রাহ্য করিতে হয়। বিজ্ঞানের কারণিকতা নীতি বলে যে, কারণই কার্যরূপে আবির্ভূত হয়। কার্যের (effect) ভিতরেই এমন কোন কিছু নাই যাহা কারণের মধ্যে উপস্থিত ছিল না। যাহা কারণের মধ্যে ছিল তাহাই কার্যরূপে দেখা দিয়াছে। বীজের মধ্যে যাহা ছিল তাহাই গাছরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীতে শক্তির সমষ্টি সর্বদাই একই প্রকার থাকে, পরিমাণ কখনও কম কখনও বেশী হইতে পারে না। শক্তির নিত্য সংরক্ষণ (Conservation of Energy) বিজ্ঞানের একটি মূল মন্ত্র। একই শক্তির রূপ হইতে রূপান্তর হয় মাত্র। এই নীতি অনুসারে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন কোন বস্তুর আবির্ভাব সম্ভব হয় না। জড় হইতে জড়ের সমবায়ে প্রাণের উৎপত্তি যদি সম্ভব হয় তবে বুঝিতে হইবে যে প্রাণ জড়েরই একটা রূপান্তর মাত্র। জড়ের সমস্ত উপাদান বা factor গুলি একত্র সমাবেশ করিলে প্রাণের উৎপত্তি হইতে বাধ্য। এই নীতিতে জড় জগতের বিধানই প্রাণের জগতেও কার্যকরী হইবে এবং যান্ত্রিক উপায়ে অব্যর্থভাবে জড় হইতে প্রাণ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। ডায়ালেক্টিক নীতি অনুযায়ী প্রাণ জড় হইতে উৎপন্ন হইলেও জড় হইতে উচ্চতর একটা

আবির্ভাব। স্থিতি (Thesis) ও প্রতিস্থিতি (Antithesis) হইতে যখন সমন্বিত-স্থিতি (Synthesis) আবির্ভূত হয় তখন সংস্থিতির (Synthesis) মধ্যে নূতন গুণের উৎপত্তি হয়। এইসব নূতন গুণ আসিল কোথ হইতে? মার্ক্সবাদী বলিবে, কোথা হইতে আসিল জানি না। কিন্তু পূর্বে য ছিল না এমন কিছু নূতন আবির্ভাব সর্বদাই ঘটতেছে। এই নূতন ও অজ্ঞেয় আবির্ভাব বিজ্ঞানের যান্ত্রিক কারণিকতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ ডায়ালেকটিক নীতিও এই সব আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা না করিয়া শুধু স্বীকার করিয়া ও বর্ণন করিয়াই খালাস। মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানের যান্ত্রিক কার্যকারণবাদকেও গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক অথচ আবার জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি বিজ্ঞান একদিন প্রমাণ করিবে বলিয়া ঘোষণাও করিতেছেন। আসলে জড়বাদ যান্ত্রিক হইতে বাধ্য। এঙ্গেল্‌স্ মার্ক্সবাদকে যে ভাবে “ডুয়েরিং-বিরোধী” (Anti-Duhring) নামক পুস্তকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে দ্বন্দ্বিক জড়বাদ যান্ত্রিক জড়বাদেই পরিণত হইয়াছে। সর্বশেষে দার্শনিক যুক্তিতেও জড়বাদ ভিত্তিহীন বলিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ জড়বাদকে খণ্ডন করিয়াছেন। জড় বা Matter কাহাকে বলে? জড়ের সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে কোন জড়বাদী পারেন নাই। যুগে যুগে জড়ভূতের স্বরূপ পরিবর্তন হইয়া আজ বিজ্ঞান এমন এক স্থানে আসিয়াছে যাহাতে জড়বস্তুর লক্ষণ বর্ণনা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

---

## তৃতীয় অধ্যায়

### ইতিহাসের জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যা (১)

#### (Materialistic Interpretation of History)

(মার্ক্সীয় দর্শন দ্বান্দ্বিক জড়বাদকে মানবসমাজের ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া মানবসভ্যতাকে ব্যাখ্যা করিয়াছে।) এই ব্যাখ্যাকে “ইতিহাসের জড়বাদীয় ব্যাখ্যা” বলা হয়। ইহাকে ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যাও বলা হইয়া থাকে। মানুষের ইতিহাসকে জড়বাদের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করায় এই তত্ত্বকে “ঐতিহাসিক জড়বাদ” বা “Historical Materialism”ও বলে।

এই মতানুসারে সমাজে বা ইতিহাসে যাহা কিছু ঘটে তাহা জড়শক্তি ও আর্থিক পারিপার্শ্বিকের দ্বারা সৃষ্ট হয়। ব্যক্তি বা মানুষের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। মানুষ যুগে যুগে যাহা কিছু করিয়াছে, যে ধর্ম, বিবাহ প্রথা, শিল্প, ইত্যাদি অর্থাৎ এক কথায়, যে সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সব কিছুই জড় পারিপার্শ্বিক (Material environment বা Economic environment) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া করিয়াছে।

যে যুগে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে স্তরে থাকে, সেই যুগে সমাজের জীবন এবং ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিবাহ-প্রথা অর্থাৎ সভ্যতাও সেই স্তরের অনুরূপ স্তরে থাকে।

মানুষের ইতিহাসের কয়েকটি স্তর বা যুগ দেখিতে পাই। (১) আদিমযুগ (২) প্রাচীন দাস-যুগ (৩) মধ্যযুগ (৪) আধুনিকযুগ। এইসব যুগে অর্থনৈতিক অবস্থাও যুগানুযায়ী ছিল। যথা—আদিমযুগে ছিল সাধারণ সম্পত্তি

বা কম্যুনিজ্‌ম্ । প্রাচীনযুগ ছিল দাসপ্রথা (Slavery) ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির, মধ্যযুগ সামন্ততন্ত্রবাদ বা Feudalism-এর এবং আধুনিকযুগ পুঁজিবাদ বা Capitalism-এর । ভবিষ্যৎ যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনষ্ট হইবে এবং আবার কম্যুনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠিত হইবে ।

একযুগ হইতে যখন অন্য অর্থনৈতিকযুগে পরিবর্তন ঘটে তখনই সমাজ-বিপ্লবও ঘটে । সমস্ত সমাজ-জীবনকে রূপদান করে সেই সমাজের অর্থনীতি । প্রত্যেক যুগের সংস্কৃতির রূপ, গুণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে সেই যুগের অর্থনৈতিক স্তরের উপর । (কোন যুগের অর্থনীতির স্তরের পরিবর্তন ঘটিলে সেই যুগের সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে । অর্থনীতি হইল কারণ এবং সংস্কৃতি (Culture) হইল তাহার কার্য বা ফল ।) (অর্থনীতির সহিত সংস্কৃতির ও সমাজ-জীবনের এই কার্য-কারণ সম্বন্ধই মার্ক্সীয় সমাজ-তত্ত্বের ভিত্তি । অর্থনীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটিলে সংস্কৃতিতে ও সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য ।) এই মতবাদকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদও (Economic determinism) বলা হইয়া থাকে ।

সমাজ-বিপ্লবও এই অর্থনীতি হইতেই উদ্ভূত হয় । কোন একযুগে অর্থনৈতিক শক্তি বা উৎপাদন শক্তি (Productive forces) অনুসারে মানুষে মানুষে সেই যুগের উৎপাদন-সম্বন্ধ (Productive Relation) স্থাপিত হয় । এই উৎপাদন-সম্বন্ধ অনুসারেই তদনুযায়ী সামাজিক-সম্পর্ক (Social relation) মানুষে মানুষে স্থাপিত হয় । এই সামাজিক-সম্বন্ধ বলিতে ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র ইত্যাদিকে বুঝায় । অর্থাৎ, উৎপাদন-সম্বন্ধ অনুসারে সামাজিক-সম্বন্ধ বা সাংস্কৃতিক-সম্বন্ধ (Culture relation) স্থাপিত হয় ।

অর্থনৈতিক শক্তি-সম্পদের মধ্যে যদি কোন পরিবর্তন হয় তখন নূতন উৎপাদন-সম্বন্ধ বা Productive relation স্থাপিত হয় । এই নূতন

উৎপাদন-সম্পর্কের যোগ্য নূতন সামাজিক-সংস্কৃতি স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু নূতন সামাজিক-সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি সহজে গঠিত হয় না। পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাই চলিতে থাকে। এদিকে নূতন অর্থনৈতিক শক্তির আবির্ভাব হওয়ায় সেই নবাগত অর্থনীতির সহিত পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা খাপ খায় না, উভয়ের মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ধীরে ধীরে সামাজিক-সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে নূতন অর্থশক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া। আর একটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে যে সমাজের এই সংঘর্ষ ও সামাজিক-বিপ্লব মানুষের মধ্য দিয়া মানুষ কর্তৃক সংগঠিত হয়। (নূতন অর্থশক্তি প্রথমতঃ কতকগুলি লোক কর্তৃক সৃষ্ট হয়। এই নূতন অর্থশক্তির প্রতিনিধি যে শ্রেণী তাহারা নূতন অর্থশক্তির বিকাশের জন্য নূতন সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করে।) (অপর পক্ষে পুরাতন অর্থশক্তির প্রতিনিধি পুরাতন শ্রেণীগুলি পুরাতন শ্রেণীগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়।) এই দুই বিরোধী শ্রেণী-স্বার্থের সংঘর্ষকে মার্ক্স নাম দিয়াছেন শ্রেণী-সংগ্রাম (Class Struggle)। এই সংঘর্ষের ফলেই পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া নূতন শ্রেণী নূতন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করে। এইরূপে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ-বিপ্লব ঘটে। ইহাকে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (Economic Interpretation of History) বলা হইয়া থাকে।

এই কারণে সামন্ততন্ত্র (Feudalism) নামক অর্থনৈতিক স্তর পূর্ববর্তী “আদিম কম্যুনিজ্‌ম” (Primitive Communism) নামক স্তরকে ধ্বংস করিয়া আবির্ভূত হয়। আবার সামন্ততন্ত্রের মধ্যে নূতন অর্থনৈতিক শক্তি অর্থাৎ নবাবিষ্কৃত বাষ্পশক্তি (Steam power) যখন সৃষ্টি হইল তখন পূর্ববর্তী উৎপাদন-সম্পর্ক (Productive Relation) ও সামাজিক-সম্পর্ক (Social Relation), এক কথায়, পূর্ববর্তী সমাজ-

ব্যবস্থা নূতন অর্থশক্তির বা বাষ্পশক্তির কার্যকারিত্বের সহায়ক না হইয়া পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। ফলে পূর্বতন “গিল্ড” বা শিল্পসমিতি-ব্যবস্থা ( Guild system ) ও সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের উপর নূতন সমাজ গড়িবার প্রয়োজন হইল। পূর্বসমাজের প্রতিনিধি শ্রেণী হইল সামন্তরাজাদের ( Feudal chiefs ) শ্রেণী। আর নবজাত বাষ্পশক্তির ব্যবহার-কারক নূতন শ্রেণী হইল নব-উদ্ভূত ধনিক শ্রেণী ( Capitalist ) বা বুর্জোয়া শ্রেণী ( Bourgeois )। তাই বুর্জোয়া পূঁজিবাদীশ্রেণী পূর্বতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িবার দাবী করিল। সামন্তশ্রেণী এবং বুর্জোয়া ধনিকশ্রেণীর এই সংগ্রামে বুর্জোয়াধা জয়ী হইয়া ধনিকতন্ত্রের সহায়ক নূতন সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করিল। বর্তমান যুগ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির যুগ, তাই এই যুগের সংস্কৃতিও ধনতান্ত্রিক ; ইহার পর ধনতন্ত্রের ভিতর আবার নূতন অর্থশক্তি ও নূতন শ্রেণী ( Proletarian বা সর্বহারা ) সৃষ্টি হইবে। এই নূতন শ্রেণী নূতন সমাজ-ব্যবস্থা দাবী করিবে। (ফলে ধনিক ও শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিকেরাই জয়ী হইবে এবং পূঁজিবাদী সংস্কৃতি ধ্বংস হইয়া নূতন সর্বহারা সংস্কৃতি সৃষ্টি হইবে।)

## সমাজবিবর্তনে দ্বান্দ্বিকনীতি বা ডায়ালেক্টিক্

সামন্ততন্ত্রের পর ধনিকতন্ত্র সকল দেশে ও সমাজে আসিয়াছে এবং আসিবে। ধনিকতন্ত্রের ( Capitalism ) পরে আবার সমাজতন্ত্রের সুর আসিবে ; এই প্রকারে সমস্ত সমাজেরই ক্রমবিকাশ ধাপের পর ধাপ, সুরের পর সুরকে অতিক্রম করিয়া ঘটিতেছে। এই সুর প্রবর্তন কেন হয়? মার্ক্স বলেন সমাজের ভিতরকার পরিবর্তনের পদ্ধতি বা মূলনীতি একটা আছে। সেই নীতি হইল ডায়ালেক্টিক্ নীতি। এই নীতি অনুসারে সব পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য। এই নীতি অনুসারে প্রথম অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থায়



পরিণতি ঘটে বিরুদ্ধতা ও বিনাশের ( Opposition, Contradiction and Negation ) মধ্য দিয়া। প্রথম স্তরের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ শক্তি ( Antithesis ) সৃষ্ট হয় এবং এই বিরুদ্ধ সত্তা বা প্রতিস্থিতি ( Antithesis ) পূর্বস্বরকে ( Thesis ) বিনষ্ট করে। পরে আবার এই স্তরের মধ্যেও একটা নূতন প্রতিস্থিতি গড়িয়া ওঠে, যাহার ফলে এই স্তরেরও বিনষ্টি হইয়া একটা নূতন স্তরের আবির্ভাব ( Synthesis ) ঘটে।

ইহাদের একটি ধাপকে বর্জন করিয়া নূতন স্তরের আবির্ভাব ঘটিতে পারে না। উপযুক্ত পরিবর্তন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ঘটিলে, তবেই পরবর্তী পর্যায়ের আগমন সম্ভব হইতে পারে। ক্রমবিকাশের গতি ও স্তরবিভাগ ডায়ালেক্টিকের সূত্রের দ্বারা বাঁধা আছে।

সামন্ততন্ত্রের যুগে রাজামহারাজার ( শ্রেণীর ) প্রাধান্য থাকে। এই যুগের শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে, এক কথায় সংস্কৃতিতে রাজা-মহারাজাদের শ্রেণী-প্রাধান্যের ছাপ থাকে। এই শ্রেণীকে বিনষ্ট করিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণী ( Bourgeois ) ধনতন্ত্রের প্রাধান্য স্থাপন করে। সামন্ততন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া ধনিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিপ্লবের মধ্য দিয়া হয়, তাই ইহাকে বুর্জোয়া বিপ্লব বলে। মধ্যবিত্তশ্রেণী রাজতন্ত্রকে সরাইয়া গণতন্ত্র ( Democracy ) স্থাপন করে। তাই এই বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবও ( Bourgeois Democratic Revolution ) বলে। পরবর্তী বিপ্লব ধনতন্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া সমাজতন্ত্র স্থাপন করিবে তাই পরবর্তী বিপ্লব “সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব” ( Socialist Revolution ) ; এবং শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা বুর্জোয়াদের ধ্বংসের পর এই সমাজতন্ত্র স্থাপিত হইবে তাই ইহাকে সর্বহারার বিপ্লব বা শ্রমিক বিপ্লবও ( Proletarian Revolution ) বলে। ধনিকতন্ত্র যে যে দেশে বধেষ্ঠরূপে বর্ধিত হইয়াছে সেইখানেই এই সর্বহারার বিপ্লব ঘটিতে পারে এবং সমাজতন্ত্র স্থাপিত হইতে পারে।

## চতুর্থ অধ্যায়

### ইতিহাসের জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যা (৫)

ঐতিহাসিক জড়বাদ অনুসারে (Historical Materialism) সংস্কৃতি ও সমাজ অর্থশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া স্তরের পর স্তর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। সংস্কৃতি বলিতে একটা জাতি বা সমাজের রাষ্ট্র, ধর্ম, পরিবার, কলা ও সাহিত্য ইত্যাদিকেই বুঝায়। অর্থনীতির রূপান্তরের সাথে সাথে এই সবগুলিরও রূপান্তর ঘটিতেছে ও ঘটবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহাদের ক্রমবিকাশকে বিচার করিলে ইহাদের অতীত রূপান্তর হইতে ভবিষ্যৎ রূপান্তরের আকৃতি ও প্রকৃতি ধরা পড়িবে। তাই সামন্ততন্ত্র ও ধনিকতন্ত্র এই দুই স্তরে যে সমাজ ও সংস্কৃতি তাহা বিলীন হইয়া (Negated) আগামীযুগে সর্বহারা সংস্কৃতি নামক নূতন সংস্কৃতি আবির্ভাব হইবে, ইহাই ঐতিহাসিক জড়বাদের মূলকথা।

এই নীতিকে অনুসরণ করিয়া মার্ক্সবাদ পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, ইত্যাদির অতীত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইহাদের কী রূপ হইবে তাহাও নির্দেশ করিয়াছে। নিম্নে ইহাদের মতবাদ দেওয়া গেল।

### মার্ক্সবাদী রাষ্ট্র-সংক্রান্ত থিয়োরী ( Theory of State )

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতবাদ এই যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রথা ( Private Property ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সমাজে যে সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন হইল তখন সমাজের শক্তিশালী নেতৃস্থানীয় লোকেরাই

সম্পত্তির মালিক হইয়াছিল ; সম্পত্তি-প্রথা উদ্ভবের সহিত দুইটি শ্রেণীরও উৎপত্তি হইল। যাহারা সম্পত্তির মালিক এবং যাহারা সম্পত্তিবিহীন। সম্পত্তির মালিক যাহারা তাহারাই নিজেদের সম্পত্তিকে নিরাপদে ভোগ করিবার জন্ত “রাষ্ট্র” নামক যন্ত্রের উদ্ভাবন করে। প্রচলিত ব্যবস্থা ও সম্পত্তিকে রক্ষা করিবার জন্ত এবং যাহারা এই ব্যবস্থার হানি করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

যুগে যুগে রাষ্ট্র তাই প্রতাপশালীশ্রেণীর আধিপত্যের সহায়ক হিসাবে সমাজে বিদ্যমান আছে। মার্ক্স তাহার বিখ্যাত “কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো” (Communist Manifesto) নামক পুস্তকে রাষ্ট্রকে “প্রবলতমশ্রেণীর” কর্মপরিষদ (Executive Committee of the dominating class) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। যে যুগে যে শ্রেণী আধিপত্য করে সেই যুগে সেই শ্রেণীর হাতের যন্ত্র হইল সেই যুগের রাষ্ট্র। সামন্তযুগে রাজামহারাজাদের আধিপত্য ছিল, এই যুগে রাষ্ট্রও ইহাদের হাতের যন্ত্র ছিল। আধুনিক যুগে ধনতান্ত্রিকশ্রেণীর আধিপত্য রাষ্ট্রকে এই শ্রেণীর একটি যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে।

ভবিষ্যৎ যুগে রাষ্ট্রের রূপ কী হইবে? সামন্তযুগে যেমন রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ তেমনই ধনতান্ত্রিকযুগে গণতন্ত্র (Democracy) রাষ্ট্রের রূপ। কিন্তু ইহার পরবর্তীযুগ সমাজতন্ত্রের যুগ। এই যুগে শ্রমিকদের প্রাধান্য হইবে অর্থাৎ সমাজের সমস্ত লোকই শ্রমিকে পরিণত হইবে। কোন শ্রেণীভেদ থাকিবেনা, সমাজ শ্রেণীহীন হইবে (Classless) এই কারণে যে হেতু কোন শ্রেণীর উপর অশ্রেণীর আধিপত্য ও জুলুম থাকিবেনা সেই হেতু শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রও থাকিবেনা। মার্ক্সের ভাষায় “রাষ্ট্র ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে” (State will wither away)। বাহির হইতে কোন শক্তি প্রয়োগ করিবার দরকার হইবে না কারণ

উহার কোন কার্যকারিতা (Function) না থাকায় উহার আত্মবিলোপ ঘটিবে।

রাষ্ট্রহীন সমাজে সামাজিক জীবন চলিবে কী করিয়া? গ্রায়-অগ্রায়ের শাসন কিরূপ হইবে? মার্ক্স বলেন তখন মানুষ সামাজিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইবে স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা নয়। কোন শ্রেণী অপর শ্রেণীর উপর জুলুম করিবে না। প্রত্যেক মানুষ সাধ্যমত পরিশ্রম করিবে ও প্রয়োজনমত মাহিনা পাইবে। এই সমাজে শাস্তিদান করিবার জন্ত কোন পুলিশ বা রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন হইবে না।

‘কিন্তু আদর্শ কম্যুনিষ্ট-সমাজ গড়িয়া উঠিতে অনেক সময় লাগিবে ধীরে ধীরে মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্তন হইবে এবং যতদিন পূর্ণ কম্যুনিজম স্থাপিত না হয় ততদিন সম্পূর্ণরূপে শ্রেণীহীন (Classless) সমাজ হইবেনা। কাজেই এই পরিবর্তনের মধ্যবর্তী যুগে সর্বহারার একনায়কত্বের (Dictatorship of the proletariat) যুগ হইবে। শ্রমিকদের প্রাধাত্যে রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে। পরে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের প্রয়োজন বিলুপ্ত হইয়া স্বচ্ছাচালিত সমাজ প্রবর্তিত হইবে।)’

### মার্ক্সবাদী ধর্মসংক্রান্ত থিয়োরী (Theory of Religion)

রাষ্ট্র যেমন অর্থনৈতিক কারণে জাত ও পরিবর্তিত হইয় ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইবে তেমনি ধর্মও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হইতে উৎপন্ন এবং পরিবর্তিত ভবিষ্যৎ সমাজে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল ধর্ম। যুগে যুগে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। (প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মূলে কোনও সত্য নাই। কুসংস্কার ও ভয় হইতেই ধর্মের উৎপত্তি।) ধনিকেরা ধর্মের সাহায্যেই জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখে। রাষ্ট্র যে প্রকার শক্তিশালী শ্রেণীর আধিপত্যের যন্ত্র, তেমনি ধর্মও শ্রেণী-আধিপত্যের যন্ত্র-স্বরূপ।

সমাজতন্ত্র স্থাপিত হইলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও থাকিবে না এবং শ্রেণীও থাকিবে না ; কাজেই ধর্মেরও প্রয়োজন থাকিবে না । ইহা ছাড়া মানুষের ভয়ও লুপ্ত হইবে । প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ সম্পূর্ণ জানিয়া ফেলিবে এবং তাহাকে আয়ত্ত্ব করিয়া মানুষের কল্যাণে লাগাইবে । সুতরাং, ধর্মেরও কোন অস্তিত্ব থাকিবে না ।

(কার্ল মার্ক্সের ভাষায় “ধর্ম মানুষের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে” ) ( Religion is the opium of the people ) । তাই ধর্মের বিলুপ্তি না হইলে মানুষেরও মুক্তি সম্ভব নয় । মার্ক্সিয় নিয়ন্ত্রণবাদ ( Determinism ) অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে ( Private property ) ধর্মের উৎপত্তি হওয়ায় ইহার বিলুপ্তির সংগে সংগে অবলীলাক্রমে ধর্মেরও বিলুপ্তি ঘটিবে ইহা অনিবার্য ।

(এই নীতিকে অনুসরণ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়াতে ধর্মকে নির্বাসিত করা হইয়াছে ।) শিক্ষা বিভাগে এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক হইতে ধর্ম-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়কে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে । জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম-প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্ত “ঈশ্বর-বিরোধী-সমিতি” ( Anti-God Society ) গঠন করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ।)

## পরিবার-সংক্রান্ত থিয়োরী ( Theory of Family )

পরিবারের ক্রমবিকাশ ও সমস্যা ( Evolution and Problem of Family ) :—এই মত অনুসারে পরিবার ও বিবাহ এই দুইটি প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হইতেছে । অতীতকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিবাহের ও পরিবারের যে ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহার মূলে আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন রহিয়াছে । অর্থনৈতিক জীবন যে স্তরের থাকে সর্বদাই সমাজে পারিবারিক ও বিবাহ-সম্বন্ধীয়

জীবনও সেই স্তরে থাকে। প্রাচীনকালে দাসভিত্তিক সমাজ (slav society), মধ্যযুগে সামন্তপ্রথা ও আধুনিকযুগে ধনিকতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে এই তিনটি অর্থনৈতিক স্তর সমাজের ক্রমবিকাশের তিনটি ধাপ। ইহার পূর্বে আদিমকালে সাম্যবাদী সমাজ (Communistie Sqciety) সংক্রান্ত প্রথম স্তর বলিয়া মার্ক্সবাদী বলেন। অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনুসারে এ চারিটি স্তরের আনুষ্ঙ্গিক চারিপ্রকার পরিবার ও যৌন-সম্পর্ক বর্তমান থাকিতে বাধ্য বলিয়া মার্ক্সবাদ বলে।

১৮৭৭ সালে লিউয়িস মর্গান নামক নৃতত্ত্ববিদ (Anthropologist) উত্তর আমেরিকার ইরোকোয়া (Eroquois) জাতির মধ্যে বসবাস করিয়া উহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সংগ্ৰহ করিয়া একখানা বই লিখেন। ঐ বইখানার নাম “আদিম সমাজ” (Ancient Society)। ঐ পুস্তকে মর্গান পরিবার ও বিবাহের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার করেন। মার্ক্স এ-সম্বন্ধে পৃথক কোন পুস্তক লিখেন নাই। মার্ক্সের লিখিত কিছু নোটকে (Notes) অবলম্বন করিয়া এঙ্গেলস পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of Family, Private Property and State) নামক পুস্তক লিখেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। এই পুস্তকে এঙ্গেলস বিবাহ এবং পরিবার সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতামত বিবৃত করিয়াছেন। প্রধান ও মূল মতটি মর্গানের মত। এই মতে বিবাহের ও পরিবারের পাঁচটি স্তর রহিয়াছে।

(১) আদিম অবস্থায় অবাধ যৌনউচ্ছ্বালতা বা অবাধসংসর্গ— (Promiscuity)

(২) প্রাচীনযুগে, যৌথ-বিবাহের (Group Marriage) বা পরিবারের প্রথম স্তর—সমশোণিত বিবাহ (Consanguine Marriage) বা ভাইবোনে সমষ্টিগত বিবাহ।

( ৩ ) যৌথ-বিবাহের দ্বিতীয় স্তর—পুনালুয়া বিবাহ ( Punaluan Marriage )

( ৪ ) যুগ্ম-বিবাহ ( Pairing Marriage )

( ৫ ) এক-বিবাহ ( Monogamic Marriage )

মর্গান মানুষের সামাজিক ইতিহাসকে তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন ।

( ১ ) বন্যতা ( Savagery )

( ২ ) বর্বরতা ( Barbarism )

( ৩ ) সভ্যতা ( Civilisation )

**বন্যতা**—ইহার মধ্যে বন্যতার স্তরে মানুষ ফলমূল হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকহাজার বছরের মধ্যে শীকারের মাংস খাইতে আরম্ভ করে । এই যুগের প্রথমাবস্থায় খাণ্ড ছিল ফলমূল । মধ্য অবস্থায় আগুনের ব্যবহার এবং মাছ ও কিছু কিছু শীকারের মাংস প্রচলিত হইয়াছে । অস্ত্র-শস্ত্র—মধ্য অবস্থায়—বর্শা ও লাঠি প্রচলিত ছিল । এই যুগের শেষ অবস্থায় ধনুর্বাণ, কাঠের পাত্র, গ্রামে বাস, বন্ধল বস্ত্র, ছোট নৌকা, কাঠের বাড়ী প্রচলিত ছিল ।

**বর্বরতা**—বর্বরযুগ আরম্ভ হয় মাটির পাত্র প্রচলন হইতে । এই যুগে পশুপালন এবং কৃষি প্রচলিত হয় । এই যুগের শেষ অবস্থায় লোহা গালান এবং তরবারি ব্যবহার প্রচলিত হয় । ধীরে ধীরে লোহার লাঙল, লোহার কুঠার ও কোদালি, যুদ্ধরথ, গাড়ি, জাহাজ, নগর, স্থপতিশিল্প ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল । গ্রীক্জাতি এইযুগের লোক ছিল । হোমারের ( Homer ) বিখ্যাত কাব্য ইলিয়াড্ ( Iliad ) এই যুগের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে ।

**সভ্যতা**-র স্তর আরম্ভ হইয়াছে অক্ষরের ও লিখনপদ্ধতির প্রচলন হইতে । অস্ত্র-শস্ত্র এই যুগের বন্দুক ।

মর্গানের মতে অর্থনৈতিক অবস্থার এই তিনটি স্তরের বিবাহ পদ্ধতিও তিন প্রকারের হইয়াছে। অর্থনৈতিক স্তর পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবার ও বিবাহের স্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বহুতার প্রথম অবস্থায় প্রচলিত ছিল “অবাধ সংসর্গ” স্তর (Promiscuity) তবে বহুতার যুগের সার্বভৌম প্রথা ছিল “যৌথ-বিবাহ” (Group Marriage)। বর্বরতার যুগের আনুষঙ্গিক বিবাহ ও পরিবার হইল “যুগ্ম-বিবাহ” (Pairing Marriage)। সর্বশেষে, সভ্যতার যুগের আনুষঙ্গিক পদ্ধতি হইল মর্গানের “এক-বিবাহ”।

**অবাধ-সংসর্গ (Promiscuity)**—১৯ শতকের মধ্যভাগে ক্রমবিকাশবাদের (Evolution Theory) প্রচলন হয় তখন হইতে সকল ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনে ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে এই মতবাদ স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ক্রমবিকাশ বলিতে স্বভাবতই উন্নতি বা উর্ধ্বগতি বুঝায়। মানবসমাজ ক্রমেই উন্নতির দিকে যাইতেছে এ কথা স্বীকার করিলে আদিমকালে এক সময় খুবই অবনত ও নিম্নতর অবস্থা ছিল, ইহা মনে আসে। কাজেই আদিমকালে বহু অবস্থায় বিবাহের রীতি-নীতি-ও নৈতিক জগতের বাধা-নিষেধ একসময় ছিলনা, ইহা স্বভাবতঃই মনে হয়। মর্গানও এই নীতি অনুযায়ী আদিমকালে একটা বহু অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন। সেই বহু অবস্থা হইতে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ ও সংযমের প্রচলন হইবার ফলে ক্রমশঃ সভ্য অবস্থায় এক-বিবাহ (Monogamy) আবির্ভূত হইয়াছে; আমেরিকার ইরোকোয়া (Eroquois) জাতির সামাজিক জীবনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ১৮৭১ হইতে ১৮৭৭ সালের মধ্যে তিনি গঠন করিয়াছিলেন।

ইরোকোয়ার মধ্যে পরস্পরকে সন্মোদন করিবার পদ্ধতি হইতে অবাধ-সংসর্গ ও যৌথবিবাহের (Promiscuity and Group Marriage) অবস্থা মর্গান অনুমান করিয়া লইয়াছেন। ইরোকোয়ারা তাহাদের ভাইয়ের



সন্তান, ছেলে-মেয়েকেও সন্তান বলিয়া সম্বোধন করে এবং ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাও তাহাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু বোনের ছেলেকে সন্তান বলিয়া ডাকেনা। মেয়েরাও তেমনি ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের ভাগ্নে ও ভাগ্নী বলিয়া সম্বোধন করে। মর্গানের মতে এই সম্বোধন শুধু মাত্র সম্বোধনই নয়। ইহার মূলে বাস্তব ও সত্যিকার সম্পর্ক রহিয়াছে; অর্থাৎ, অতীতে একসময় সত্যি সত্যি সব ভাইয়েরা তাহাদের প্রত্যেকেরই সন্তানের পিতা প্রত্যেকেই ছিল। অর্থাৎ, এই প্রকারের যৌথবিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু কালক্রমে সম্বোধনগুলি তেমনি প্রচলিত থাকিলেও আসলে সম্পর্কটি বিলুপ্ত হইয়াছে। হাওয়াই দ্বীপে ঐ অতীত কালের যৌথবিবাহ এখনও দেখা যায়। ইহা হইতে হাওয়াই দ্বীপের যৌথবিবাহ পৃথিবীতে একসময় সার্বজনীন ছিল এই আনুমানিক মতবাদ মর্গান প্রচার করিয়াছেন। হাওয়াই দ্বীপে সম্বোধন-প্রথা অনুসারে সব ভাই ও বোনের সন্তানেরা পরস্পরকে ভাইবোন বলিয়া সম্বোধন করে এবং প্রত্যেকের পিতামাতাকে পিতামাতা বলিয়া সম্বোধন করে। ইহা হইতে মর্গান অনুমান করেন যে অতীতে ভাইবোনের একসময় বিবাহ হইত। এইরূপে মর্গান আনুমানিক ভিত্তির উপর অতীতকালের অবাধ যৌন-উচ্ছ্বলতা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই অনুমানের কোনই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই মানবজাতির আদিম ও অতীত জীবন সম্বন্ধে এত বড় গুরুতর সিদ্ধান্ত মর্গান করিয়াছেন। এঙ্গেল্‌স্‌ নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে ইহার প্রমাণ নাই। এঙ্গেল্‌স্‌ বলিয়াছেন “আদিমতম অসভ্যদের সামাজিক অবশেষ আবিষ্কার করিয়া সোজাসুজি ইহার (অবাধ যৌন-উচ্ছ্বলতার) অস্তিত্ব প্রমাণ করা আমরা আশা করিতে পারি না।”\* তবুও মার্ক্সবাদীরা এই যৌন-উচ্ছ্বলতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় পিতামাতা ভাইবোন সম্বন্ধেও কোন যৌন বাধা-নিষেধ ছিলনা।

\* “We can hardly expect to prove its existence directly by discovering its social fossils among backward savages.” ( p.31 )

## দ্বিতীয় স্তরে সমশোণিত-বিবাহ ( Consanguine Marriage )

খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত এবং অগ্রাণ্ড সকল পর্যায়ের ভাই ও বোনের পরস্পরের স্বামী-স্ত্রীরূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু এই স্তরেরও অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। পৃথিবীতে কোথাও ইহার কোন চিহ্ন নাই। এঙ্গেল্‌স্‌ নিজেই বলিতেছেন,—“ইতিহাসে আদিমতম জাতিগুলির মধ্যে ইহার প্রমাণযোগ্য কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা অবশ্যই বর্তমান ছিল তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।”†

**পুনালুয়া বিবাহ**—বিবাহের ইতিহাসে ক্রমে ক্রমেই সংসার ও বাধা-নিষেধের প্রয়োজনকে মানুষ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। প্রথম নিষিদ্ধ হইয়াছিল পিতামাতার সহিত সন্তানের যৌন-সংসর্গ। ইহাই মানবজাতির প্রথম অগ্রগতি। ইহার পর ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ নিষেধ করিয়া মানুষ দ্বিতীয় অগ্রগতির সূচনা করিল। প্রাকৃতিক নিয়মে এই বাধানিষেধ মানুষের কল্যাণ করিয়াছে এ কথা মর্গান স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতেই পুনালুয়া বিবাহ ও পরিবারের উদ্ভব হইয়াছে। বৃহৎ যৌথ-পরিবার বর্বরযুগের মধ্য-অবস্থা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই সব বৃহৎ পরিবার পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনে যখন ভাঙিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে পরিণত হইত, তখন ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় বোনেরা যে সব সংসার রচনা করিত ভাইরা তাহা হইতে পৃথক সংসার করিয়া পুনালুয়া বিবাহে একদল বোন, একদল পুরুষের পারস্পরিক স্ত্রী বলিয়া

† “Even the most primitive peoples known to history provided no demonstrable instance of it. But that it must have existed we are compelled to admit.”

গণ্য হইত। এই সব স্বামীরা পরস্পরকে “পুনালুয়া” বলিয়া সম্বোধন করিত। তেমনি একদল ভাই একদল স্ত্রীকে সকলেই পারস্পরিক স্ত্রী বলিয়া মনে করিত। এই সব স্ত্রীরা পরস্পরকে ‘পুনালুয়া’ বলিয়া সম্বোধন করিত। এই প্রথায় বোনের ছেলেদের ভাগে ইত্যাদি বলা প্রচলিত হইল। এই পুনালুয়া পরিবার হইতে মাতৃগোষ্ঠির (Gens) উৎপত্তি হইয়াছে। যৌথবিবাহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে পিতৃত্বের নিশ্চয়তা না থাকায় মাতৃমূলক গোষ্ঠি (Gens) সমাজের ভিত্তি হয়। একই গোষ্ঠির (Gens) ভিতর বিবাহ করা নিষিদ্ধ। পুনালুয়া বিবাহ সমস্ত বর্বর (Barbarian) ও সভ্য জাতির (Civilised) মধ্যে এক সময় প্রচলিত ছিল বলিয়া মাক্সবাদীরা ও মর্গান মনে করেন।

### যুগ্ম-বিবাহ ( Pairing Marriage )

পুনালুয়া পরিবারের মধ্যে কখনো কখনো বিশেষ কোন পুরুষের সহিত বিশেষ কোন নারীর অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যাইত ; কখনো কখনো কোন পুরুষের অনেক স্ত্রীর মধ্যে একজন প্রধানা স্ত্রী থাকিত এবং ঐ স্ত্রীর কাছে এই পুরুষও অন্যান্য স্বামীদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সব সাময়িক যুগল-সম্বন্ধ কখনো কখনো অধিকতর স্থায়ী হইত। ক্রমে বিবাহের বহু দূরবর্তী আত্মীয়দের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় যৌথবিবাহ (Group Marriage) ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। পুরুষ বহু স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক রাখিলেও নারীর সম্বন্ধে কড়াকড়ি করিয়া সতীত্বের প্রচলন করিল। এইরূপে যুগ্ম-পরিবার (Pairing Family) প্রচলিত হইল। এই সময় নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে কম হওয়ায় নারী ক্রয় করিবার ও জোর করিয়া ধরিয়া আনিবার প্রথা প্রচলিত হইল। কিন্তু এই যুগ্ম-পরিবারেও যৌথ-গৃহস্থালী

প্রচলিত ছিল এবং নারীর প্রাধান্য গৃহস্থালীতে অব্যাহত ছিল। এঙ্গেলসের মতে নারীর মর্যাদা এবং স্বাধীনতা বৃদ্ধি এবং বর্বর অবস্থায় অত্যন্ত বেশী ছিল। যৌথ-গৃহস্থালীতে নারীর কর্তৃত্ব স্বভাবতই বেশী থাকে এবং পিতা অজ্ঞাত থাকায় মাতার, অর্থাৎ, নারীর মর্যাদা অতি উচ্চ থাকে। নারীমর্যাদার আর একটি কারণ হইল এই যে, এক গোষ্ঠির (Gens) নারীরা তাহাদের গৃহেই থাকে এবং পুরুষেরা ভিন্ন গোষ্ঠি হইতে আসিয়া এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। এঙ্গেলসের মতে আদিম নারী (বর্বরযুগের) অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইলেও তাহাদের মর্যাদা অতি উঁচুদরের ছিল।

এঙ্গেলস, ব্যাকোফেনকে (Bachofen) সমর্থন করিয়া বলেন যে যৌথবিবাহের উচ্ছ্ৰাণতা হইতে যুগ্মবিবাহের সংঘমে উন্নতি বা পরিণতি ঘটিয়াছে নারীজাতির মারফৎ। আরণ্য-জীবনের কম্যুনিজ্‌ম্ নূতন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিকাশের ফলে পরিবর্তিত হইল এবং লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল। এই দুই কারণে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত অপমানজনক ও দুঃসহ বলিয়া নারীজাতির মনে হইতে লাগিল। এই দুঃসহ নিপীড়ন হইতে মুক্তির জগু নারীজাতি সতীত্বের অধিকার দাবী করিতে লাগিল। বহু পুরুষের অধিকারকে খর্ব করিয়া একজন পুরুষের সহিত স্থায়ী অথবা অস্থায়ী বিবাহের জগু নারীজাতি ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষা হইতেই যুগ্মবিবাহের (Pairing Marriage) উদ্ভব হইয়াছে। এই বিবাহ বর্বর-স্তরের প্রথা। আমেরিকায় এই যুগ্মবিবাহ বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার পরে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও নূতন পরিণতি প্রাপ্ত হওয়ার বিবাহ-প্রথাও নূতন ও বর্তমান স্তরে উপনীত হইল। বর্বরযুগের শেষভাগে গৃহপালিত নানাপ্রকার পশুপালন ও কৃষিকার্যের দরুণ মানুষের ধন বৃদ্ধি হইয়াছিল। এঙ্গেলস্ বলেন যদিও এই ঐশ্বর্য পূর্বে গোষ্ঠির (Gens) সমবেত সম্পত্তি ছিল, এই সম্পত্তি ইতিমধ্যেই কোন সময়ে গোষ্ঠিপতিদের

ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এই ধনদৌলতের বৃদ্ধি প্রচলিত সাময়িক যুগ্ম-বিবাহ (Pairing Marriage) এবং মাতৃতান্ত্রিক গোত্র বা গোষ্ঠিকে (Matriarchal Gens) কঠিন আঘাত করিল। ইহা উল্লেখ-যোগ্য যে ঐ-সময়ে যুগ্ম-পরিবারে শ্রমবিভাগ (Division of Labour) যে প্রকার ছিল তাহাতে পুরুষ, জীবিকার সাজসরঞ্জাম এবং পশু ও দাসদিগের মালিক এবং নারী গৃহস্থালীর জিনিষপত্রের অধিকারী ছিল। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যুগ্ম-পরিবারের ফলে নূতন পরিস্থিতি এই হইয়াছিল যে পিতৃত্ব ও জাতি নির্ণীত হওয়া সম্ভব ছিল। এখন এই ধনবৃদ্ধির ফলে পরিবারের কর্তাই ধনশালী ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ফলে পিতার মনে আপন সন্তানকে সম্পত্তির অধিকারী করিবার ইচ্ছা দেখা দিল। কিন্তু প্রচলিত মাতৃকেন্দ্রিক উত্তরাধিকার প্রথা অনুসারে সন্তান পিতার সম্পত্তি পাইত না কারণ তাহারা পিতার গোত্রে (Gens) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সম্পত্তি মাতৃগোত্রের মধ্যে থাকিতে হইবে। এই পরিস্থিতিতে পুরুষ আপনার সন্তানকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবার জন্য একটা বিরাট সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করিল। অর্থাৎ মাতৃকেন্দ্রিক উত্তরাধিকারের ও বংশানুক্রমের পরিবর্তে পিতৃকেন্দ্রিক বংশানুক্রম ও উত্তরাধিকারের আইন প্রবর্তিত হইল।

এই পরিবর্তন কখন কি প্রকারে ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, এ-কথা এঙ্গেল্‌স্‌ বলেন। ইহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা। কিন্তু এঙ্গেল্‌সের মতে ইহা নিশ্চিত ঘটিয়াছিল এবং ব্যাকোফেন কর্তৃক সংগৃহীত মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারের দৃষ্টান্তগুলি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। এই বিপ্লবের ফলে আর একটি নূতন জিনিষের আবির্ভাব ঘটিল। পুরুষের অবাধ প্রভুত্ব, একদিকে নারীজাতির অসহায় পরাধীনতা এবং অত্রদিকে নারীর সতীত্ব-প্রথার প্রবর্তন করিল। ইহার স্বাভাবিক ফল হইল এক-বিবাহ।

## এক-বিবাহ ( Monogamy )

পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে পুরুষ আপনার সন্তানের পিতৃত্ব সুনিশ্চিত করিবার জন্তু নারীর স্বাধীনতাকে খর্ব করিল। পুরুষ নারীর সতীত্ব দাবী করিল। এই সময় হইতেই এক-বিবাহের সূত্রপাত। যুগ্ম-পরিবার হইতেই বর্ষরমুগের শেষভাগে এক-বিবাহের উৎপত্তি হয়। পুরুষের আধিপত্য এই পরিবারের ভিত্তি। এই এক-বিবাহ প্রথার সহিত যৌনপ্রেমের ( Sex-love ) কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টির সহিত ইহারও সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীকজাতির মধ্যেও এই এক-বিবাহের কড়াকড়ি দেখা যায় ; তবে এঙ্গেল্‌স্ ও মর্গান ইত্যাদির মতে এই একনিষ্ঠা ( Fidelity ) শুধু নারীর জন্তই নির্দিষ্ট। কিন্তু পুরুষ এই একনিষ্ঠার ধার ধারে না। নারীর উপর কঠোর একনিষ্ঠার দায়িত্ব চাপাইয়া পুরুষ অবাধে ব্যাভিচার করিয়া চলে। তাই ইহাদের মতে এক-বিবাহের অব্যর্থ আনুষঙ্গিক—ব্যাভিচার বা বেশ্যাবৃত্তি। গ্রীকজাতির মধ্যেও ক্রীতদাসীদের সহিত যৌন-সম্পর্ক, বিবাহিত জীবনের পাশাপাশি চলিত। নারীর অবনতির সংগে সংগে গ্রীকদেশে হেটাইরা ( Hetaira ) নামক এক বিশেষ শ্রেণীর গণিকা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এই হেটাইরা ( Hetaira ) শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধির চর্চা যেমন আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি বিবাহিতা নারীর পর্দানশীন জীবন অশিক্ষা ও অজ্ঞতায় নিতান্ত অবনত হইয়াছিল। মর্গান এবং এঙ্গেল্‌সের মতে এই গণিকাবৃত্তি ( Hetaira ) প্রাচীনযুগ হইতে আধুনিক সভ্যযুগেও বর্তমান রহিয়াছে। এঙ্গেল্‌সের মতে এই গণিকাবৃত্তি ( Hetairism বা Prostitution ) অতীতকালের যৌথবিবাহেরই ( Group Marriage ) ধ্বংসাবশেষ। এইরূপে ব্যাভিচার ও গণিকাবৃত্তি এক-বিবাহের অনিবার্য সাথী।

এঙ্গেলসের মতে একবিবাহ শুধু গ্রীকদের মধ্যেই সৃষ্টি হয় নাই। রোমানদের মধ্যেও এই একবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং রোমানপরিবারে নারীর স্বাধীনতা কিছু বেশী ছিল; তবে জার্মানদের মধ্যে একবিবাহ সবচেয়ে উৎকর্ষ লাভ করে। বর্তমান পরিবার বা বিবাহে প্রকৃত স্বাধীনতা নারীর নাই। নারীকে এই স্বাধীনতা দিতে হইলে পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়া আর্থিক স্বাধীনতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এঙ্গেলস্ বলেন এই ব্যবস্থা হইলেই একবিবাহও লুপ্ত হইবে।

কিন্তু ঐ সঙ্গেই এঙ্গেলস্ এ-কথাও বলেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে গণিকাবৃত্তি বিলুপ্ত হইবে এবং একবিবাহ (Monogomy) বিলুপ্ত না হইয়া সত্যকারের বিবাহে পরিণত হইবে। সমাজে মজুরীপ্রথা (Wage labour) বিলুপ্ত হইবে, সর্বহারার অস্তিত্ব থাকিবে না এবং সংগে সংগে অর্থাভাবে নারীরও দেহ বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হইবে না। এইরূপে গণিকাবৃত্তি বিলুপ্ত হইবে। অপর পক্ষে একবিবাহের পরিণতি কী হইবে? এঙ্গেলস্ বলেন, সমস্ত সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তি হইয়া যাওয়ায় রান্নাবান্না শিশুদের শিক্ষা ও যত্ন ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব পরিবার হইতে সমাজের হাতে গুপ্ত হইবে। অর্থাৎ, পরিবার সমাজের আর্থিক ক্ষুদ্রতম অংশ (Unit) থাকিবে না এবং সন্তান পালন করিবার দায়িত্ব ও উদ্ব্বেগ না থাকায় নারী কেবল প্রেমের দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াই বিবাহ করিবে। ঐ অবস্থায় যৌনউচ্ছৃঙ্খলতা না বাড়িয়া ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম (Sex-love) নারীকে একবিবাহের দিকে প্রবর্তিত করিবে। সুবিষয় সমাজের ভিত্তি হইবে প্রেম কিন্তু এই প্রেম স্বভাবতঃই একনিষ্ঠ হওয়ায় একবিবাহই কার্যতঃ প্রচলিত হইবে। মর্গানও ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একবিবাহ প্রবর্তিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

## পঞ্চম অধ্যায়

### জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যার সমালোচনা

বর্তমান যুগে সমাজের ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ তাহাদের মতবাদ ১৮৯৩ সনের পূর্বে গঠন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পণ্ডিতদের মধ্যে সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে ধারণা ও মতবাদ প্রচলিত ছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই মার্ক্স তাহার ইতিহাসের ব্যাখ্যা গঠন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বিধিবদ্ধভাবে মার্ক্স কিছু আলোচনা করেন নাই। তাঁহার “পূঁজিবাদ” পুস্তকের নানাস্থানে, “দর্শনের দারিদ্র্য” (Poverty of Philosophy) ও অগ্ৰাণ্ণ বইয়ে ইতঃসুতঃ ছড়ানে আলোচনা রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহার “ফয়ারবাক সম্বন্ধে এগার সূত্র” নামক (Eleven thesis on Feurbach) এগারটি সূত্রেই এ-সম্বন্ধে প্রামাণিক ভিত্তি ধরা হয়। ইহার পর এঙ্গেল্‌স্ “ডুয়েরিং বিরোধী,” “লুডভিগ্ ফয়ারবাক্” (Ludwig Feurbach) “পরিবার, রাষ্ট্র ও সম্পত্তির উৎপত্তি” (Origin of Family, State and Property) প্রভৃতি বইয়ে এই মতকে বিস্তৃতভাবে গড়িয়া তোলেন। এঙ্গেল্‌স্‌র ব্যাখ্যাই এ সম্বন্ধে প্রামাণিক। ইহার পর প্লেখানভ তাঁহার বই “মার্ক্সবাদের মৌলিক প্রশ্নাবলী” (Fundamental Problems of Marxism) এবং বুখারিন ‘ঐতিহাসিক জড়বাদ’ নামক (Historical Materialism) পুস্তকে এঙ্গেল্‌স্‌র মতকে যথাসম্ভব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।



কিন্তু এই মতবাদের ভিত্তি ১৯ শতকের সমাজতত্ত্ব। আধুনিক সমাজ-তত্ত্ব ইহাকে ছাড়াইয়া আজ অনেক নূতন তথ্য ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছে। আধুনিক গবেষণায় মার্ক্সের ও এঙ্গেলসের জড়বাদীয় ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ একপেশে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

সমাজের পরিবর্তন ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইতেছে এ কথা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র জড় পারিপার্শ্বিক বা অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের দ্বারা করা সম্ভব নয়। সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তনের মূলে আছে দুইটি শক্তি—

(১) মানুষ ও তাহার মন এবং

(২) পারিপার্শ্বিক।

মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক এই দুই পক্ষের ঘাতপ্রতিঘাত ও পারস্পরিক সংযোগের ফলে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্ভব হইয়াছে। যাহারা মানুষের অন্তর্নিহিত নানা শক্তির বিভিন্ন দিক্কে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি মাত্র দিক্কে সমস্ত সভ্যতার বিকাশের মৌলিক শক্তি বলিয়া প্রচার করেন তাহারা একদেশদর্শী। তেমনি যাহারা পারিপার্শ্বিকের কোনও একটি দিক্কে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইতিহাসের মূলশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহারাও একদেশদর্শী।

মার্ক্সবাদও এক প্রকারের পারিপার্শ্বিকবাদ (Environmental doctrine)। মার্ক্সবাদ কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিককেই সভ্যতার ও সমাজের জন্ম দায়ী করিয়াছে। ইহাতে মানবিক শক্তিকে (Human Factor) উপেক্ষা করিয়া সমস্ত বিবর্তনের প্রধান শক্তিকে (Force) অস্বীকার করা হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে অবশ্য মার্ক্স বলিয়াছেন যে, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষই সমাজের পরিবর্তন ঘটায় এবং পারিপার্শ্বিকও মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। মার্ক্স “ফয়ারবাক সঙ্ক্ষে এগারটি সূত্র”

পুস্তকের ৩নং সূত্রে বলিয়াছেন “পরিবেশও মোটামুটিভাবে মানুষের দ্বারাই পরিবর্তিত হয় এবং শিক্ষাদাতার স্বয়ং শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন।” †

এঙ্গেলসও তাঁর “ফয়ারবাক্” নামক পুস্তকে কোথাও কোথাও এই ধরনের কথা বলিয়াছেন যথা “মানুষ তাহার ইচ্ছিত লক্ষ্যকে স্বয়ং অনুসরণ করিয়া নিজের ইতিহাস রচনা করে।” ‡

কিন্তু মার্ক্সবাদের সারতত্ত্ব যে নিয়ন্ত্রণবাদ (determinism) তাহার মুখ্য সিদ্ধান্তই এই যে মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি নাই। এই কারণে উপরোক্ত মানুষের তথাকথিত স্বাতন্ত্র্য একটা ভূয়া জিনিষ বই আর কিছুই নয়। কারণ ঐ স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পরস্পরেই মার্ক্স ও এঙ্গেলস এই স্বাতন্ত্র্য যে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য নয় নিতান্ত কাল্পনিক বা Illusory স্বাতন্ত্র্য তাহা বিসৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিকে স্বীকার করিলে নিয়ন্ত্রণবাদের কোনও অর্থ থাকেনা। ‘অর্থশাস্ত্রের আলোচনা’ (Critique of Political Economy) নামক পুস্তকের ভূমিকায় মার্ক্স স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—“এই সামাজিক উৎপাদন ব্যাপারে মানুষ পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এই সব সামাজিক সম্পর্ক অবশ্যস্তাবি এবং মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ।”\*

‡ “Circumstances are changed precisely by men and that the educator must himself be educated.”

( Thesis no. 3 )

‡ “Men make their own history.....in that each person follows his own consciously desired end.”

\* “In this social production which men carry on they enter into definite relations that are indispensable and independent of their will.”

এখানে 'মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ' ( Independent of human will ) এই উক্তিটি পারিপার্শ্বিকের কঠোর ও অনিবার্য শাসনই সৃচিত করিতেছে। ইহার পরই মার্ক্স আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—“মানুষের চেতনার সত্তার নিয়ামক নয়। অপর পক্ষে বরং মানুষের সামাজিক সত্তাই তার চেতনার নিয়ামক।” †

এই উক্তিটি মার্ক্সীয় দর্শন ও সমাজতন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ। এঙ্গেলস্ 'কম্যারবাক' পুস্তকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, মানুষের এই তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছা বা চেতনার পেছনে কোন্ শক্তি অব্যর্থভাবে মানবীয় ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে? §

জবাবে এঙ্গেলস্ নিজেই বলিতেছেন অর্থনৈতিক শক্তিই মানুষকে সলাইতেছে, 'নিছক অর্থনৈতিক কারণ' ( Purely economic reasons ) ইহার পিছনে কাজ করিতেছে। মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আছে কিন্তু ইহাদের মতে এই ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে বাহ্য পারিপার্শ্বিকের দ্বারা শৃঙ্খলিত। মানুষ পারিপার্শ্বিকের উপর আঘাত করে ও তাহাকে পরিবর্তিত করে, ইহাতে মানুষের স্বতন্ত্র কোনও কৃতিত্ব নাই। কারণ মানুষের এই ক্রিয়া হইল প্রতিক্রিয়া মাত্র। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবেই মানুষ প্রভাবিত হইয়া প্রতিক্রিয়া স্বরূপে বাহ্য জগতকে আঘাত করে। মানুষের সব কাজই পারিপার্শ্বিক তাহার উপর যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাই গোড়ার ঘরে ( “In the last analysis” )

† “It is not the consciousness that determines men's existence but on the contrary it is their social existence (being) that determines their consciousness.”

§ “What driving forces in turn stand behind these motives ?”

পারিপার্শ্বিকই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অধিকন্তু, মার্ক্স যখন ইতিহাসকে জড়শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে চান এবং জড়শক্তিকেই সকল পরিবর্তনের মূল শক্তি বলিয়া নির্ণয় করেন তখন মানুষীশক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইতেছেন। মার্ক্সবাদ সমাজতত্ত্বেও একবাদী (Monist)। কাজেই মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক এই দুই শক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা স্বীকার করিলে একবাদের (Monism) অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকেনা; তাহা ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যায় পরিণত হয় (Pluralistic Interpretation of History)।

বিশুদ্ধ পারিপার্শ্বিকবাদের (Environmental Theory) বিরুদ্ধে আজকালকার বেশির ভাগ সমাজতাত্ত্বিক প্রতিবাদ তুলিয়াছেন। লেষ্টার ওয়ার্ড (Lester Ward) মানুষের ইচ্ছাশক্তি ইতিহাসের মূল উৎস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। গাব্রিয়েল টারদে (Gabriel Tarde), চার্লস এলউড (Charles Ellwood), স্মননার (W. G. Sumner) রাতসেনহোফার (Ratzenhofer) ই, বারগেস (E. Burgess) ম্যাকডুগাল (Mc Doughall), ফ্রয়েড (Freud), য়ুংগ (Yung), এ্যাড্‌লার (Adler), মুয়েলার-লায়ার (Mueller-Lyre), সোরোকিন (Sorokin), টয়েনবী (Toynbee), গিডিংস (Giddings) ইত্যাদি সমাজতাত্ত্বিকেরা মানুষের সৃজনী-প্রতিভা ও অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্রশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

কেবলমাত্র মানুষ তাহার আত্মশক্তিতে সমাজ ও সভ্যতাকে সৃষ্টি করে নাই। তেমনি শুধু পারিপার্শ্বিকও মানুষের ও সমাজের রূপান্তর সৃজন করিতে পারে নাই। মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক এই দুইশক্তির সহযোগে ও সংঘাতে সমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষ তাহার আত্মশক্তিকে নিছক শূণ্ণে প্রয়োগ করিতে পারে না। তার প্রয়োগের

ক্ষত্র হইল বাহ্যজগৎ। ভিতর এবং বাহির, মানুষ এবং বাহ্যজগৎ, এই দুইয়ের সমবায় ও সংঘাতকে বুঝিতে হইলে ইহাদের আরও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই যুগ্ম-শক্তির প্রত্যেকেই জটিল এবং মিশ্র পদার্থ। মানুষীশক্তি বলিতে তাহার জৈবিকশক্তি ( Biological Force ) ও তাহার মানসিক শক্তি উভয়কেই বুঝায়। বাহ্যজগৎ বা পারিপার্শ্বিক বলিতে ভৌগোলিক বা জড় পরিবেশ ও সামাজিক পরিস্থিতি উভয়কেই বুঝায়। সামাজিক পরিবেশের ভিতর অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক শিল্পিক ইত্যাদি সবদিকই অন্তর্ভুক্ত।

সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কোন একটি বিশেষ দিককে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং একটিমাত্র শক্তির ( Factor ) সাহায্যে সমস্ত মানবজীবন ও সমাজকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই প্রকার প্রণালী হাতে-কলমে গবেষণার পক্ষে প্রয়োজন হইলেও পূর্ণ সত্যকে নির্ধারণ করিবার পক্ষে এই প্রকার বিচ্ছিন্ন-প্রয়োগ ( Method of Isolation ) কৃতকার্য হইতে পারে না। জটিল সমাজ-জীবনের নানাবিচিত্র দিকের মধ্যে একটি মাত্র দিককে নজরে রাখিয়া আংশিক সত্যকে মাত্র জানা যায়। যাহারা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন বা Weltanschauung গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব নেন তাহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলকে সামঞ্জস্য করিয়া গোটা জীবন ও সমাজপরিবর্তন সম্বন্ধে ব্যাপক ও পূর্ণ সত্যের আশ্রয় নিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে গবেষণার সাহায্য হয় কিন্তু দার্শনিক ভিত্তি স্থাপনে এক একটি দৃষ্টিভঙ্গীর আংশিকত্ব ও অসম্পূর্ণতাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমানযুগের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির সঙ্গত পরিণতি।

যাহারা এক একটি শক্তির (Factor) উপর জোর দিয়া ইতিহাসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকেই আংশিক সত্যকে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ণ সত্যের দিক্ হইতে ইহারা নিতান্ত একপেশে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ যারা ইতিহাসের ভৌগোলিক ব্যাখ্যা (Geographical Interpretation) দিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে প্রধান—বাকুল (H. T. Buckle) তাঁহার বিখ্যাত “ইংলণ্ডের সভ্যতা” (Civilisation of England) নামক পুস্তকে সভ্যতার নিয়ন্ত্রক বলিয়া ভৌগোলিক পরিস্থিতিকেই নির্দেশ করিয়াছেন। লা প্লে (Le Play) এবং তাঁহার শিষ্যবর্গও প্রাকৃতিক পরিবেশকে সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ডাঃ হান্টিংটন (Dr. Huntington) ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যে আবহাওয়াকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন। তাঁহার মতে আবহাওয়া (Climatic conditions) পরিবর্তন হেতুই সভ্যতার পরিবর্তন হয়।:

দুরখীম (Durkheim), ডি, রবার্টি (De Roberty) প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিকেরা সামাজিক পারিপার্শ্বিকের উপর জোর দিয়াছেন। মানুষ ইহাদের মতে সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; তাহার ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি সবই তাহার সামাজিক পরিবেষ্টনীর প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা ব্যক্তিকে বা প্রতিভাকে বিশেষ স্থান দেন না।

যাহারা বংশ বা রক্তকে মানুষের ভালমন্দ সমস্ত কাজের জন্ত দায়ী করেন সেই বংশবাদীরা (Racialist) ইতিহাসের বংশবাদী ব্যাখ্যা (Racialist Interpretation of History) প্রচার করিয়াছেন। ইহারা ভৌগোলিক পরিস্থিতির বিশেষ মূল্য স্বীকার করেন না। তাঁহার বলেন পৃথিবীতে নানা জাতি বা বংশের মানুষ আছে যথা নিগ্রো, আর্থ, মঙ্গোলিয় ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কেবল আর্থরাই পৃথিবীতে সভ্য সৃষ্টি করিয়াছে। অপর জাতীয় লোকেরা অনুকূল পারিপার্শ্বিকে থাকিয়াও

ঐ পারিপার্শ্বিককে নিজেদের কল্যাণে ব্যবহার করিতে পারে নাই। ইহাতে বোঝা যায় যে কেবলমাত্র রক্তের মধ্যেই প্রতিভার বীজ লুকানো রহিয়াছে এবং এই বীজই সমাজ ও সংস্কৃতিকে গঠন করিয়াছে। এই দলের নেতা গোবিনু (Dr. Gobineau), হাউসটন চেম্বারলেন (H. Houston Chamberlain), লাপুজে (De Lapuge) প্রমুখ বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক।

গাব্রিয়েল টারদে, (Gabriel Tarde), লেষ্টার ওয়ার্ড (Lester Ward), চার্লস এলউড (Charles Ellwood) এলবিয়ন স্মল (Albion Small), রাতসেনহোফার (Ratzenhofer), ই, বারগেস (H. Burgess), টমাস (W. I. Thomas), স্মনার (W. G. Sumner), আর, পার্ক (R. Park) প্রভৃতি মানুষের মনঃশক্তির (Psychological factor) উপর সমস্ত সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। ইহারা ইতিহাসের বিবর্তনে বহিজগতের চাইতে মনোজগতের উপর জোর দিয়াছেন বেশী। ইহাদের মতে ইতিহাসের পেছনে মূলশক্তি হিসাবে কাজ করিতেছে মানুষের মন, মানুষের ইচ্ছা, বুদ্ধি ও ভাববৃত্তি (Emotion)। লেষ্টার ওয়ার্ড মানুষের বুদ্ধিকে (Intellect) সকল বৃত্তি ও কাজের নিয়ামক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের ভাববৃত্তি শক্তি জোগায়, কিন্তু বুদ্ধি সেই শক্তিকে পথ দেখাইয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যতই মানুষ অগ্রসর হইতেছে ততই অন্ধ ভাববৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষ বুদ্ধির নির্দেশে সচেতনভাবে সমাজকে গড়িয়া তুলিতেছে! এই উদ্দেশ্যমূলক ও আদর্শমূলক সমাজ গঠনই সভ্যতার বিশেষত্ব। পারিপার্শ্বিককে মানুষ আদর্শ অনুযায়ী গড়িবার ক্ষমতা রাখে। এলউড ও স্মনার মানুষের বুদ্ধিশক্তি ও ভাববৃত্তিকে (Intelligence and Feeling) সামাজিক বিকাশের যুগ্মশক্তি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ই, এ, রসও (E. A. Ross) ওয়ার্ডের মতন ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন। রাতসেনহোফার এবং এলবিয়ন স্মল মানুষের স্বার্থবুদ্ধিকে

সমস্ত সামাজিক ব্যবহারের মূল বলিয়াছেন। টমাস পার্ক, ও বার্গেস—ওয়ার্ড, শ্বল ও রাটসেনহোফার প্রভৃতির মত—ইচ্ছাবৃত্তিকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন।

ফ্রেড প্রমুখ মনোবিকলনীর দল ( Psycho-analyst ) সমস্ত সামাজিক বিবর্তনের মূলে কামশক্তিকেই ( Sex Factor ) একমাত্র মৌলিক শক্তি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা ও পরিবর্তনকে ফ্রেড এই কামবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম, পরিবার, বিবাহ, বুদ্ধ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারের মূলে কামশক্তির নিয়ন্ত্রণ বা শাসন রহিয়াছে। ফ্রেড নিজে মানুষের এই মানসিক বৃত্তিকেই সভ্যতার মূল নিয়ামক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মার্ক্সবাদের একদেশদর্শীতার বিরুদ্ধে ফ্রেড তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কারলাইল্ ( Carlyle ) প্রমুখ কোন কোন পণ্ডিত ইতিহাসকে ব্যক্তির ( Individual ) ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাদের মতে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি ও বিবর্তনের মূলে ব্যক্তির শক্তিই সর্বপ্রধান। সমাজের সৃষ্টি ব্যক্তি নয়। সমাজই ব্যক্তির সৃষ্টি। নেপোলিয়ন, আলেকজান্ডার, বিসমার্ক, মার্টিন লুথার, যিশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষেরাই সমাজকে পরিবর্তিত করিয়াছেন এবং পুরাতনকে ভাঙিয়া নূতন সভ্যতাকে বারবার গড়িয়া তুলিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেনসারও ( Herbert Spenser ) কার্যতঃ ব্যক্তিকেই সমাজবিকাশের মূলশক্তি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য প্রভৃতির যেমন ব্যক্তিকে সমাজের সৃষ্টি ( Product ) বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়াছেন, ইহারা তেমনি সমাজকে প্রাধান্য দিতে কার্পণ্য করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকে ইতিহাসের ব্যক্তিত্ববাদী ব্যাখ্যা ( Great-man Interpretation of History ) বলা যায়।

উপরের ছয়টি সম্প্রদায়ের মত মার্ক্সবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে একটি মাত্র শক্তিকে ( Factor ) বাছিয়া



হইয়া তাহার দ্বারা সমস্ত সমাজ-জীবনকে ব্যাখ্যা করিয়াছে। উপরোক্ত  
 ঠাট ব্যাখ্যার মধ্যে প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই একটিমাত্র দিক বা তত্ত্বকেই  
 প্রাধান্য দিয়া তাহাকেই সমাজ-জীবনের একমাত্র তত্ত্ব বা মৌলিক ভিত্তি  
 লিয়া নির্দেশ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে সমাজ-জীবন একটা জটিল  
 প্রক্রিয়া এবং সমাজ-বিবর্তনও একটা জটিল প্রক্রিয়া। বহু তত্ত্ব বা শক্তির  
 (Factor) সহযোগে ও সংঘাতে সমাজ পরিবর্তিত হয় ও রূপ গ্রহণ

করে। আদিম মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আনুমানিক  
 একবানী ব্যাখ্যা  
 একপেশে এবং আদিমসমাজের প্রকৃতি ও পরিবর্তনের রীতি

সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান নাই। কিছুটা আনু-  
 মানিক সিদ্ধান্ত এবং কিছু বিরল তথ্য সংগ্রহ, এই দুইয়ের উপর ভিত্তি  
 রিয়া আদিমকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমস্ত মানব-জীবনের একটা  
 রাবাহিক নিশ্চিত মতবাদ (Theory) গঠন করিবার মনোবৃত্তি  
 ১৯শতকে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে জন্মিয়াছিল। বিশেষতঃ ক্রমবিকাশবাদের  
 দ্বারা পণ্ডিতেরা নানাপ্রকার আনুমানিক সমাজ-বিবর্তনের ছক বা  
 Pattern গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে গবেষণার ফল এত বিস্তৃত  
 এবং তথ্য-সংগ্রহ ক্রমশঃ এত বিপুল হইয়া উঠিতেছে যে এইসব আনুমানিক  
 ঠাটার্ণের অসম্পূর্ণতা ও অযৌক্তিকতা সহজেই ধরা পড়িতেছে। অবশি  
 ঠি অনুযায়ী কোন একটি বিশেষ তত্ত্বের মোহে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী  
 ডিয়া তুলিয়া অনাদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসের একটি  
 বিশিষ্ট ছাঁচ সৃষ্টি করিবার সুবিধা ও প্রলোভন দুইই বাড়িয়া গিয়াছে।  
 এই বিপুল তথ্য সমাবেশের মধ্য হইতে প্রয়োজন ও পছন্দমত তথ্য-সংগ্রহ  
 রিয়া ও তাহাদিগকে একসঙ্গে জুড়িয়া একটি Theory গড়া খুব সহজ।  
 এই গিনসবার্গ (Ginsberg) প্রমুখ আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকেরা সাবধান  
 রিয়াছেন যে ক্রমবিকাশের বিশিষ্ট কোনও ধারা গঠন করা মোটেই

বৈজ্ঞানিক নয়—গবেষণার সুবিধার জন্য অনুমান বা প্রকল্প ( Hypothesis হিসাবেই মাত্র ইহাদের উপযোগিতা। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উপরে সাতটি ব্যাখ্যাই কমবেশী একপেশে।

আধুনিক জ্ঞানের আলোকে ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যাই ( Pluralist Interpretation of History ) বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত প্রমাণ হইয়াছে। মানুষ আদিমকাল হইতে বাহ্যপ্রকৃতি মুখোমুখি বাস করিয়াছে। বাহ্যপ্রকৃতির উপর একদিন যেমন তাহার নির্ভর করিতে হইয়াছে অত্ৰদিকে তেমনি প্রকৃতিকে ভাঙিয়া গড়িয়া নিজের উপযোগী করিয়া বদলাইয়া লইয়া হইয়াছে। প্রকৃতি কখনও মিত্রের মত সহায়তা করিয়াছে কখনও বিরুদ্ধতা করিয়াছে। মানুষও কখনও সহযোগিতা করিয়াছে কখনও সংগ্রাম করিয়া আত্মবিকাশ করিয়াছে।

মানুষের আছে দেহ, আছে মন। আছে দৈহিক শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে মানসিক শক্তি ও বৃত্তি। মানুষকে একদিকে প্রেরণা দিয়া তাহার জৈববৃত্তি ( Biological ), তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কামবৃত্তি এ আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের তাগিদ ; অত্ৰদিকে চাল করিয়াছে তাহার মনোবৃত্তি ( mental ) তাহার বুদ্ধিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ভাবশক্তি ( Emotion )

এই বিভিন্নমুখী শক্তির সমাবেশে তাহার ব্যক্তিত্ব এবং ইহাদের প্রেরণা তাহার মৌলিক প্রেরণা। কিন্তু শক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিত্বের বিস্তারের উপাদান চাই। সেই ক্ষেত্র এবং উপাদান হইল প্রকৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশকে বাদ দিয়া মানুষ তাই চালিত পাবেনা। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী মানুষ আপনার আত্মরক্ষা ও আত্ম-বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া লয়। কাজেই ভৌগোলিক পরিস্থিতি

ব্যক্তিত্ব বিচিত্র

প্রভাব ও দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সভ্যতার মূলে ভৌগোলিক পরিস্থিতি রহিয়াছে একথা অকাট্য। কিন্তু তাই বলিয়া মানুষ প্রকৃতির দাস বা অন্ধ যন্ত্রমাত্র নয়। মানুষের স্বতন্ত্রশক্তি সর্বদাই কাজ করিতেছে। তেমনি মানুষ কোন কালেই মানবীয় পরিবেশ একক নয়। সকল অবস্থাই সে মানুষের দ্বারা পরিবৃত আছে। তাহার চারিদিকে যে মানবদল রহিয়াছে এই মানবীয় পারিপার্শ্বিকও উপেক্ষার নয়। কারণ মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যেমন বোঝাপড়া করে তেমনই তাহাকে তাহার আশেপাশের মানুষ-পারিপার্শ্বিকের সহিতও বোঝাপড়া করিতে হয়। কখনও সহযোগ কখনও প্রতিযোগিতা কখনও সংঘর্ষের মধ্যদিয়া মানুষ অপর মানুষের সহিত নানা বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে। ইহাতেই গড়িয়া ওঠে তাহার সমাজ। মানব-ইতিহাসের কোনও অবস্থায়ই মানুষ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে ছিলনা। যুগ ও দেশ অনুযায়ী মানুষ চিরকালই কোনও না কোনও সামাজিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করিয়াছে।

মানুষের ব্যক্তিত্বের নানাদিক আজও যেমন আছে আদিমকালে তেমনই ছিল। জৈবিক প্রয়োজন বা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও কামবৃত্তি যেমন আদিমকাল হইতেই মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তেমনি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহার ভাববৃত্তি, সৌন্দর্য জ্ঞান, প্রেমবৃত্তি, বলৈষণা তাহার ধর্মবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান। আদিম মানুষের (পুরাপলীয় বা Paleolithic ও নবপলীয় বা Neolithic মানুষের) মতটুকু তথ্য উদ্ধার হইয়াছে তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিত্বের এই বিচিত্রতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অসভ্য জীবনে কেবল জৈবিক প্রয়োজনই প্রাধান্য করিয়াছে একথা বলা চলে না। তাহাদেরও জীবনে সৌন্দর্য-বোধ, হিংসা, আনুগত্য ইত্যাদি মানবীয় চিত্তবৃত্তি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যাহারা অর্থ নৈতিক বা জৈবিকবৃত্তিকেই একমাত্র অধিতীয়বৃত্তি

বলিয়া আদিমজীবনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহারা একদেশদর্শী—একথা আধুনিক তথ্যসংগ্রহ প্রমাণ করিতেছে। কেবল আদিমযুগে নয়, প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগেও মানুষের এই সব বিভিন্নবৃত্তি, মানুষকে প্রেরণা দিয়াছে। তবে কোনও যুগে বা কোনও দেশে প্রয়োজন মত মানুষের এই বহুমুখী ব্যক্তিত্বের কোন দিক বা বৃত্তি প্রাবল্য বা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশ ও কাল অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া মানুষের আত্মবিস্তারের সৌকর্য সৃষ্টি করে। কোনও যুগে কোনও ক্ষেত্রে হয়ত বা কামবৃত্তি, কোথাও বা হিংসাবৃত্তি, কোথাও বা জীবিকাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে একথা বলা ভুল যে কোনও যুগে মানুষের সকল প্রচেষ্টার অধিতীয় ও একমাত্র প্রেরণা কাম বা হিংসা বা জীবিকান্বেষণ। সমাজের পরিবর্তনের মূলেও কোনও একটিমাত্র শক্তি কাজ করিতেছে ইহা বলাও গৌড়ামি মাত্র।

কখনও সংঘর্ষের মধ্যদিয়া সমাজের পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু সংঘর্ষই একমাত্র শক্তি নয়। সমাজবিকাশে সহযোগিতাও সমানভাবে কাজ করিয়াছে। আদিমকালে উপজাতীয় সংঘর্ষ (Tribal Feuds) হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু উপজাতীয় সংঘর্ষকেই একমাত্র সংঘর্ষ ও সহযোগিতা পরিবর্তনের কারণ বলা বিজ্ঞানবিরোধী। গাম্প্লাউইৎস (Gumploviez) নামক পণ্ডিত সংঘর্ষকেই সমাজ-জীবনের মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মার্ক্স, নোভিকোউ (Novicow) প্রভৃতিরও সংঘর্ষকেই প্রাণীজগতের ও মানবজগতের মৌলিক তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আংশিক সত্য মাত্র। ক্রোপোটকিন, বেগ্‌হট্ (Kropotkin, Bagehot) ইত্যাদি সমাজতাত্ত্বিকরা সমান জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে জীবনে সহযোগিতার (Co-operation) স্থান কম নয়। একদলের সহিত অপরদলের সংঘর্ষ যেমন সত্য, তেমনি এ-কথাও

সত্য যে, দল হিসাবে দানা বাঁধিয়া উঠিবার মূলে সহযোগিতাও রহিয়াছে। যখন অপরের সহিত সংঘর্ষ হইতেছে তখনই নিজেদের মধ্যে সহযোগিতাও রহিয়াছে। অনেকের ধারণা অসভ্যরা সভ্যমানুষ অপেক্ষা অধিক হিংস্র। এই ধারণা যে, নিতান্ত ভুল তাহা ডাঃ ওয়েস্টারমার্ক, (Dr. Westermarck) হইতে আরম্ভ করিয়া হবহাউস, গিন্সবার্গ, হুইলার, পেরী (Hobhouse, Ginnsberg, Wheeler, Perry) ইত্যাদি পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন।

মানুষ আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মানবিক বা সামাজিক সম্পর্কও গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রতি মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়াছে সমষ্টিজীবন এবং সমষ্টিজীবনের নানা বাহ্যরূপ। এই বাহ্যরূপই হইল রাষ্ট্র, ধর্ম, বিবাহ, অর্থনীতি, পরিবার, দাহিত্য, কলা, ইত্যাদি। মানুষের সৃষ্ট এইসব প্রতিষ্ঠান লইয়াই তার সমষ্টিজীবন। এইগুলির মধ্যদিয়াই মানুষ পরম্পরের সহিত সম্বন্ধের ঐক্য স্থাপন করিয়াছে। মানুষ যেমন ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে তেমনি ক্ষেত্র এবং কাল অনুযায়ী ইহাদের পরিবর্তন সাধন করিয়া বৃহত্তর সামঞ্জস্য

পরম্পরের সহিত ও প্রকৃতির সহিত স্থাপন করিয়াছে। মানুষ এবং পরিবেশের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া কিস্তি সম্পর্কটি একতরফা নয়। মানুষ যেমন ইহাদিগকে প্রভাবিত করিতেছে ইহাদের প্রভাবও মানুষের উপর পড়িতেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব যেমন আছে তেমনি সামাজিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাবও মানুষের উপর প্রবল। প্রভাব এই অর্থে যে পরিবেশ অনুযায়ী মানুষ নিজেকে ও পরিবেশকে বদলাইয়া লইতেছে। কাজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাপ্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে তেমনি সামাজিক জীবনেরও প্রতি অঙ্গের সহিত অন্য সকল অঙ্গের গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধজালে সমস্ত সামাজিক ও

ব্যক্তিক জীবন আবদ্ধ থাকায় প্রতি অঙ্গের প্রভাব অন্য অঙ্গে সর্বদাই পড়িতেছে। সেই জন্য এক অঙ্গের পরিবর্তনের প্রভাব অন্য সমস্ত অঙ্গেই পরিবর্তন ঘটায়। রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের প্রভাব অর্থনীতির উপর পড়ে, তেমনি অর্থনৈতিক পরিবর্তন আবার রাষ্ট্রে পরিবর্তন ঘটায়। পারিবারিক জীবনের পরিবর্তন যেমন অর্থনীতিকে পরিবর্তিত করে, অর্থনৈতিক পরিবর্তনও সমাজে পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে। পরিবর্তনের এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সমাজবিদরা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন। ইহার মধ্যে সামাজিক জীবনের কোনও একটি দিককে বাছিয়া লইয়া তাহাকেই সমাজের অগ্র সমস্ত দিকের সব পরিবর্তনের অধিতীয় কারণ বলিয়া নির্দেশ করা বৈজ্ঞানিক নীতির বিরুদ্ধ। সমাজ-জীবনের এই পারস্পরিকতা অনুসারে জীবনের প্রত্যেক দিকই অপর সব দিকের পরিবর্তনের কারণ বলিয়া যায়। এই বিধিকে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ায় পারস্পরিকতা বা Law of Functional Interdependence বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও যাহারা একটি দিককে কারণ বলিয়া ধরিয়া সমস্ত সমাজ-জীবনকে তাহার কার্য বা Effect বলেন তাহাদের একবাদ বা monism একদেশদর্শিতাদোষে ছুষ্ট। এ ক্ষেত্রেও বহুবিধ শক্তির পারস্পরিক সমবায়ে ও ঘাতপ্রতিঘাতের ফল স্বরূপ সামাজিক বিবর্তন ঘটে। আধুনিক সমাজবিদরা তাই ইতিহাসের বিচিত্র ও জটিল বিবর্তনকে বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে “বহুবাদী ব্যাখ্যাকেই” অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

চার্লস এলউড<sup>১</sup> শেষ পর্যন্ত ভৌগোলিক ও জৈবিক (Biological) এবং মানসিক (Psychological)—এই ত্রিশক্তির সমবায়ে সামাজিক

<sup>১</sup> “Introduction to Social Psychology,” “Psychology of Human Society”

ীবনে ক্রমবিকাশ ঘটে বলিয়া নির্ধারণ করিয়া থাকেন। এডওয়ার্ড, এ রসও<sup>২</sup> ভৌগোলিক ও বংশানুক্রমিক এবং মানসিক শক্তিকে সমাজ-জীবনের মূল লিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সমাজবিদ মুয়েলার-লায়ার<sup>৩</sup> বিখ্যাত সমাজবিদ সোরোকিন, টয়েনবী ইত্যাদি পণ্ডিতেরা “বহুবাদী-গথ্যা”কেই বিজ্ঞানসম্মত বলিয়াছেন। এমন কি ফ্রয়েড পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন একটি মাত্র শক্তি বা factor অবলম্বনে ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ। অসংখ্য সমাজতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের মধ্যে কয়েকজন পণ্ডিতের নাম এখানে উল্লিখিত হইল। মুয়েলার-লায়ার বলিতেছেন, “পারস্পরিক ক্রিয়ায় ক্রম-সম্পর্কের ক্ষেত্র খুব বিস্তৃত ও জটিল, কেননা প্রতিটি সমাজগত ক্রিয়া মপর ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল।”\*

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—“মানবিক চরিত্র কেবলমাত্র পরিবেশ-নির্ভর হে, অনেকাংশে বংশগত উত্তরাধিকার বা বংশানুক্রমের উপরেও নির্ভরশীল। সর্বদাই সমাজতত্ত্বের এই ভিত্তিগত সূত্রকে মনে রাখিতে ইবে যে, সংস্কৃতিগত বিবর্তনের পিছনে চালক-শক্তি হইয়া কাজ করিতেছে পরিবেশ নয়,—মানুষের মস্তিষ্ক বা মনন-শক্তি, যে মননশক্তি অগ্ৰাণ্ড মানুষদের মননশক্তির সহিত পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ।”\*

২ “Principles of Sociology”

৩ “Evolution of Modern Marriage”

\* “The field of interfunctional relationship is extraordinarily large and complicated, for every sociological function is dependent on every other in some way.”

\* “Human character is not simply and solely dependent on environment but also on inheritance. We must then keep ever in mind the underlying hypothesis of all sociology that the driving force of cultural evolution is not the environment but the human brain, in so far as it is in reciprocal relation to other human brains.”

অন্যত্র মুয়েলার-লায়ার বলেন “সভ্যতার ক্রমবিকাশের পিছনে যে শক্তি কাজ করিতেছে তাহা হইল মানুষের ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিও আবার পরিবেশের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদ্বারা বিবর্তিত হয়।” \*

হার্বার্ট স্পেন্সারও মানুষের মন, দেহ এবং পারিপার্শ্বিক এই তিন শক্তিকেই বিবর্তনের মূল বলিয়াছেন। “একটা একক সত্তা হিসাবে দেখিলে প্রত্যেক ব্যক্তির আছে, দৈহিক কতকগুলি গুণ বা লক্ষণ। .....এছাড়াও আবার মানুষের বৈশিষ্ট্য হইল কতকগুলি মানসিক বৃত্তি; এইসব মনোবৃত্তি সমাজ ও সমাজ-বিবর্তনকে কখনো সাহায্য করে, কখনো বাধা দেয়, কখনো পরিবর্তিত করিয়া দেয়। এছাড়া সর্বদা সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তির বিশিষ্ট ধরণের বুদ্ধিশক্তি এবং মনন-রীতি সমাজস্থিতি বা সমাজ পরিবর্তনের সহযোগী-কারণ রূপে কাজ করিয়া থাকে।” \*

এই সহযোগী-কারণগুলি (Co-operative causes) বলিতে বহুবাদী-ব্যাক্যাকেই বোঝায়। সোরোকিনের (Sorokin) মতও তাই। তিনিও

---

\* “The driving force in the evolution of civilisation is the human will: the will evolves through interaction with the environment.”

\* “Considered as a unit the individual man has physical traits.....he is in every case distinguished by emotional traits which aid or hinder or modify the activities of the society and its development. Always too, his degree of intelligence and tendencies of thought peculiar to him, become co-operative causes of social quiescence or social change.” (Principles of Sociology Vol. I.)



বলেন “পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বহুশক্তির একটা সংহত সমাবেশের মধ্য হইতে কেবলমাত্র একটা শক্তির ওপরে নির্ভর করা—যেমন বহু পণ্ডিত করিয়াছেন—একটা গুরুতর পদ্ধতিগত ত্রুটি। .....আসল সত্য হইল, এই যে, কোন একটীমাত্র অংশ বা অঙ্গ এবং তদগত পরিবর্তন অল্প অঙ্গগুলির উপরে সার্বভৌম প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আসলে, সকল অঙ্গ বা অংশগুলি একত্রে এবং তাহাদের রূপান্তরের সংযুক্ত অগ্রগতিটী নিয়ন্ত্রিত হয় জীবদেহের অন্তর্নিহিত সাধারণ প্রকৃতির দ্বারা।” ( “সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিতত্ত্ব,” ৫২ পৃ, ১ম খণ্ড ) \*

সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করিলে কেবল একটীমাত্র দিকে ( factor ) অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া অযৌক্তিক। সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতির এই বৈচিত্র্য বা বহুমুখীতা সোরোকিন-এর বিরাট গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে। সোরোকিন দেখাইয়াছেন যে একবাদীরা একপেশে। “একবাদীরা মুদ্রার একদিক লক্ষ্য করিয়া অণুদিককে ভুলিয়া গিয়াছেন।” \*

\* “Reliance upon one element of an integrated combination as a main factor in explaining changes within the combination, as many investigators in the field have done, is a serious error in procedure..... the truth is that no one of the parts or the minute changes proper to it, exercises a major influence on the other parts, but all the parts together and the common movement of their transformation are controlled by the general inward nature of the organism as a whole.” ( P. 52, Vol. I. Social and Cultural Dynamics)

\* “They have taken only one-side of the coin and forgotten the other.”

আর্নল্ড টয়নবী (Arnold Toynbe) বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক। তাঁহার “ইতিহাস বিচার” (“Study of History”) সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার একটি আধুনিক স্তম্ভ-স্বরূপ। তিনি এই পুস্তকে সভ্যতার উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলুপ্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বংশবাদী, ভূগোলবাদী ইত্যাদি একপেশে মতবাদের সমালোচনা করিয়া বহুবাদী ব্যাখ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন “এক একটি করিয়া বর্জন করিতে করিতে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। সেই মূলসূত্র হইল এই যে—“সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে এক শক্তি হইতে নয়, বহুশক্তি হইতে। সভ্যতা একটি বিচ্ছিন্ন ও অবিমিশ্র পদার্থ নয়, ইহা বহুশক্তির সমবায়।” (১ ভাগ, ২৭১পৃ) \*

উল্লিখিত আলোচনায় প্রমাণ হইয়াছে যে সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের মূলে কেবল একটিমাত্র নয়, বহুশক্তির (factor) ক্রিয়া রহিয়াছে। এইসব বহুশক্তির মধ্যে কখনও হয়তঃ কোনও একটি প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। কোনও একযুগে কোনও একটি শক্তির প্রাবল্য ঘটয়া অত্র অত্র যুগে অত্র কোনও শক্তির প্রাবল্য ঘটিতে পারে। তেমনি একই যুগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির প্রাধান্য ঘটিতে পারে। এই প্রকার একই দেশে ও কালে কোন-ও ঘটনায় একটি শক্তির প্রাবল্য এবং একই সময় অত্র ঘটনায় অত্র শক্তির প্রাধান্য সম্ভব হইতে পারে। যুরোপেই এক সময় ধর্ম লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। অপর সময়ে বংশ-প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য রক্ত-

---

\* “So far by the process of exhaustion, we have made one discovery; the cause of the genesis of civilisations is not simple, but multiple; it is not an entity but a relation.” ( P. 271 Vol. I. )

পাত হইয়াছে। কখনও বা অর্থনৈতিক কারণও যুদ্ধবিগ্রহের পশ্চাতে কাজ করিয়াছে। কিন্তু সকল যুগে সকল অবস্থায় সকলদেশেই একটি মাত্র বৃত্তি বা শক্তি মানবসমাজকে স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করিয়া আসিয়াছে। এই মতবাদ অণুকার বিজ্ঞান কর্তৃক বজ্রিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিলে নিম্নলিখিত কারণে মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক বা জড়বাদী ব্যাখ্যার গুরুতর ত্রুটিগুলি ধরা পড়িবে।

মার্ক্সীয় ইতিহাস ব্যাখ্যায় জড়শক্তি (Material Forces) বা অর্থনৈতিক শক্তি (Economic Forces) এই দুইকেই মূল বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে। জড়শক্তি (Material Force) এবং অর্থনৈতিক শক্তি

—(Economic Force) এই দুইটি শব্দের অর্থের মধ্যে ‘আর্থিক শক্তি’ অর্থের অস্পষ্টতা রহিয়াছে। “জড় বা ভৌতিক উৎপাদন অস্পষ্টতা শক্তির” (‘Material Forces of production’)

উপর “উৎপাদন-সম্বন্ধ” (Relations of Production) নির্ভর করে—মার্ক্স এ’কথা বলিয়াছেন। এখানে ‘জড় উৎপাদন শক্তি’ (“Material Forces of Production”) বলিতে সমাজে পণ্য উৎপাদনের শক্তিকেই বুঝাইতেছে। অন্তর্গত “জীবন ধারণের জড় ভিত্তি” (Material conditions of existence) এই ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন; ইহাতেও পণ্য উৎপাদন শক্তি বা অর্থনৈতিক শক্তিই বুঝাইতেছে। এদিকে জড়বাদের আলোকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, এই হেতুও মার্ক্সবাদকে “জড়বাদী ব্যাখ্যা” (Materialist Interpretation) বলা হয়। এই দ্বিতীয় অর্থে Material Force মানে হয় “জড়শক্তি”। এখানে দার্শনিক জড়বাদের আলোকে মার্ক্সবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যার মানে একটু স্বতন্ত্ররকমের হয়। এই অর্থে ইতিহাস মানুষের চৈতন্য বা মনোশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত

হয় জড়শক্তির প্রভাবে। এই অর্থের অস্পষ্টতার দরুণ মার্ক্সবাদের বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ববিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক সেলিগম্যান (Prof. Seligman) তাঁহার “ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা” (“Economic Interpretation of History”) নামক বইয়ে “জড়বাদী ব্যাখ্যা” (Materialist Interpretation)—এই ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে “জড়বাদী” শব্দটি মার্ক্স যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধা ও ভ্রান্তিকর হইয়াছে। “আর্থিক ব্যাখ্যা” (Economic Interpretation), এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। “জড়” পারিপার্শ্বিক বলিতে যদি প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিবেশ বোঝান হইয়া থাকে, তবে আর্থিক ও ভৌগোলিক ব্যাখ্যার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। মার্ক্সবাদীদের মধ্যে একদল—কাউটস্কি, সোমবার্ট (Kautsky, Sombart) প্রভৃতি অর্থনৈতিক শক্তি (Economic Factor) বলিতে যন্ত্রকৌশল (technique) মানে করিয়াছেন। অপর-পক্ষে এঙ্গেলস্, (Engels), সেলিগম্যান, (Seligman), কুনাউ, (Cunow), ম্যাসারিক, (Masaryck), ষ্ট্যালিন (Stalin) প্রভৃতি ব্যাখ্যাতারা ইহার আরও ব্যাপক অর্থ করিয়াছেন। ইহাদের মতে “আর্থিক শক্তি” (Economic conditions) মানে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান বা শক্তি, যথা, ভৌগোলিক-পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক ধনসম্ভার, যানবাহনাদি, বাণিজ্য-পদ্ধতি, শ্রমিকশ্রেণী, জনসংখ্যা ইত্যাদি সমস্ত কিছু। (ষ্ট্যালিন বলেন—“ ‘অর্থশক্তি’.... মানে হইল, জীবনধারণের উপযোগী জীবিকা সংগ্রহের পদ্ধতি ; অর্থাৎ ভৌতিক প্রমূল্য বা ঐহিক জীবনের এমন সব বস্তুসম্ভার—যথা, খাদ্য, বস্ত্র, পাছকা, ঘর, ইন্ধন, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বা কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদন করিবার পদ্ধতি যা জীবনধারণ ও সমাজবিকাশের জন্ত অত্যাৱশ্যক।”\*)

\* “This force..... is the method of procuring the means of life necessary for human existence. The

প্রথমতঃ, যদি যন্ত্র-কৌশল (technique) অর্থ ধরিয়া লই তবে দেখা যায় যে technique বা একযুগের বা অর্থনীতি= দেশের উৎপাদন-কৌশল ও যন্ত্রপাতি সেই যুগের 'টেকনিক' সভ্যতা বা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রণ করিতে (উৎপাদন-কৌশল ও যন্ত্রপাতি) পারে না। কারণ যন্ত্রপাতি (technique) নিজেই সম্ভ্যতার একটি অঙ্গ বিশেষ এবং উল্টাইয়া লইয়া বলিলেই ঠিক বলা হইবে যে সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান যে স্তরে থাকে যন্ত্রপাতিই বরং সেই স্তরে থাকে অর্থাৎ বিজ্ঞানের দ্বারাই যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই এই অর্থে আর্থিক ব্যাখ্যা অর্থহীন হয়।

যদি অর্থনীতি বলিতে এঙ্গেল্‌স্‌ ইত্যাদির ব্যাপক অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আরও অর্থহীন হইয়া পড়ে। যদি অর্থনীতি বলিতে সমাজের সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং ভৌগোলিক স্থিতি ও জনসংখ্যা বা বংশতত্ত্ব সবই বোঝায় তবে “অর্থনীতির” মানে কিছুই থাকে না। ইতিহাস ব্যাখ্যা করিতে হইলে ইতিহাসের মূলে যে শক্তি প্রেরণা জোগাইতেছে এবং সামাজিক জীবনের সমস্তদিকের পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করিতেছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ষ্ট্যালিন বলিতেছেন যে ভৌগোলিক শক্তির বা জনসংখ্যার ক্ষয়বৃদ্ধির প্রভাব থাকিলেও ইহারা মূল বা আদি নিয়ন্ত্রক নয়। আদি নিয়ন্ত্রক হইল উৎপাদন-ব্যবস্থা (Production)। (“কোন সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতি যেরূপ, সমাজের

---

mode of production of material values—food, clothing, footwear, houses, fuel, instruments of production, etc.—which are indispensable for the life and development of the society.”

চিন্তাধারা, রাজনৈতিক মতামত ও প্রতিষ্ঠান এবং সমাজও প্রধানতঃ সেইরূপই হইয়া থাকে।”\* (ষ্ট্যালিন)

দ্বিতীয়তঃ, একথা বলা চলে যে যদি মানুষের ধর্ম, বিজ্ঞান, বিবাহ, দর্শন, আইন, শিল্প, সাহিত্য, সবই উৎপাদন-ব্যবস্থার অনুসারে রূপ ধারণ করে তবে ইহাও বলা চলে যে উৎপাদন-ব্যবস্থাও ভৌগোলিক পরিস্থিতির অনুসারে রূপ ধারণ করে। অতএব বরং গোড়াতে মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুযায়ী উৎপাদন করিতে হয়, এই কারণে ইতিহাসের ভৌগোলিক ব্যাখ্যাই অধিকতর সমীচীন হয়। লা প্লে (Le Play) নামক বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত অর্থনীতিকে ভূগোলের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইতিহাসের ভৌগোলিক ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, যন্ত্রকৌশলই হউক (Technique) কিম্বা উৎপাদন-ব্যবস্থাই (Productive system) হউক, ইহার কোনটিই স্থির হইয়া বসিয়া থাকে না, সতত পরিবর্তিত হইতে থাকে। একই ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে কয়েকশ’ বছরের মধ্যেই বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন-ব্যবস্থা মানুষ সৃষ্টি করিয়া লইতেছে, ইহা সর্বদাই দেখা যায়। ইহাতে প্রমাণ হয় মানুষের উদ্ভাবনী বুদ্ধি-শক্তিই এই উৎপাদন-ব্যবস্থার মূলে। ইহাতে ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিবদ্ধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমরা আগেই বলিয়াছি যে কেবল মানুষী শক্তিই সংস্কৃতির একমাত্র মৌলিক কারণ নয়। মানুষী শক্তি এবং বাহ্য প্রকৃতি এই দুই শক্তির বহুমুখী সমবায়ের ফলেই সমাজ ও সভ্যতার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ইতিহাসের একবাদী ব্যাখ্যা ভুল এবং বহুবাদী ব্যাখ্যাই বিজ্ঞান-সম্মত।

\* “Whatever is the mode of production of a society, such in the main is the society itself, its ideas and theories, its political views and institutions.” (Stalin)

(অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার মূল কথা হইল এই যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন পূর্বে ঘটে এবং তাহারই ফলে সামাজিক জীবনের অগ্রাগ্র দিকে (ধর্মে, বিবাহে, সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রে ইত্যাদিতে) অব্যর্থভাবে পরিবর্তন ঘটে।) এখানে অর্থনীতি হইল কারণ এবং সমাজ-জীবনের অগ্রাগ্র দিক হইল তাহারই কার্য বা ফল।) এখানে সামাজিক জীবনে যে কার্যকারণক্রম (Law of Causality) ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা একপেশে এবং বিজ্ঞানবিরোধী। বর্তমান বিজ্ঞানে একপেশে কার্য-কারণবাদ ও নিয়ন্ত্রণবাদ (Causality and determinism) বর্জিত হইয়া ক্রিয়াত্মক সহসম্পর্ক (Functional Co-relation) স্বীকৃত হইয়াছে। কার্য এবং কারণের কোনও চিরস্থায়ী ও একমুখী সম্বন্ধ নাই। যাহা কারণ তাহাই আবার অগ্র অবস্থায় বা অগ্রদৃষ্টিতে কার্য হইতে পারে। এইরূপে যাহা কার্য তাহা আবার কারণও হইতে পারে। এই কারণে সমাজ-জীবনে সকল অঙ্গই পরস্পরের সহিত এমনভাবে জড়িত যে এক অঙ্গের কোনও পরিবর্তন ঘটিলে অপর সকল অঙ্গই তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটবে। এই পারস্পরিকতাই (co-relation) বিজ্ঞান-সম্মত। কাজেই অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটিলে সমাজের অগ্রাগ্র দিকেও পরিবর্তন কিছু না কিছু ঘটবে। তেমনি সমাজের অগ্র যে কোনও দিকে পরিবর্তনের ফলেও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটবে। এখানে সমাজ-জীবনের যে কোনও একটি দিককে কারণ ধরিয়া লইয়া অপরাপর দিকের উপর তাহার প্রভাব বাহির করা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত প্রয়োজন হইতে পারে। (সেই হিসাবে অর্থনীতিকে কারণ ধরিয়া তাহার প্রভাব বাহির করার বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। কিন্তু ইহাকে আংশিক সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাই একমাত্র সত্য নয়। কারণ, অর্থনীতিকেও ধর্মজীবন প্রভাবিত করিতেছে,

রাষ্ট্রের প্রভাবের দ্বারাও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সাহিত্যের প্রভাব ও পারিবারিক জীবনের প্রভাব, শিল্পের প্রভাব অর্থনীতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।) এই হেতু কারণ (Cause) এবং কার্য (Effect) এই দুই শব্দের পরিবর্তে আজকাল পরিবর্ত্য (Variable) শব্দ ব্যবহার করাই অধিক সংগত। যাহাকে সাময়িকভাবে কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহাকে স্বতন্ত্র পরিবর্ত্য (Independent Variable) বলা হইয়া থাকে এবং যাহার উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ঘটয়াছে তাহাকে পরনির্ভর পরিবর্ত্য (Dependent Variable) বলা যুক্তিসঙ্গত। যেমন, (ম্যাক্স ভেবর (Max Weber) তাহার গবেষণায় ধর্মের প্রভাবই অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এই মতবাদ প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্মই কারণ (Cause) এবং অর্থনীতি তাহার কার্য (Effect) মাত্র।) তেমনি বিজ্ঞানকে কারণ ধরিয়া অর্থনৈতিক জীবনে তাহার প্রভাব বাহির করাও চলিতে পারে। এই পারস্পরিকতা স্বীকার করিলে একমাত্র অর্থনীতিকেই চিরস্থায়ী কারণ এবং অপর সকলদিকের জীবন শুধু অর্থনীতিরই সৃষ্টি, এই তত্ত্ব ও মতবাদ নিতান্ত একপেশে হইয়া দাঁড়ায়। আমরা ক্রিয়ায়ক সহসম্পর্কের (Functional Co-relation) নীতিকে সমর্থন করি; অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism) অস্বীকার বিজ্ঞানে একপেশে প্রমাণিত হওয়ায় আমরা ইহার বিরোধী।

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ যুক্তিশাস্ত্রের বিরোধী এবং ইহা অর্থনীতিকে এক সর্বশক্তিমান রহস্যময় Metaphysical বা Mystic শক্তি-সম্পন্ন বস্তুতে পরিণত করে। (যদি অর্থনৈতিক শক্তি সমাজ-জীবনের নিয়ামক ও আরম্ভক বা starter হয় তবে অর্থনীতিকে কে নিয়ন্ত্রণ করে? মার্ক্সের মতে অর্থনীতিতে সর্বাগ্রে পরিবর্তন ঘটে এবং তাহার ফলে অন্যান্যক্ষেত্রেও পরিবর্তন শুরু হয়। কিন্তু প্রশ্ন আসে অর্থনীতিতেই বা



পরিবর্তন কেন ঘটে? ইহার উত্তর মার্ক্সবাদী দিতে পারেন নাই।) যদি বলা হয় অর্থনীতিতে স্বভাবতঃই পরিবর্তন ঘটে বা অর্থনীতি স্বয়ং-ক্রিয়াশীল (Self-starter) তবে অর্থশক্তিকে একটি অজ্ঞেয় রহস্যময় শক্তি অনুমান করিয়া লইতে হয়। (সোরোকিনের ভাষায় “‘স্বয়ং-চালক’ অর্থনীতির মতবাদ মানেই হইল অতি চরম ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর দুজ্ঞেয়বাদ, কারণ ইহাতে অর্থনীতি ঈশ্বরের মতন একটা সর্বশক্তিমান সত্তা হইয়া দাঁড়ায়।”†)

অর্থনীতির এইরূপ ব্যাখ্যায় অর্থনীতির ভিতর পরিবর্তন কেন হয়, কখন হয় এবং কি পদ্ধতিতে হয় তাহা অনির্দেশ্যই থাকিয়া যায়। আর এই সমস্ত পরিবর্তনের কারণকে একটা প্রকাণ্ড অনুমানের উপর দাঁড় করানো হয়। ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ।

যদি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মূলে আবার অগ্র কোনও কারণকে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আর “অর্থনৈতিক” থাকেনা। যদি বলা হয় অর্থনীতিতে পরিবর্তন শুরু হয় রাষ্ট্রিক, ধর্মগত ও আইনগত পরিবর্তনের প্রভাবে তাহা হইলে অর্থনৈতিক শক্তির প্রাথমিক বা মৌলিক প্রাধাণ্য যুচিয়া যায়। ইহাতে আমাদের সমর্থিত পারস্পরিকতাবাদ বা (Interfunctional Co-relation) নীতিকেই স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে সমস্ত সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের অন্যান্য দিকগুলির অর্থনীতির উপরে স্থায়ী ও একদেশদর্শী নির্ভরতা বা অধীনতা (One-sided dependence) আর থাকে না; চালক ও চালিত, আরম্ভক ও আরম্ভ, starter ও started এই দুইয়ের মধ্যে কোনও চিরন্তন পার্থক্য থাকেনা। যাহা চালক (Starter) তাহা আবার

† “The hypothesis of the ‘self-starter’ amounts to the worst kind of mysticism where the economic factor becomes a kind of God.” (Sorokin)

চালিতও (started) বটে। সবদিকগুলিই পরস্পরের কারণ ও ফল হইবে। ইহাতে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বর্জিত হয়। এই যৌক্তিক ক্রটি এই ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞান-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। এঙ্গেলস্, লাভিওলা, প্লেথানভ প্রমুখকে বাধ্য হইয়া কখনো কখনো এই ব্যাপক ও বহুবালী (Pluralistic) ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই অর্থনীতির প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া তাহারা আবার এই একপেশে ও যান্ত্রিক (one-sided & mechanical) অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকেই কায়েম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হয় তাহাদিগকে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা বহুবালী ক্রিয়াশক্তিকে (Pluralistic Functionalism) স্বীকার করিতে হইবে। এই দুই ব্যাখ্যাকে একসঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাই তাহারা শেষ পর্যন্ত অন্যান্য শক্তির (Factor) ক্রিয়াশক্তি স্বীকার করিয়াও অর্থনীতির চরম অন্তিম প্রাধান্যকে ঘোষণা করিয়াছেন।

অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় সব পরিবর্তনের মূলে অর্থনৈতিক শক্তিই কারণরূপে রহিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অর্থনীতির এই প্রাধান্য বা Primacy বা প্রাথমিকত্বের অর্থ কী? ইহার অর্থ দুই-ই হইতে পারে। প্রথমতঃ, ইহা এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে অর্থনীতিই “একমাত্র” কারণ, (Only Cause)। এই অর্থ গ্রহণ করিলে যে যৌক্তিক (Logical) সঙ্কট হইবে এবং একপেশে কারণিকতাকে স্বীকার করিয়া অর্থনীতির অজ্ঞেয় অপরিমেয় শক্তি অনুমাণ করিয়া লইতে হয় ইহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা এই হইতে পারে যে অর্থনীতি অন্যান্য বহু শক্তির (Factor) ভিত্তিতে একটি; কিন্তু ইহারই প্রভাব সর্বগ্রাসী বা বার আনা এই অর্থ ধরিলে ইহার সত্যিকার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও বজায় থাকে না। কারণ ইহাতে সামাজিক বিবর্তনকে বহুশক্তির (Factor) সমবেত ফল (Resultant) বলিতে হয়। তাহা ছাড়া অর্থনীতির প্রভাব বার আনা কিংবা

কতটা এবং অন্যান্য শক্তিগুলির দানই বা কতটুকু তাহা যাচাই করা বা নির্ধারণ করার কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ প্রকাশ করেন নাই। প্রফেসর সেলিগম্যানও তাঁহার “ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা” পুস্তকে মার্ক্সের মৌলিকত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। তবে তিনি অর্থনীতির একমাত্র (Exclusive) প্রভাব না বলিয়া বহুল (Preponderent) প্রভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা অনুসারে বৈজ্ঞানিক নীতিতে ইতিহাস-ব্যাখ্যা দাঁড়ায় না। ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে অনেক মার্ক্সবাদী, এঙ্গেলসের ১৮৯৪ সালের এক পত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন—“অন্যান্য শক্তিকে অস্বীকার করিয়া কেবল আর্থিক শক্তিরই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কার্যকারিত্ব দাবি করা মার্ক্সের কখনোই উদ্দেশ্য ছিল না। আর্থিক পরিবেশই কারণ ও নিয়ামক, এ-কথার অর্থ এই নয় যে, অর্থনীতিই সক্রিয় শক্তি এবং অন্যান্য ঘটনা ও শক্তি কেবল নিষ্ক্রিয় পরিণাম বা কার্য। এক্ষেত্রে বরং পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াই প্রকৃত সত্য। তবে এই পারস্পরিক ক্রিয়ার ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং এই অনিবার্য আর্থিক নিয়ন্ত্রণই শেষ পর্যন্ত অন্য সব কিছুকে ছাড়াইয়া কাৰ্যকরী হইয়া উঠে।” †

† “Marx never meant to claim an absolute validity for economic considerations to the exclusion of all other factors. It is not that the economic situation is the cause, in the sense of being only active agent while all phenomena are only a passive result. It is on the contrary a case of mutual action on the basis of economic necessity which in the last instance, always works itself out.” (Letter of Engels)

এইপক্ষে যদিও এঙ্গেলস অন্যান্য শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন এবং পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ( Mutual Action ) কথা বলিয়াছেন, তবু এঙ্গেলসের শেষ কথাটি ঐ সমস্ত কথাকে ( “mutual action” ও “other factors” ) ব্যর্থ ও নিরর্থক করিয়া তুলিয়াছে। এখানে “আর্থিক নিয়ন্ত্রণই শেষপর্যন্ত সবকিছু ছাড়াইয়া কার্যকরী হইয়া ওঠে” ( “Economic necessity which in the last instance always works itself out” )—এই কথাটিতেই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থনীতি অণুসব শক্তিকে দলিয়া পিষিয়া সর্বজয়ী হয় এবং পরিণামে অর্থনীতির দ্বারাই অণু সবকিছু অমোঘরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, একথা বলার পর “পারস্পরিক ক্রিয়া” ( mutual action ) বা “অণুশক্তি” ( other factors ) নাম মাত্র স্বীকার করার কোনও অর্থ থাকে না। পারস্পরিকতা এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ( economic necessity ) এই দুইয়েরই সামঞ্জস্য “সোনার পাথর বাটি”র মতই অবাস্তব।

তথ্যের দিক হইতেও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা একপেশে এবং ভ্রান্ত। অর্থনীতি বা উৎপাদনের যন্ত্রকৌশল ( Technique of Production ) ভৌগোলিক শক্তিকে বাদ দিতে পারে না। বরং ভূগোলেরই উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়।

তাহা ছাড়া মানুষের ব্যবহার ও সংস্কৃতি সামাজিক পরিবেশের ( Social Environment ) উপর নির্ভর করে। কিন্তু সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কেবল অর্থনৈতিক শক্তিই একমাত্র কার্যকরী শক্তি নয়। এম্পিনাস (Espinass) সামাজিক পরিবেশের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও মানুষের চিন্তাধারা ও জ্ঞানকে যন্ত্রবিজ্ঞানের ( Technology ) নিয়ন্ত্রক ও স্রষ্টা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কোন যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে সেই যুগের যন্ত্রপাতির পারস্পরিক

সম্পর্ক আছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি আগে কোনটি পরে তাহা একমুখী সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্ণয় করা চলে না। মাক্সবাদ বলিবে যে, কোন যুগের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রকৌশলের (Technology) উপরেই সেই যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান নির্ভর করে। কিন্তু এই একপেশে সিদ্ধান্ত ভুল। এম্পিনাস (Espinas)<sup>†</sup> বলেন সেই যুগের চিন্তাধারা ও প্রচলিত ব্যবস্থাই বরং যন্ত্র-পদ্ধতিকে (Technology) বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।\*

সম্পর্কটা আসলে দুইমুখী। পূর্ববর্তী জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়াই নূতন যন্ত্র তৈয়ার সম্ভব হইতে পারে এবং সেই প্রচলিত জ্ঞান তদানীন্তন ভৌগোলিক, আর্থিক ও অগ্রাণু সামাজিক পরিস্থিতিকে অবলম্বন করিয়াই পরিস্থিতি অনুযায়ী যন্ত্র ও যন্ত্রের ব্যবহার-পদ্ধতি গঠন করে। থার্নওয়ার্ল্ড (Thurnworld), এম্পিনাস (Espinas), ভেবলেন (Veblen), স্লেটার (Slater) এমনকি ডি রবার্টিও (De Roberty) প্রকৃতপক্ষে বহুবাদী (Pluralist)। তাঁহার মতেও বিজ্ঞান বা analytical thought যন্ত্রপাতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁহার পুস্তকে তিনি বিস্তৃতভাবে এই মতবাদ ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করিয়াছেন। যন্ত্রবিজ্ঞান (Technology) সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা মাক্সবাদের বিপরীত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছে। (সমাজতত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা অগাষ্ট কোঁতও (August Comte) চিন্তাধারাকেই (Synthetic Thought) সমাজ বিবর্তনে স্তরভেদের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন †)

† 'The Ancient Society' 1878, 'The Origin of Technology' 1898.

\* "It is impossible to deny the co-relation between mental and practical functions."

‡ 'A New Programme of Sociology', '1904'; 'Sociology and Action, 1908.'

(আদিমকালে মানুষ অর্থনীতি দ্বারা যতটা নিয়ন্ত্রিত হইত তাহার অপেক্ষা জৈবিক ( Biological ) ও ভৌগোলিক শক্তির (Geographical Factor) দ্বারা অনেকবেশী নিয়ন্ত্রিত হইত। এ কথা এঙ্গেলসও + স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই শক্তি অর্থনৈতিক শক্তি ( Technique ) হইতে অনেক আদিম ও মৌলিক বৃত্তি। মানুষের ইতিহাসে এই দুই শক্তির ক্রিয়া অর্থনীতির অনেক পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে।

আদিম মানব যৌনবৃত্তি ( Sex Factor ) দ্বারা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত। এঙ্গেলসও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। ফ্রয়েড্ তো ( Freud ) সমগ্র মানব ইতিহাসকেই যৌনবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য ফ্রয়েড্ ও তাঁহার একপেশে মতকে শেষজীবনে সংশোধন করিয়া বহুবার ব্যাখ্যাকে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে এ কথা বলা চলে যে অণুকার বিজ্ঞান ফ্রয়েডের গবেষণাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। ফ্রয়েড্ নিজেই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা যে কত একপেশে ও অসম্পূর্ণ তাহা প্রতিবাদের সহিত ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

আদিম মানব কেবল যে যৌনবৃত্তি ( Sex ) ও বুভুক্ষা ( Hunger ) দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া ব্যক্তিগত জীবনযাপন করিত তাহা নয়। আদিম মানুষের বুদ্ধি তাহাদের ম্যাজিক ( Magic ) এবং তাহাদের টাবু ও ধর্ম-সম্পর্কীয় ধারণা ইত্যাদি দ্বারাও তাহারা প্রভাবিত হইত। তাহাদের সামাজিক এবং অতএব, অর্থনৈতিক জীবনও, সম্পূর্ণরূপে এইসব ধারণা দ্বারা ( ম্যাজিক ইত্যাদি ) প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হইত। অর্থনীতি ইহাদের সৃষ্টি করে নাই ইহারাই অর্থনীতিকে সৃষ্টি করিয়াছে। ম্যালিনাউস্কী ( Malinowsky ), লাউয়ী ( Lowie ), ম্যারেট ( Maret ), টাইলর

+ তাঁহার “পরিবারের উৎপত্তি” বইয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

( Tylor ), ফ্রেজর ( Frazer ), ওয়ালিস ( Wallis ), প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে ।

যেমন আদিম মানুষের জীবন ম্যাজিক ইত্যাদিকে বাদ দিয়া সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য, তেমনি ধর্মকে বাদ দিয়া আদিম, প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজের জীবনকে বোঝা অসম্ভব । ধর্মের প্রভাব সমাজকে তথা অর্থনীতিকে প্রবলভাবে চিরদিনই নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে । কনফুসিয়াস, বুদ্ধ, মহম্মদ, খৃষ্ট ইত্যাদির প্রবর্তিত ধর্মগত চিন্তাধারা সমাজের অর্থনৈতিক জীবন ও প্রণালীকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । ইহাদের প্রভাবে প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রণালীতে যে সব গভীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা কেবলমাত্র সেই যুগের পারিপার্শ্বিকের দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব । এ ক্ষেত্রেও পারস্পরিকতা বা বহুমুখী কার্যকারণ-শৃঙ্খলা এই সব পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে ।

অর্থনীতি যে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ম্যাক্স ভেবার ( Max Weber ) তাহা বিস্তৃত গবেষণায় প্রমাণ করিয়াছেন । ভারতবর্ষে, চীনদেশে প্রাচীন জগতে, মধ্যযুগে, এবং আধুনিক কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ধর্ম, ম্যাজিক ও ঐতিহ্যের দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । (প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম ধনতন্ত্রের ( Capitalism ) উৎপত্তির মূলে এবং রিফরমেশন ( Reformation ) ব্যতীত ধনতন্ত্র স্থাপিত হইতে পারিত না ।) ধনতন্ত্রের গোড়ায় আছে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং যন্ত্র । কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যতীত বিজ্ঞান ও যন্ত্র কোনটি সম্ভব হইত না । (মধ্যযুগীয় সমাজে যে গিল্ড ( Guild ) ব্যবস্থা, এবং রাষ্ট্র ও চার্চের যে কঠোর পীড়ন মানুষের চিন্তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা হইতে মুক্তি আনিয়াছে ষোড়শ শতাব্দীর রিফরমেশন ( Reformation ) । মানসিক মুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই আঠার

শতকে ধনতন্ত্রের স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল। ) অর্থাৎ আগে মানুষের চিন্তাধারায়, ধারণায় ও মনোলোকে পরিবর্তন হয় এবং তারই প্রভাবে সামাজিক প্রথা ও ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

ফ্রেজার ( Frazer ) নৃতত্ত্বে এ যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাহার মতে ম্যাজিক ও কুসংস্কার পর্যন্ত মানুষের সমাজকে গড়িয়াছে। এমনকি কুসংস্কারের মোটামুটি প্রভাব সমাজের পক্ষে কল্যাণকরই হইয়াছে, একথা তিনি বলেন। অর্থনীতি নিয়ন্ত্রক তো নহেই, বরং অর্থনীতি এই সব নানা প্রথা ও ধারণার দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

রস ( Ross ), সোরেল ( Sorel ), এলউড্ ( Ellwood ), লা বো ( Le Bon ), প্রভৃতির মতেও সভ্যতার বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের মূলে ধর্মের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় রহিয়াছে। বেঞ্জামিন কিডের \* ( Benjamin Kidd ) মতেও সমস্ত সামাজিক প্রগতির মূলে রহিয়াছে ধর্ম। সমাজ প্রগতি সম্ভব হইয়াছে পরহিতবৃত্তি ও মানুষের আত্মত্যাগের দ্বারা। সমাজে যে জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে তাহাতে বহু আত্মত্যাগের দ্বারাই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই আত্মত্যাগের প্রেরণা বুদ্ধিবৃত্তি হইতে আসে নাই কারণ বুদ্ধিবৃত্তি স্বার্থপর। এই পরার্থপরতা ও আত্মত্যাগবৃত্তি আসিয়াছে একটি পরা-মানসিক (Ultra-rational) বৃত্তি হইতে। কিডের মতে এই বৃত্তিই ধর্ম।

অর্থনীতি সমাজ-জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক্। ইহার সহিত অগ্ৰাণ্ঠ দিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সম্পর্ক বিভিন্ন ডিগ্রীর বা পরিমাণের হইতে পারে। ইহা কখনও বেশী কখনও কম এবং আত্মহত্যা ও সামাজিক  
অপরাধ  
কোনও দিকের সঙ্গে বেশি, ও কোনও দিকের সহিত  
কম হইতে পারে। এই সম্পর্কের ( Co-relation )  
তারতম্য নানাদিক হইতে পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং এই

\* "Social Evolution" ( 1898 )



এবং গবেষণার সিদ্ধান্ত মার্ক্সীয় একদৈশিক ক্রিয়াকারিত্বকে ( One-sided causality ) খণ্ডন করিয়াছে। অর্থনীতির সহিত অগ্ৰাণু দিকের একটা চিরস্থির অনড় সম্পর্ক রহিয়াছে এ কথা গবেষণার তথ্যসংগ্রহ হইতে প্রমাণ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি লওয়া যাক। যথা, অপরাধ ও আত্মহত্যা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যাপার। সাধারণ দৃষ্টিতে ও মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে, স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত এই হইবে যে দারিদ্র্যই ইহাদের স্রষ্টা। কিন্তু দুর্খমের ( Durkheim ) বিখ্যাত পুস্তকে আত্মহত্যার যে সংখ্যাতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হয় যে অর্থনীতির সহিত আত্মহত্যার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ নয়। দারিদ্র্যশ্রেণী হইতেই যে অধিকতর সংখ্যায় আত্মহত্যা ঘটিয়াছে তাহা নয়। উনিশ শতকে জীবনযাত্রার মানে উন্নতি সত্ত্বেও আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ‘সামাজিক অপরাধের’ (Crimes) সহিতও অর্থনীতির তেমন স্থায়ী সম্পর্ক দেখা যায় না। অবশ্য সম্পত্তিগত অপরাধ স্বভাবতঃই অনেকাংশে অর্থনৈতিক কারণে হয়। কিন্তু অগ্ৰাণু অপরাধ দূরের কথা, এমন কি সম্পত্তিগত অপরাধও ( Crimes against property ) শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। জর্জ রিচার্ড ( George Richard ) নামক পণ্ডিতের গবেষণা এবং সোরোকিনের গবেষণা \* ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ হয় যে উনিশ এবং বিশ শতকের আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অপরাধেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র্যশ্রেণী হইতেই যে অধিকতর অপরাধ হয় তাহা নয়। বরং বহুসংখ্যক ধনী ব্যক্তিই সম্পত্তি-সম্পর্কিত অপরাধে জড়িত থাকেন।

(অপরাধ-বিজ্ঞানে ( Criminology ) যে কেবল অর্থনীতিই প্রধান কারণ তাহা নয়। অগ্ৰাণু শক্তিও ( Factor ) যথা, যৌনবৃত্তি ( Sex ),

\* “Crime and Punishment”

ক্ষমতালিপ্সা ( Love of Power ) ইত্যাদি জৈবিক ( Biological ) ও মানসিক ( Psychological ) প্রেরণাও সামাজিক অপরাধের কারণ।)

বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক প্রফেসর গিন্সবার্গ ( Ginsberg ), হবহাউস ( Hobhouse ) ও হুইলার ( Wheeler ), চারিশত হইতে অধিক আদিম জাতির সমাজজীবন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, অর্থনীতির সহিত এই সব অসভ্যদের ধর্ম, রাষ্ট্র, পরিবার, যুদ্ধ, ন্যায়ধর্ম ( Justice ), নারী-মর্যাদা ইত্যাদির সম্পর্ক কতখানি গভীর ও শাশ্বত তাহা নির্ধারণ করা। তাঁহাদের গবেষণার ফল “অসভ্য জাতিদের ঐহিক কৃষ্টি এবং সামাজিক রীতিনীতি”† নামক বিখ্যাত পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। আর্থিক ( Material বা Economic ) জীবন-পদ্ধতির সহিত সংস্কৃতির ( Culture ) যে সম্বন্ধ ইহারা এই সম্পর্কে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে মার্ক্সীয় আর্থিক নিয়ন্ত্রণবাদ ( Economic Determinism ) সমর্থিত হয় না। একই প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত বিভিন্ন প্রকারের সংস্কৃতি ( রাষ্ট্র, পরিবার ইত্যাদি ) পাওয়া যাইতেছে। অর্থনীতির সহিত এই সব রীতিনীতির প্রত্যক্ষ কার্যকারণ সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। একই প্রকার রাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত রহিয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুর অনুসারে ইহারা অসভ্যজাতিগুলিকে নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন—

শিকারী ( Hunter )—(১) নিম্ন ( Lower )

(২) উচ্চ ( Higher )

† “The Material Culture And Social Institutions of The Simpler Peoples.”

- কৃষিজীবী—(১) নিম্নতম ( Agricultural lowest )  
 কৃষিজীবী—(২) উচ্চতর (Agricultural higher)  
 পশুপালক—(৩) নিম্নতর (Pastoral lower)  
 পশুপালক—(৪) উচ্চতর ( Pastoral higher)  
 কৃষিজীবী—(৫) উচ্চতম ( Agricultural still higher. )

এই সব তালিকা হইতে দেখা যায় শাসনব্যবস্থা বা রাষ্ট্রপ্রথা ইহাদের আর্থিক প্রথার সহিত ভাল রাখিয়া চলে না। পশুপালকদের অর্থব্যবস্থা বা জীবিকারীতি শিকারীজীবীদের চাইতে উন্নত; অথচ দেখা হইতেছে পশুপালকদের মধ্যে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা কম এবং শিকারজীবীদের মধ্যেই বরং বেশী সংখ্যায় প্রচলিত। এমন কি উন্নত কৃষিজীবীদের চাইতেও শিকারজীবীর মধ্যে এই শাসনপ্রথা বেশী। বোহেমিয়ায় সশব্দেও একই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। শিকারী বা পশুপালকদের চাইতেও কৃষিজীবীদের মধ্যে মাতৃতন্ত্রীর সংখ্যা বেশী। অথচ আর্থিক পরপর্ষায় অনুসারে মার্ক্সীয় মতে শিকারী ও পশুপালকদেরই মাতৃতন্ত্রী হওয়া প্রচলিত ছিল। আবার বিবাহ কৃষিজীবীদের চাইতেও নিম্ন-শিকারীদের মধ্যেই বেশী স্থায়ী। এই সব বিশ্লেষণ এবং বিচার হইতে গিন্সবার্গ প্রমুখ পণ্ডিতেরা অর্থনীতি এবং সমাজ-জীবনের মধ্যে কার্যকারণের কোন মোঘ সম্পর্ক নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তিতে তাঁহারা যে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার কিছু দৃষ্টান্ত পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

এই সব তালিকা হইতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হইয়াছে যে অর্থনীতিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রক বলা চলে না।

## ডায়ালেক্টিক প্রয়োগে ক্রটি

সংক্ষেপে মার্ক্সীয় আর্থিক ব্যাখ্যার একদেশদর্শিত্ব আমরা দেখাইয়াছি ইহার পর মার্ক্সবাদে ভিত্তিগত অগ্ৰাণ্য পরস্পর-বিরোধ (Contradiction) আমরা আলোচনা করিব। অর্থনৈতিক শক্তি ও (Economic factor এবং Dialectic) ডায়ালেক্টিক, এই দুইটি তত্ত্বই মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের মৌলিক তত্ত্ব। কেবল অর্থনীতিই যে সমাজ-জীবনের বিবর্তনে একমাত্র ও অদ্বিতীয় শক্তি নয় তাহাই সংক্ষেপে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন ডায়ালেক্টিকের প্রয়োগ যে ক্রটি সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই আলোচনা করিব।

ইতিহাসকে জড়তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মার্ক্স জড়শক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা বিশিষ্ট শক্তির ও স্বভাবের কল্পনা করিয়াছেন। এই মতে পৃথিবীর উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ জড়বস্তুর একটি উপসৃষ্টি বা Bye-product মাত্র। কিন্তু এই জড়বস্তুর মধ্যে এমন একটা অব্যক্ত ও গূঢ় শক্তি আছে যাহার প্রভাবে জড়বস্তু সততই আত্মবিরোধ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করিতেছে। বিরোধ সৃষ্টি করিয়া তাহার সমাধানও এই অজ্ঞেয়শক্তির বলেই হইতেছে। এই নীতিকে ডায়ালেক্টিক বলা হয়। স্থিতি (Thesis) ও প্রতিস্থিতির (Anti-thesis) বিরোধের মধ্য দিয়া একটি নতুন ও উচ্চতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতেছে। এই প্রণালীতেই বিশ্বসংসারের সবকিছু ঘটিতেছে। জড় হইতে প্রাণ ও মনের উৎপত্তি এই অব্যর্থ ডায়ালেক্টিক নীতিকে অনুসরণ করিয়াই হইতেছে। এই তিন ধাপের ফরমুলা প্রকৃতির স্তরে স্তরে অনিবার্যরূপে কাজ করিতেছে। মানুষের সমাজেও যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা এই নীতিরই অমোঘ ফরমুলা অনুসারে ঘটিতেছে। মানব-সমাজের বিবর্তন এই ফরমুলার লৌহশিকলে বাঁধা। মানুষ ও পারিপার্শ্বিক এই দুই শক্তিও পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে আসিতেছে এবং নিত্য নূতন পরিবর্তন সৃষ্টি করিতেছে। মানুষ জড় পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে মানুষের স্বাভাব্য আছে কিনা। মার্ক্সবাদ অনুসারে, আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি,—মানুষের স্বাভাব্য নাই। মানুষ ও তাঁর চেতনা পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা determined। এই হেতু মার্ক্সবাদের ভিত্তি হইল নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism)। মার্ক্সবাদীরা নিয়ন্ত্রণবাদ ও যান্ত্রিকতাবাদ এই দুই নীতির মধ্যে পার্থক্য আরোপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে তাহারা নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক কিন্তু যান্ত্রিকতাবাদ তাহারা সমর্থন করেন না। জীববিজ্ঞান Biology,

মনোবিজ্ঞান, ও দর্শন শাস্ত্রে যেমন তাহারা যান্ত্রিকতাবাদকে  
 যান্ত্রিকতাবাদ ও  
 নিয়ন্ত্রণবাদ  
 অস্বীকার করিয়াছেন, তেমনি সমাজতত্ত্বেও তাহারা  
 যান্ত্রিকতাবাদকে অস্বীকার করেন। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ-

বাদে সহিত যান্ত্রিকতাবাদের পার্থক্য কোথায় তাহা ইহারা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিতে পারেন নাই। মানুষের সমস্ত ব্যবহার ও চিন্তাধারা যদি জড় পরিবেশদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে মানুষ পারিপার্শ্বিকের হাতে যন্ত্র বই আর কিছু নয়; এঙ্গেল্‌সের উক্তিতে তার সমর্থন পাই—“সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ, ধর্ম ও আইন ব্যবস্থা, সমাজ বিবর্তনের মুখে যে সব চিন্তাধারা ও আদর্শ উদ্ভূত হয়,—এ সবের অর্থ বোঝা সম্ভব হয় তখন, যখন ঐ যুগের জড় পরিবেশ বা আর্থিক পরিবেশকে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা হয়। কারণ ঐ সব আইন, ধর্ম, বাণ্ট ইত্যাদি জড় পরিবেশ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে।” \*

\* “All social and political relations, all religious and legal systems, all the theoretical out-looks which emerge in the course of history are to be comprehended only when the material conditions of life of the respectively corresponding epochs are understood and former are derived from these material conditions.” (Review on Critique of Political Economy, p. p. 95.)

মার্ক্সের বিখ্যাত উক্তি “মানুষের চেতনা তার সত্তার নিয়ামক নয়.....  
—“It is not consciousness which determines being.. ...”

ইত্যাদি মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে কোন স্থান দেয় নাই। সমাজতত্ত্বেও এঙ্গেলসে  
ভাষায় রাজত্ব করে গতিতত্ত্বের বিধানগুলি (Laws of Motion)।†

যদিও এঙ্গেলস্, মানবসমাজের প্রকৃতির রাজ্য হইতে কিছু পাথক  
আছে এবং মানুষের ব্যক্তিগত চেতনা ও ইচ্ছা আছে বলিয়া স্বীক  
করিয়াছেন, তবু এই পার্থক্যের বা মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের শেষ পর্য  
কোনও মূল্য নাই এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। §

এঙ্গেলসের আলোচনায় ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে প্রথম দৃষ্টি  
মানুষের ব্যক্তিগত রুচি ও ইচ্ছার অস্তিত্ব চোখে পড়িলেও এই ব্যক্তিগত  
ইচ্ছা বা motive আসলে একান্ত নিরর্থক ও অক্ষম। ইতিহাসে য  
ঘটে তাহার সহিত কোনও ব্যক্তির ইচ্ছার দূর সম্পর্কও নাই। আস  
ম’নবসমাজও জড় প্রকৃতিরই মত নিরপেক্ষ ও অমোঘ কতকগুলি বিধানে

† “General laws of motion which assert themselves  
as the ruling ones in the history of human society.”

আবার,

(Feurbach, p. 59)

“Thus Dialectics reduces itself to the science  
the General laws of motion.” (Feurbach p. 58)

§ “But this distinction.....cannot alter the fact that  
the course of history is governed by inner general law  
.....thus the conflict of innumerable individual wills  
and individual actions in the domain of history produces  
state of affairs entirely analogous to that in the realm  
of unconscious nature.” (Feurbach, p.59)

(Laws) বশীভূত। গতিতত্ত্ব (Laws of motion) জড় বস্তুকে যেমন চালাইতেছে মানব সমাজকেও তেমনি চালাইতেছে। এ কথা মার্ক্স-ও “ক্যাপিটাল” পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্ত্র বলিয়াছেন। তাঁহার “অর্থশাস্ত্রের আলোচনা” (Critique of Political Economy) পুস্তকের ভূমিকায়ও “অপরিহার্য ও মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ” (‘Indispensable and independent of human will’)—এই ভাষায় তিনি মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে আপাতদৃষ্টিতে যে স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি মানুষের দেখা যায় তাহা একান্ত কাল্পনিক (Illusory)

এই নীতিকে যান্ত্রিকতাবাদ (mechanism) ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? প্রকৃতির ক্ষেত্রে জড়বস্তু যখন গতিতত্ত্ব দ্বারা চালিত হইয়া নানা বস্তু বা ঘটনা সৃষ্টি করে তখনই আমরা যান্ত্রিকতাবাদের কথা বলিয়া থাকি। পৃথিবীর ঘটনাগুলি যন্ত্রবিজ্ঞান বা গতিতত্ত্ব (Laws of Motion) অনুসারে ঘটে, এই তত্ত্বকেই যান্ত্রিকতাবাদ বলা হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও যদি সমস্ত ঘটনা গতিতত্ত্বের দ্বারা চালিত হইয়া যন্ত্রবিজ্ঞানের (Law of Mechanics) নিয়মানুসারে ঘটে তবে এ ক্ষেত্রেও যান্ত্রিকতাবাদের (Mechanism এর) শাসন রহিয়াছে এ কথা মার্ক্সবাদ কী করিয়া অস্বীকার করিবে?

পুরুষকার ও দৈব (Freedom ও Necessity) এই দুই শব্দের যে অর্থ হেগেলকে অনুসরণ করিয়া মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষকার (Freedom) অর্থ হয় সজ্ঞানে দৈবকে (Necessity) স্বীকার করা এবং দৈব (Necessity) অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করা। প্রকৃতির রাজ্যে (এবং মানব সমাজে) যে অকাট্য প্রাকৃতিক বিধির শাসন রহিয়াছে, যে সব বিধান বা laws-এর শৃঙ্খলে জড়জগৎ ও মানুষ বাধা রহিয়াছে তাহাকে জানিয়া গুনিয়া মানিয়া লওয়াই হইল পুরুষকার বা স্বাভাবিক বা Freedom। ইহা ব্যতীত অত্র কোনও প্রকার Freedom সম্ভব

নয়। ইহাতেও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে মানুষ প্রাকৃতিক শাসনের দাস মাত্র। “ফয়ারবাক সম্বন্ধে এগার সূত্র” (Eleven Thesis on Feurbach) বইয়েও মার্ক্স “পরিবেশ মানুষ কর্তৃক পরিবর্তিত হয়” (“Circumstances are changed by men”) ইত্যাদি বলিয়াই মানবত্বকে (৬নং সূত্র বা Thesis এ) সামাজিক সম্বন্ধের সমষ্টিমাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মার্ক্সের ভাষায় মানবত্ব বা মানবিক সারপদার্থ “Human essence” আর কিছুই নয়—ইহা আসলে “সামাজিক সম্পর্কেরই সমবায় মাত্র”—“The ensemble of the social relations” মাত্র মার্ক্স বলিয়াছেন প্রাকৃতিক বিধিকে জানিয়া মানুষ যখন কেবল সেই বিধি অনুসারেই জীবন ও সমাজকে রচনা করিবে তখন মানবজাতি ‘দৈবের রাজ্য হইতে পুরুষকারের রাজ্যে প্রবেশ করিবে।’\* এখানে পুরুষকার মানে হইল পূর্বোক্ত প্রাকৃতিক বিধানের বাধ্যতা বা আনুগত্য। কাজেই মার্ক্সবাদ আসলে যন্ত্রবাদ বা mechanism এ-ই পর্যবসিত হয়।

ডায়ালেকটিকের প্রভাবে যেমন একদিকে বাঁধাধরা নিয়মে সামাজিক স্তর সৃষ্টি হইবে এবং প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ বা যান্ত্রিকতা (Determinism বা mechanism) স্বভাবতঃই একটা অবশ্যস্বাভাবী পদ্ধতিরূপে পরিণত হইবে, তেমনি ডায়ালেকটিকের আর এক পরিণতি হইবে সংঘর্ষ বা conflict। সমস্ত পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে সংঘর্ষ, স্থিতি ও প্রতিস্থিতির (Thesis, Antithesis) চিরন্তন ছন্দ। সামাজিক বিবর্তন সম্বন্ধে

সংঘর্ষ বা  
Conflict

মার্ক্সবাদীয় বিশেষত্ব হইল এই সংঘর্ষ (Conflict)।

“পৃথিবীর ইতিহাসই হইল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস,”†

\*“Jump from the kingdom of necessity into that of freedom.”

† “History of the world is the history of class-struggle.”



—মার্ক্স এই বাক্যের দ্বারাই ইতিহাস ব্যাখ্যার দ্বিতীয় তত্ত্বটিকে সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইতিহাস ব্যাখ্যার এই দৃষ্টিভঙ্গী নিতান্তই একপেশে ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। মানবজাতির অগ্রগতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সব কিছুই সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ঘটিয়াছে ইহা ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা সমর্থিত হয়না। সমাজ গঠনের মূল যে সহযোগিতাই (Co-operation) বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা এই সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে। ডার্কইনের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতদের মধ্যে একটা ঝোঁক সৃষ্টি হইয়াছিল যাব কিছুকেই সংগ্রামের মধ্যদিয়া ব্যাখ্যা করিবার। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গী যে একমুখী তাহা পরবর্তী পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন। ক্রপোটকিন তাঁহার পারস্পরিক সহযোগিতা” (“Mutual Aid”) নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে প্রামাণিক আলোচনা করিয়াছেন। আদিম সমাজে clan বা tribe গঠনের মূলে সহযোগিতা রহিয়াছে। এমন কি প্রাণীজগতে যুথ-জীবনের (Herd) ভিত্তিও এই পারস্পরিক সহযোগিতা। মানবজীবনেও এক দিকে যেমন উপজাতীয় সংঘর্ষ (Tribal conflict) সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছে তেমনি উপজাতীয় সহযোগিতাও (Tribal co-operation) সমাজকে গঠন করিয়াছে। উপজাতিগুলি (Tribe) একত্র হইয়া যে জাতি (Nation) গঠিত হইয়াছে তাহার মূলেও রহিয়াছে সহযোগিতা (Co-operation)। মানব-সমাজে এই নীতির ক্রিয়াশক্তি অধিকতর প্রবল বলিয়া দেখা গিয়াছে। হাক্সলি (Huxley) প্রাকৃতিক জগতের গঠিত মানবজগতের পার্থক্য নির্ধারণ করিয়াছেন, এই পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে। মানুষের সঙ্গে পশুর এইটুকুই তফাৎ। টার্ডে (Tarde), ভ্যাতার মূল এই সহযোগিতাকেই বলিয়াছেন। বিখ্যাত আমেরিকান পণ্ডিত জন ডিউই (John Dewey) বলেন, বর্তমানকালে সমাজে

সহযোগিতা এবং সংঘর্ষ এই দুইশক্তিই কাজ করিতেছে ; ইহার কো একটি শক্তিকেই বিবর্তনের মূলশক্তি বা প্রবর্তক বলা বৈজ্ঞানিক তথ্য বিরোধী। “সকল ঐতিহাসিক সমাজ-প্রগতির মূলে সহযোগিতা রহিয়াছে সংঘর্ষ নয়—একথা বলিলেও অতিশয়োক্তি করা হইবে। কিন্তু দুই অতিশয়োক্তির মধ্যে এইটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু একথা ব অবশিষ্টই অতিশয়োক্তি হইবে না যে পশুবলোচিত সংঘর্ষের পরিবর্তে বুদ্ধি সহযোগিতা যে পরিমাণে যে সমাজে স্থাপিত হইয়াছে সেই পরিমাণে সে সমাজ সভ্য। \*”

তারপর মার্ক্স সংঘর্ষের ( Conflict ) একটি বিশেষ প্রকার বা ভঙ্গীতে ইতিহাসের বিবর্তনের মূল বলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে এই সংঘর্ষ দুইটি অর্থনৈতিক শ্রেণীর ( Economic Class ) মধ্যে। তাঁহার শ্রেণী বা Class হইল শুধু অর্থনৈতিক শ্রেণী কিন্তু সমাজ যে শুধু অর্থনৈতিক দলের বা শ্রেণীর সংঘর্ষেই রূপান্তরিত হইয়াছে এ কথাও বিজ্ঞান-বিরোধী কারণ, মানুষ-জীবনে গোষ্ঠীজীবন ( Group life ) নানাপ্রকারের ঐক্যকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যেমন অর্থনৈতিক স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া গোষ্ঠী বা শ্রেণী ( Group ) জমিয়া উঠিয়াছে তেমনই জীবনে অগ্ৰাণ্য স্বার্থকে ( যথা—বংশ, ‘ধর্ম’ ভূগোল ইত্যাদি ) কেন্দ্র করিয়াও

\* “To say that all past historic social progress has been the result of co-operation and not of conflict would be also an exaggeration. But exaggeration again: exaggeration, it is the more reasonable of the two. And it is no exaggeration to say that the measure of civilization is the degree in which the method of co-operative intelligence replaces the method of brute conflict.” (“Liberalism and Social Action”,—Dewey.)

গঠন চলিয়াছে এবং এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের যুথ বা দলের (Group Conflict) সংঘর্ষও ইতিহাসে বিপ্লব সাধন করিয়াছে। আদিম কালে রক্ত সম্পর্কিত গোষ্ঠীদের পরস্পরের সংঘর্ষ ইতিহাসকে অনেকাংশে গঠন করিয়াছে। মধ্যযুগে ধর্ম সংঘর্ষও সমাজে গুরুতর পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। সোরোকিন বলেন “অর্থনৈতিক শ্রেণীর বিরোধ হইতে এই সকল বিরোধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোন কোন সময় পূর্ববর্তী বিরোধ হইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।\*”

অধ্যাপক পেরীও (Perry) সমাজের মূলে শ্রেণী-বিভাগ (Class System) আছে বলিয়া বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মতে এই শ্রেণী (Class) অর্থনৈতিক শ্রেণী (Class) নয়। একই সমাজের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর লোক অর্থনৈতিক শক্তির প্রাধাণ্যহেতু সমাজের কর্তা হইয়া বসেন নাই। তাঁহার মতে দুর্দান্ত শক্তিশালী একটা শাসকগোষ্ঠী (Ruling Class) পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া সকল সমাজের প্রভুত্ব-সম্পন্ন শ্রেণী (Dominating Class) হইয়া বসিয়াছে। †

এই কারণে মার্ক্সীয় শ্রেণীবাদ ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা একদেশিক বলিয়া বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু এ-কথা উল্লেখ করা সঙ্গত যে শ্রেণীসংগ্রাম-ও সমাজে বর্তমান রহিয়াছে। (অর্থনৈতিক স্বার্থ মানুষের চিরকালই আছে, সেই স্বার্থ-প্রসূত সংঘর্ষও আছে।) শ্রেণী সংগ্রাম সত্য হইলেও সমগ্র ইতিহাসকে ও মানবজীবনকে শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা ব্যাখ্যা

\* “These antagonisms being quite different from the antagonisms of the economic classes, have been sometime more important than the former.”

† “They are simply, in the last analysis, consequences of dynastic processes of the struggles of ruling groups for domination over native populations.”

(Origin of Civilisation)

করা অবৈজ্ঞানিক। মানব সমাজের মূলে বিবিধ শক্তি কাজ করিতেছে এবং এইসব বিভিন্ন শক্তির মধ্যে কেবল মাত্র অর্থনৈতিক শক্তি ও তাহার সংঘর্ষকেই সমস্ত বিবর্তনের প্রাথমিক ও অদ্বিতীয় কারণ বলাতেই আমাদের আপত্তি। শ্রেণীসংগ্রাম সমাজে বিদ্যমান কিন্তু তাই বলিয়া শ্রেণীসংগ্রামই ধর্ম, রাষ্ট্র, শিল্প, সাহিত্য সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ইহা অস্বীকার্য। আমাদের মতে নানাবিধ সংগ্রাম ( ইহার ভিতর অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামও আছে ) নানাবিধ গোষ্ঠী, স্বার্থ, এবং নানাবিধ শক্তি ( কাম, মানসিকতা, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি ) সমাজবিবর্তনের মূলে কাজ করিতেছে। ইতিহাসের বিবর্তনে শুধু সংগ্রাম নয় সহযোগিতাও কাজ করিয়াছে। ডিউয়ীর (Dewey) ভাষায় হেগেলীয় ডায়ালেক্টিকে অন্ধভক্তিই এই একদেশিক মনোবৃত্তির জনক। \*

এক কথায় ইতিহাসের বহুবাদী ব্যাখ্যাই ( Pluralistic Interpretation ) বিজ্ঞানসম্মত।

মাক্সীয় ক্রমবিকাশতত্ত্বের আর একটি প্রধান ত্রুটি পণ্ডিতেরা উল্লেখ করিয়াছেন। ডায়ালেক্টিক পদ্ধতির সহিত জড়বাদের সামঞ্জস্য হয় না। হেগেলীয় চৈতন্যবাদ হইতে ডায়ালেক্টিক ফরমূলাকে উৎপাটিত করিয়া আনিয়া মাক্স জড়বাদের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই যোগ বাস্তব জগতে অর্থহীন। কেবল কল্পনাজগতে ইহাকে কৃত্রিম একটা সৃষ্টি বা

জড়বাদের সহিত  
ডায়ালেক্টিক ধাপ  
থায় না

Structure হিসাবে জল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। ডায়ালেক্টিকের প্রধান সার্থকতা হইল প্রগতিবাদে। ডায়ালেক্টিক অনুযায়ী ক্রমবিকাশ ঘটিলে ইহা অনন্ত উন্নতি বা Progress-এর পথে জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবসমাজকে লইয়া যাইবে। কারণ ধাপে ধাপে প্রত্যেকটি সমন্বয় বা

\* "It requires an unusually credulous faith in the Hegelian Dialectic of opposites to think....."

Synthesis এক একটি উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইতেছে। এই অব্যর্থ বা অনিবার্য উন্নতি বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করেন না। তাহা ছাড়া যাহা জড়, চেতনাহীন তাহা একটি নির্দিষ্ট ফরমূলা অনুসারে নিজেকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিবে এই প্রকার বাধ্যবাধকতার মূলে কোনই যুক্তি নাই। বরং হেগেলীয় চৈতন্যবাদের সহিত ডায়ালেক্টিকের সামঞ্জস্য যুক্তিসঙ্গত। কারণ সচেতন চৈতন্যশক্তি একটি উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতিতে নিজেকে পরিচালিত করিতে পারে। কিন্তু জড়বস্তু বা কণিকাগুলি কেন যে একটা বাঁধাধরা পথে আত্মপরিচালনা করিবে তাহা বোঝা যায় না। এই কারণে জড়বাদের সহিত ডায়ালেক্টিকত্বের সামঞ্জস্য হয় না। মার্ক্স জোর করিয়া জড়কে এই ডায়ালেক্টিক অনুসারী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। রাসেল\* এই যোগাযোগকে অস্বাভাবিক বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। এমনকি আমেরিকার বিখ্যাত মার্ক্সবাদী সিড্‌নী হুক্‌ও (Sydney Hook) † এঙ্গেল্‌স্‌কে আক্রমণ করিয়াছেন এই কারণে যে, এঙ্গেল্‌স্‌ জড়প্রকৃতিতেও ডায়ালেক্টিক প্রয়োগ করিয়াছেন। সিড্‌নি হুক্‌ (Sydney Hook) একজন মার্ক্সবাদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁহার পুস্তকে তিনিও বলেন যে মানুষ-সমাজে সচেতন মানুষের সহিত মানুষের সংঘর্ষ বা Class Struggle সম্ভব। কিন্তু অচেতন জড়বস্তুতে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বা Conflict কল্পনা করা নিতান্তই বিজ্ঞান-বিরোধী কাল্পনিকতা বই আর কিছু নয়। মানুষের ইচ্ছা আছে, ঘৃণা আছে, বিদ্বেষ আছে, স্বার্থ আছে। এ-ক্ষেত্রে Conflict সম্ভব। কিন্তু জড়বস্তু নিতান্তই নিরপেক্ষ ও চেতনাহীন; তাহারা কেন পরস্পরের সহিত সম্পর্কে ডায়ালেক্টিক ফরমূলাকে মানিয়া Struggle

\* Freedom and Organisation

† Towards understanding of Karl Marx, Hegel & Marx.

করিবে। আমরা সিড্‌নি হকের এই সমালোচনা সমর্থন করি। হকের মতে মার্ক্সবাদ শ্রেফ সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ। জড় জগতে ইহাকে প্রয়োগ করিলে mechanism বা যান্ত্রিকতা আসিতে বাধ্য।

এঙ্গেল্‌স্‌ মার্ক্সবাদকে বিশ্বজনীন দর্শনে পরিণত করিয়া এবং জড় জগতে ডায়ালেক্টিককে প্রয়োগ করিয়া মার্ক্সবাদকে 'যান্ত্রিকবাদে (Mechanistic Materialism) পরিণত করিয়াছেন। ইহাতে মার্ক্সবাদের সর্বনাশ হইয়াছে। আমরাও হকের এই মত যুক্তিযুক্ত মনে করি। তবে এঙ্গেল্‌স্‌ নয় মার্ক্সই এমন সব উক্তি করিয়া গিয়াছেন যাহাতে যান্ত্রিক জড়বাদই মার্ক্সবাদেব সত্যিকার মতবাদ হইয়া দাঁড়ায়। ডায়ালেক্টিককে বিশ্বজনীন ফরমুলাতে পরিণত করায় সমাজব্যাখ্যায়ও মার্ক্সবাদ স্ববিরোধিতায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। প্লেখানভ্‌ প্রমুখ মার্ক্সবাদীরা এই সমালোচনাকে স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই সমালোচনাকে আক্রমণ করিলেও ইহার জবাব তাহারা কোথাও দেন নাই।

মার্ক্সবাদের অপর ক্রটি ইহার প্রগতিবাদ। ক্রমবিকাশ পরিবর্তন নয়, ইহা একটা অনিবাধ্য উন্নতি বা উর্ধ্বগতি বলিয়া ইহারা ধরেন। ইহাদের ডায়ালেক্টিক নীতির ইহা যুক্তিসঙ্গত ফল। প্রত্যেক স্তরে যে সমন্বয়

মার্ক্সীয় প্রগতিবাদ  
অবৈজ্ঞানিক

(Synthesis) সৃষ্টি হইতেছে তাহা পূর্বস্তর হইতে উচ্চতর (Higher)। এই নীতিতে যখন যাহা ঘটিতেছে তাহাই পূর্বঘটনা হইতে অধিকতর উন্নত এবং

মানব জীবন, তথা বিশ্বসংসার সমস্ত কিছু অনন্ত উন্নতির দিকে যাইতেছে। হেগেলীয় চৈতন্যবাদ অনুসারে ডায়ালেক্টিকের সার্থকতা বোঝা সহজ একথা আগেই বলিয়াছি। সেই নীতিতে অনন্ত উন্নতির পথে চৈতন্যশক্তির অভিযান ঘটিতেছে ইহাও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু জড়-জগৎ ও প্রাণহীন,

চতন্যহীন, জড়কণিকারাও ক্রমাগত উন্নতির পথে যাইতেছে এ কথা বোধ্য। কিন্তু ডায়ালেকটিক জড়বাদ এই ঘোষণাই করে যে বিবর্তন (Evolution) মানেই অনন্ত প্রগতি।

এ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান ভিন্নমত পোষণ করে। উন্নতি (Progress) মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর ও আদর্শের উপর নির্ভর করে। মানবসমাজ কমেই উন্নতির দিকে যাইতেছে এ' কথাই কোনও নির্দিষ্ট বা সর্ববাদীসম্মত বর্ধ নাহি। কারণ “উন্নতি” বলিতে নানাপ্রকার অর্থ বোঝা যাইতে পারে। প্রাচীন বা মধ্যযুগ হইতে আধুনিকযুগ উন্নত এ কথা স্বীকার করিতে বা স্বীকার করিতে প্রত্যেক মানুষকেই নিজ নিজ রুচি বা আদর্শের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ইহা ভাল-মন্দ জ্ঞানের সহিত জড়িত এবং নীতি শাস্ত্রের (Ethics) অন্তর্ভুক্ত। সমাজে ঐশ্বর্যের ও শক্তির দিক দিয়া উন্নতি টলেও হয়ত নৈতিকদিকে অবনতিও ঘটয়াছে। যে যে প্রকার মানদণ্ড (Standard) অনুসারে বিচার করিবে তাহার কাছে সেই প্রকার বন্ধান্তই যুক্তিযুক্ত মনে হইবে। এই কারণে বিজ্ঞান ক্রমবিকাশকে শুধুমাত্র “পরিবর্তন” বলিয়া গ্রহণ করে। গিন্সবার্গ বলেন “বিবর্তন ও প্রগতির মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত। তা ছাড়া, হাও স্বীকৃত যে সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুসন্ধানের সমস্তা তার নৈতিক পরিমাপের সহিত সম্পর্ক বিরহিত।” \*

ক্রমবিকাশের কয়েকটি বাঁধাধরা স্তর নির্ণয় করিয়া মার্ক্সবাদ বলিতেছে যে পৃথিবীর সমস্ত সমাজ এই কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপের মধ্য দিয়া অগ্রসর

\* “The distinction between evolution and progress is now generally accepted and it is recognised that the problem of tracing the actual course of social development is distinct from its ethical valuation.”

হইতে বাধ্য। এই প্রকারের ক্রমবিকাশকে একরৈখিক বিবর্তন (Unilinear Evolution) বলা যাইতে পারে। পূর্বতন ক্রমবিকাশবাদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বিভিন্নকালের তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বাহ্য সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া একটা মনগড়া ছক্ বাহ্যিক করিয়াছেন। এখনকার গবেষণায় এইসব বিবর্তনবাদীদের একরৈখিক (Unilinear) ক্রমবিকাশ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। গিন্সবার্গের ভাষায়— “একরৈখিক বিবর্তনবাদ বহুল সমালোচিত এবং সর্বজন প্রত্যাখ্যাত পূর্ববর্তী নৃতাত্ত্বিকদের উপস্থাপিত শীকার, পশুচারণ ও কৃষির ধারাবাহিকত পর্ববর্তীরা ভিত্তিহীন প্রমাণিত করিয়াছে। সেই প্রকার, পরিবারের বিবর্তনে একটি ছককে সার্বজনীন বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই অথবা সর্বত্রই মাতৃস্বত্বের পর পিতৃস্বত্বের স্তর উপস্থিত হইয়াছে এ-কথা গ্রহণ করারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।” †

† “The first type of theory namely, that of unilinear recurrence has been subjected to much criticism and is now perhaps hardly held by anyone. The sequence, for example, of hunting, pastoral and agricultural stages often put forward by earlier writers has been shown by ethnologists to be quite unfounded ... ..similarly there is no reason for accepting any particular scheme of the forms of family.....as universal or to hold that mankind everywhere passed from a stage of mother-right to one of father-right.” (Studies in Sociology p. 90)



উনিশ শতক হইতে সমাজবিদদের মধ্যে বিবর্তনের নির্দিষ্ট স্তর (stages of evolution) বাঁধিয়া দিবার একটা ফ্যাশান দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। অগাষ্ট কোঁতে (August Comte) তাঁহার ‘তিনস্তরের বিধান’ (Law of three stages) প্রবর্তন করিয়া এই ফ্যাশানের পথ দেখাইয়াছেন। মর্গান মার্ক্সবাদের গুরুস্থানীয়। মর্গান যে ক্রমবিকাশ পদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন এবং এঞ্জেলস যে পদ্ধতিকে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের প্রবর্তিত বিবর্তন “রৈখিক” (Linear) ক্রমবিকাশেই পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পরিবারের পাঁচটি স্তর অনিবার্য এবং পৃথিবীর সমস্ত সমাজ এই পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং যাইবে। অর্থনীতিরও এইরূপ নির্দিষ্ট স্তর ইহারা ঘোষণা করিয়াছেন। এই অর্থনীতি এইজন্ত মার্ক্সবাদ ও রৈখিক বিবর্তনের (Linear Evolution) সমর্থক। বোয়াস, রিভারস, গোল্ডেনভাইসার, ভিস্‌লার, রবার্ট লাউয়ী প্রভৃতিরা (F. Boas, Rivers, Golden-Weiser, Wissler, Robert Lowie) এই রৈখিক বাঁধাধরা স্তর অনুযায়ী ক্রমবিকাশের মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। সোরোকিনের গবেষণাও এসম্বন্ধে যুগান্তকারী। আমরা বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক সমাজতত্ত্ববাদের গবেষণার ভিত্তিতে এই মার্ক্সীয় Linear Evolution বা বাঁধাধরা ক্রমানুসারী বিবর্তনকে সমর্থন করি না। আধুনিক বিজ্ঞানে ক্রমবিকাশের মূলতত্ত্ব হইল “পরিবর্তন”। পরিবর্তন কল্যাণকর বা অকল্যাণকর, তাহা আদর্শানুযায়ী নির্ধারিত হইবে। ক্রমবিকাশ শুধুমাত্র রৈখিক (Linear) নয়। আমাদের মতে ক্রমবিকাশ সৃজনপর (Creative) এবং নিত্য নূতন সৃজনের মধ্যদিয়া বিবর্তন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বার্গস সৃজনমুখী ক্রমবিকাশকে প্রচার করিয়াছেন। সোরোকিন-ও ক্রমবিকাশকে ‘Creative-Erratic’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ক্ষুদ্রতর কালের পটভূমিকায় ইতিহাসের গতি

রৈখিক বা চক্রিক (Cyclic) হইতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর পটভূমিকায় যাহা রৈখিক তাহা চক্রিকও হইয়া প্রতিভাত হইতে পারে। এই প্রকারে ইহার বিপরীতও সম্ভব হইতে পারে। আসলে অনন্তকালের গতিকে কোনও ফরমুলাতে বাঁধা সম্ভব নয়। মনগড়া ছক্ আঁকিয়া ইতিহাসের কোনও অংশ বা খণ্ডকে কোনও বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা চলিতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের মাপকাঠিতে তাহার স্থায়ী মূল্য নাই। কোন সমাজে সভ্যতার গতি সমরেখায় অগ্রসর হইলেও সেই যুগেই পৃথিবীর অপর অংশে ক্রমবিকাশ বৃত্ত বা চক্রিক গতিকে অনুসরণ করিতে পারে। কোথাও বা দোলক-গতি, (Pendular) কোথাও বা কন্স্পিরেটিক (Spiral) গতি ইত্যাদি নানা গতি-বৈচিত্র ক্রমবিকাশে লক্ষিত হয়। আবার সমগ্র মানবজাতি হিসাবে বিচার করিলে ইতিহাসের গতি অল্প প্রকারের বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এই কারণে বিজ্ঞানের আধুনিক পরিণতি ক্রমবিকাশের এই ছক্ কাটার বিরোধী। গিন্সবার্গ বলিতেছেন, “ইহা একবার বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন ক্রমিক পরিবর্তন ধারার সার্বিক প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং এক ক্ষেত্রের ফল অল্প ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।”\*

মার্ক্সীয় আর্থিক ব্যাখ্যায় যদি নিয়ন্ত্রণ-বাদকে (Determinism) স্বীকার করিতে হয়, তবে ব্যক্তির কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। ইতিহাসে মানুষ আর্থিক শক্তির যন্ত্রমাত্র—ইহাই মার্ক্সীয় নিয়ন্ত্রণবাদের ভিত্তি। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিভাশালী পুরুষ ইতিহাসে কোন ভাঙাগড়ার জন্ম দায়ী হন তবুও মার্ক্সের মতে ঐ ব্যক্তির স্বাভাবিকতা নাই। সে ইতিহাসের যন্ত্র। অবশ্য

\* “If this be once realised it will be seen that we cannot generalise any serial order of change found to hold good and extend it readily to other cases.”

মার্ক্সবাদীরা “ফয়ারবাকের সূত্র” ইত্যাদি হইতে বিরল দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ব্যক্তির ভূমিকা বা role সম্বন্ধে নজীর দেখাইয়া থাকেন। ইতিহাসকে কেবল পারিপার্শ্বিকের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। মার্ক্সবাদ পারিপার্শ্বিকবাদ তাহা ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইতিহাসে ব্যক্তিত্বের স্থান আমাদের মতে কারলাইল ইত্যাদি ব্যক্তিবাদীরা যেমন একদেশদর্শী তেমনই মার্ক্স ইত্যাদি পারিপার্শ্বিকবাদীরাও একদেশদর্শী। ব্যক্তিকে যেমন পারিপার্শ্বিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলিবেনা তেমনই পারিপার্শ্বিককে ব্যক্তি হইতে আলাদা করিয়া দেখা অসম্ভব। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীই অসম্পূর্ণ। আমরা ব্যক্তির প্রতিভার বিশেষত্ব স্বীকার করি কারণ আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশেষত্বকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। তেমনই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবও শক্তিশালী। এই দুইয়ের মৌলিক শক্তি ও পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতেই সামাজিক পরিবর্তন সৃষ্ট হয়।

মার্ক্সবাদ অনুসারে স্বদেশ-প্রেম বা Nationalism একটা শ্রেণী-স্বার্থের সৃষ্টি।) (ধনতন্ত্রের (Capitalism) সৃষ্টি হইল জাতীয়তাবাদ Nationalism)।) সমাজে দুইটি শ্রেণী আছে এবং এই দুই শ্রেণীর স্বার্থে চিরন্তন বিরোধ রহিয়াছে। এই দুই বিরুদ্ধ শ্রেণীস্বার্থ একত্র করিয়া কোন প্রকারের “জাতীয় স্বার্থ” সৃষ্টি হইতে পারে না। (জাতি বলিয়া অর্থও কোনো জিনিস নাই।) যাহা আছে তাহা দুইটি ও বিরুদ্ধ খণ্ডমাত্র, ধনিক ও শ্রমিক। এই দুই স্বার্থের কোথাও কোনো ষোগাযোগ বা মিল নাই। কাজেই জাতীয় স্বার্থ বলিতে কিছু নাই। প্রত্যেক সমাজই এইভাবে আনিজম ও জাতীয়তা-বিরোধী পরস্পর-বিরোধী দ্বিখণ্ডিত। কাজেই পৃথিবীর শ্রমিক স্বার্থ সর্বত্রই এক, ইহাতে ভৌগোলিক সীমার কোনও প্রভাব নাই।

তেমনি পৃথিবীর ধনিকের স্বার্থ সর্বত্র এক ও অবিচ্ছিন্ন। কাজেই ধনিক

এক জাতি এবং শ্রমিক অপর জাতি। ইহাদের স্বার্থ, সংস্কৃতি ও মানস গঠন বিপরীত। কাজেই জাতীয়তাবাদ বলিয়া কোনও কিছুই অর্থ নৈতিক ভিত্তি যেমন নাই তেমনই ইহার মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) ভিত্তিও কিছু নাই। দ্বিতীয়তঃ, (জাতীয়তাবাদ দাঁড়াইয়া আছে অনেকাংশে সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া। জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ এবং তাহাকে উন্নত করিবার চেষ্টা জাতীয়তাবাদের মুখ্যকথা।) কিন্তু মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা মূল কথাই হইল এই যে সংস্কৃতির ভিত্তি অর্থনীতি। কাজেই সমাজের শ্রেণী দুইটির সংস্কৃতি আলাদা হইতে বাধ্য। যে যুগে যে শ্রেণী প্রধান, সে যুগে সেই শ্রেণী-সংস্কৃতি প্রবল। বর্তমান যুগ ধনিক-সংস্কৃতির যুগ। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-সংস্কৃতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। শ্রমিক-সংস্কৃতি পৃথিবীব্যাপী এক এবং অবিচ্ছিন্ন। কারণ যে শ্রেণী স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে তাহা সর্বত্রই এক। ধনিক স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া যে সংস্কৃতি—জাতীয়তাবাদ তাহারই অংশ। তৃতীয়তঃ (জাতীয়তাবাদ ধনতান্ত্রিক (Capitalist) শোষণের ও স্বার্থ সিদ্ধির যন্ত্রমাত্র। ইহা সাম্রাজ্যবাদেরই অন্তরূপ। ধনিকেরা জাতীয়তাবাদের নামে শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধকে চাপা দিয়া তাহাদের শ্রেণী-স্বার্থকে সিদ্ধ করে।) এই সব কারণে জাতীয়তাবাদ কম্যুনিজমের পরিপন্থী এবং তাই (মার্ক্সবাদের শ্লোগান, “দুনিয়ার মজদুর এক হও”—(Worker of the world unite)—ইহার ব্যাখ্যায় মার্ক্সবাদীরা জাতীয়তাবাদ বিরুদ্ধতা করিয়া থাকেন।)

আমাদের মতে কিন্তু সমাজতন্ত্রের সহিত জাতীয়তাবাদের সামঞ্জস্য হয়। ইতিহাসের মূলে বহুশক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মানুষের ভাবাবেগ শক্তিও (Emotional factor) রহিয়াছে। জাতীয়তাবাদ ভৌগোলিক, মানসিক (Emotional), সামাজিক

সংস্কৃতি, বর্ণ (Race) ইত্যাদি বহুশক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট একটা জটিল সত্তা ! ভৌগোলিক সীমা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তেমনি জাতি ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্যও মানুষকে প্রভাবিত করে। ঐতিহ্যের (Historical Tradition) বা সামাজিক জীবনের স্মৃতিস্মরণের সমষ্টিগত ইতিহাসের ছাপও মানুষের উপর কম নয়। পূর্বেই বর্ণিত ইতিহাস মানুষের জীবনে একটা প্রবল সত্য। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বসংস্কৃতিতে আমরা বিশ্বাস করিলেও জাতীয় সংস্কৃতিরও মূল্য আমরা স্বীকার করি। ঐক্যের মধ্যে অনৈক্য আছে এই ভেদাভেদবাদ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও খাটে। ঐতিহাসিক কারণে ও ভৌগোলিক সমাবেশের ফলে মানবসমাজের বিভিন্ন অংশগুলির (Unit) কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে এবং থাকিবে। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্য কমিয়া ক্রমশঃ সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য বাড়িয়া যাইবে ইহা সত্য কিন্তু মানবসমাজের সর্বত্র সাদৃশ্য ঘোলানা সাদৃশ্যে পরিণত হইবে না। কারণ রুচি, চিন্তাধারা পারিপার্শ্বিক ইত্যাদির বৈচিত্র্য লুপ্ত হইবে না। ইহা ছাড়া ঐতিহ্যের শক্তিও মানুষ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বিভিন্ন আদিক্রম বা সনাতন ও মৌলিক সত্তারূপের (Archetype'র) গভীর ভিত্তি আছে বলিয়া স্বীকার করিতেছে। সুদূর ভবিষ্যতেও মানুষের প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হইবে বলিয়া আশা করার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আজও পাওয়া যাইতেছে না। এই কারণে জাতীয়সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিতেই হয়।

তৃতীয়তঃ, জাতীয়সংস্কৃতির সহিত বিশ্বসংস্কৃতির বিরোধ নাই। বিরোধ সৃষ্টি হয় গৌড়ামির সহিত গৌড়ামির। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অর্থ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে প্রবল করিয়া তুলিলেই গৌড়ামির সৃষ্টি হয়। বৈশিষ্ট্যের আতিশয্য কল্পনা করিয়া বর্তমান পৃথিবীতে

অনেক জাতি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি শুধু ভেদই নয়  
 অভেদও সমান সত্য। সংস্কৃতিগত কোনও দিক হইতে যেমন বৈশিষ্ট্য  
 থাকিতে পারে তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও মানবপ্রকৃতির গভীরতর প্রদেশে  
 যে বিশ্বব্যাপী ঐক্য রহিয়াছে তাহাও প্রবল ও বাস্তব সত্য। কাজেই  
 এই ঐক্যের ভূমিকায় বৈশিষ্ট্যকে দেখিলেই জাতীয়তাবাদের সত্যিকার  
 স্বরূপ বোঝা যাইবে। তাহা হইলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে জাতীয়তাবাদ ও  
 আন্তর্জাতিকতাবাদ ( Internationalism ) পরস্পরের সহায়ক। ইহাদের  
 মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বহুজাতির সমস্বার্থের ও সাদৃশ্যের উপর  
 ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধী  
 ইত্যাদির জাতীয়তাবাদ এই শ্রেণীর। চতুর্থতঃ, সমাজে শ্রেণী থাকিলে  
 ও শ্রেণীসংগ্রাম একটা অকাট্য সত্য হইলেও মানুষের জীবনে শ্রেণীস্বার্থই  
 একমাত্র স্বার্থ নয় এবং অর্থনীতিই জীবনে একমাত্র নীতি নয়। সমষ্টি  
 জীবনের ( Group Life ) একপ্রকার প্রকাশ হইয়াছে অর্থনৈতিক  
 শ্রেণীর মধ্য দিয়া। জীবনের অন্তর্গত দিককে আশ্রয় করিয়া সমষ্টি  
 জীবনের অন্তরূপও দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম, রক্ত, সমাজ, ভৌগোলিক  
 পরিবেশ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়াও মানুষের সংস্কৃতির ও গোষ্ঠী জীবনের  
 এক একটা দিক গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব বিভিন্ন দিক গোট  
 সাংস্কৃতিক জীবনের এক একটি Cross Section। একই ভৌগোলিক  
 পরিস্থিতিতে বাস করিয়া একই ঐতিহ্যের প্রভাবে লালিত পালিত হইয়  
 এক একটি সমাজে কতকগুলি সমস্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া “জাতি”-চেতনা  
 গড়িয়া ওঠে। ইহাকেও সমষ্টিজীবনের এক প্রকাশ বলিয়া স্বীকার  
 করিতে হয়। শ্রেণীস্বার্থও রহিয়াছে কিন্তু অন্তর্দিক হইতে ধনিক এবং  
 শ্রমিক উভয়েরই কতকগুলি সমস্বার্থ রহিয়াছে। সেই সমস্বার্থকে ভিত্তি  
 করিয়া মানসিক বৃত্তিও সৃষ্টি হইতেছে। ইহাই জাতীয়স্বার্থের ভিত্তি

জাতীয়তাবোধ ( Nationalism ) । শ্রেণীস্বার্থের সহিত জাতীয়স্বার্থের এই প্রকারে সামঞ্জস্য হয় । পঞ্চমতঃ, জাতীয়তাবাদ পররাজ্যগ্রাসী ( Acquisitive ) হইতেই হইবে তাহা নয় । আন্তর্জাতিক স্বার্থবোধ সম্মুখে থাকিলে জাতীয়স্বার্থবোধ অপরকে গ্রাস করিবার মনোরুতি সৃষ্টি করিতে পারে না । ব্যক্তির সহিত যেমন সমাজের সামঞ্জস্য প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্কেও সামঞ্জস্য প্রয়োজন, তেমনি জাতির সহিত আন্তর্জাতিক এবং জাতির সহিত অপর জাতির পারস্পরিক সামঞ্জস্যও প্রয়োজন । যেমন ব্যক্তির জীবনে স্বাধিকারের সীমা টানিতে হয় তেমনি জাতির জীবনেও স্বাধিকারের সীমা টানিয়া আন্তর্জাতিক সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে । এই সামঞ্জস্যের দৃষ্টিভঙ্গী হারাইয়া ফেলিলে সংঘর্ষ ও বিপর্যয় অনিবার্য হইবে । যুগে যুগে এই সামঞ্জস্যকে নতুন করিয়া খুঁজিয়া লষ্টতে হইবে, চিরদিনের কোনও শাস্ত সমাধান এ-সমস্যার নাই । বস্তুতঃ, সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে সকল সমাজে স্থাপিত হইলেও জাতীয়তাবাদ লুপ্ত হইবে না । সেই যুগেও, একটি সমাজতান্ত্রিক জাতি বা দেশের সহিত অপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামঞ্জস্য স্থাপন সেই যুগের সমস্যারূপে দেখা দিবে । সেই যুগেও যদি কোনো দেশের স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হইয়া সীমা ছাড়ায় তবে সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার বাধা নাই । সমাজতন্ত্র, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, মানুষের জীবনোপকরণের কল্যাণকর বণ্টনের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশের দরজা খুলিয়া দিবে । কিন্তু মানুষের অধিমানস অত্যাগ্র শক্তির লীলাক্ষেত্র থাকিবেই । কাজেই নানাপ্রকার শক্তির প্রভাবে মানুষের ভাবগত জীবন (Emotional life) প্রভাবিত হইবে । কাজেই জাতীয় চেতনা, স্বদেশপ্রীতি মানুষের মন হইতে লুপ্ত হইবে এ-কথা মনে করিবার ও কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই । আত্মপ্রীতি ও আত্মীয়প্রীতি যেমন

মানুষের মনোধর্মের অংশ, তেমনি স্বদেশপ্রীতিও মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম। এইসব কারণে জাতীয়তাবাদের বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে। এবং সমাজতন্ত্রের সহিত জাতীয়তার কোন বিরোধ নাই বলিয়া আমরা মনে করি। অবশ্য মার্ক্সবাদী পরিকল্পনায় অর্থনীতিই একমাত্র শক্তি ও সংস্কৃতির ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হওয়ায় কম্যুনিজমের সহিত জাতীয়তাবাদের সামঞ্জস্য হয় না এ-কথাও ঠিক।

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি জড়বাদ এবং নিয়ন্ত্রণবাদ। জড়শক্তি ও ডায়ালেকটিকের অনিবার্য প্রভাবে সমাজে সমাজতন্ত্র দেখা দিবে। সমাজবিকাশের এই মূলতত্ত্ব তাহারা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের জড়বাদী সমাজতন্ত্রকে তাহারা বৈজ্ঞানিক বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি আধুনিক বিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান এই প্রকার নিয়ন্ত্রণবাদকে একদেশদর্শী বলিয়া মনে করে। ইতিহাসে জড়শক্তিই একমাত্র শক্তি নয়। মনোশক্তি এবং তাহার প্রাধান্য বিজ্ঞান স্বীকার

করে। কাজেই সমাজতন্ত্রের সহিত জড়বাদের অচ্ছেদ্য সমাজবাদ ও জড়বাদ সম্পর্ক আছে ইহা একটা মারাত্মক বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তি।

মানুষের সমাজে সমাজতন্ত্র যদি আসে তবে তাহা মানুষের চেষ্টায় ও আদর্শানুগত কার্যের ফলে আসিবে। (জড়শক্তির প্রভাবে যেমন ধনিকতন্ত্র সৃষ্ট হইতে পারে তেমনি সমাজতন্ত্রও সৃষ্ট হইতে পারে।) তেমনি মনঃশক্তির প্রভাবেও ধনিকতন্ত্র ও শ্রমিকতন্ত্র উভয়ই সৃষ্ট হইতে পারে। আসলে জড় এবং মনঃশক্তি পরস্পরের সহিত একযোগেই কাজ করিয়া চলিয়াছে। কাজেই সমাজতন্ত্রের সহিত কেবল জড়বাদেরই অঙ্গঙ্গী সম্বন্ধ আছে এ-কথার কোনই ভিত্তি নাই।

মানুষের মধ্যে বহুশক্তির ক্রিয়া আছে। তাহার এই বিচিত্র ব্যক্তিত্ব জড়শক্তিকে নিজের কল্যাণে ব্যবহার করে। তাহার কল্যাণের পরিকল্পনাও



বহুমুখী, ভৌতিক জীবনের উপকরণ যেমন ইহার অংশ তেমনি আত্মিক জীবনের প্রগতিও সেই আদর্শের অংশ। নানা বিচিত্র শক্তির প্রভাবে মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনায় জড়বাদী বা অধ্যাত্মবাদী হইতে পারে। ঐহিক জীবনের প্রচেষ্টায় মানুষ সমাজতান্ত্রিক বা ব্যক্তিবাদী হইতে পারে। মানুষ যদি কেবল জড়শক্তির যন্ত্রমাত্র হইত তবে জড়বাদের সহিত সমাজতন্ত্রের অনিবার্য যোগসাধন করিত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি জড়শক্তিই একমাত্র শক্তি নয়। মনঃশক্তিও প্রধানশক্তি। কাজেই যে-কোন সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের মন সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে। ঐহিক জীবনের সাম্য বা বিলি-ব্যবস্থা অনুযায়ী মানুষ মানসজীবনে জড়বাদী বা চৈতন্যবাদী দুইই হইতে পারে। সমাজতান্ত্রিককে জড়বাদী হইতে হইবে, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি জড়বাদ, এ-কথা জড়বাদীয় ব্যাখ্যার মুখ্যকথা হইতে পারে কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রিয়াত্মক পারস্পরিকতা (interfunctionalism) অনুসারে এই কার্যকারণ সম্পর্ক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কোনও প্রকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহিত কোনও বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের অন্তর্নিহিত ও অচ্ছেদ্য যোগ নাই।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## মর্গান-মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা

### রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী মত সম্পূর্ণরূপে মর্গানের মতকে ভিা করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মর্গানের সমাজ-বিবর্তনের ছকটি কয়েকটি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় স্তরের সমষ্টি। মধ্যবর্ষের যুগের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক জাতির সমাজ-ভিত্তি যৌথবিবাহ এবং যৌথসম্পত্তি (Communist Property)। যৌথবিবাহের 'পুনালুয়া'স্তরে গোষ্ঠীপ্রথার উদ্ভব হয় পৃথিবীতে সর্বত্র এই গোষ্ঠী ছিল মাতৃতান্ত্রিক, কারণ মাতাই কেবল নিশ্চিত এবং যৌথবিবাহের পিতা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 'মাতৃতন্ত্রী গোষ্ঠী এ যুগে একমাত্র সমাজ প্রতিষ্ঠান। এই গোষ্ঠী প্রথাই মানুষের জীবনে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিত। রক্তসম্পর্কের সর্বগ্রাসী প্রভাবের দ্বারা ব্যক্তি সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক, যৌনজীবন, আর্থিক পদ্ধতি, প্রভৃতি সমস্ত কি পরিচালিত হইত। গোষ্ঠীসমাজই পৃথিবীতে মানব সমাজের প্রথম প্রকৃত সমাজ-সংহতি।

কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রথার উদ্ভব হইল মধ্যবর্ষের যুগে। পশুপালন জনিত ধনদৌলতের বৃদ্ধিই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সৃষ্টি করিল। ইতিপূর্বে যুগ্মবিবাহ আসিয়াছে। সন্তান সম্বন্ধে পিতার বিশেষ সম্পর্কবোধ খানিকটা সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যক্তিসম্পত্তির উদ্ভব হওয়ায় সন্তান সম্বন্ধে পিতার দায়িত্ববোধ বাড়িল এবং সন্তানকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবার জন্ত একবিবাহপ্রথা সৃষ্টি হইল। এই ব্যক্তিসম্পত্তি আসিয়া গোষ্ঠীপ্রথাকে ভাঙিয়া দিল। সমাজে ধনী-দরিদ্র সৃষ্টি হইল, পণ্যবিনিময় এ

মুদ্রা ( Money ) আসিল। গোষ্ঠী-সমাজের ভিত্তি সাম্য। সম্পত্তি ছিল সকল গোষ্ঠী-সভ্যের। এই সাম্যতান্ত্রিক সম্পত্তি প্রথায় উচ্চনীচের স্থান ছিল না। নূতন ব্যক্তি-সম্পত্তি প্রথা এবং পুরাতন গোষ্ঠী-সম্পত্তিপ্রথা, এই দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ। পণ্য বিনিময় ও বাণিজ্যের উদ্ভব হওয়ায় ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরাজ সান্নিধ্যে আসিতে লাগিল এবং একত্র বাস করিতে লাগিল। ইহাদের বিভিন্ন সম্পত্তি-অধিকার রক্ষা করিবার জন্ত একই ভৌগোলিক ক্ষেত্রের অধিবাসীদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। কিন্তু যে শ্রেণী ধনী ও শক্তিশালী তাহারাই রাষ্ট্রচালক হইয়া ধনীর স্বার্থরক্ষা ও দরিদ্রের শোষণ করিতে লাগিল। শ্রেণী সংগ্রাম হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি।

মর্গান-মার্ক্সবাদী এই রাষ্ট্রতত্ত্বের মৌলিক কয়েকটা তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নূতন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে মর্গান-মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব একপেশে।

প্রথমতঃ, মর্গানী ছকের একরৈখিক বিবর্তন, সমাজতত্ত্ব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় রাষ্ট্রসম্বন্ধে ইহাদের একরৈখিক বিকাশের মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজের বিকাশ বাঁধাধরা ছকের স্তরকে অনুসরণ করিয়া হয় নাই, ইহা পূর্ব অধ্যায়েই আলোচিত হইয়াছে। সেই দৃষ্টিতে বিচার করিয়া বলা চলে যে পৃথিবীতে গোষ্ঠীপ্রথা একটা সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান এবং সার্বিক স্তর, তাহা নূতন স্বীকার করে না। লাউয়ী, ম্যালিনওয়ার্কী, গোল্ডেন-ভাইজার, ওয়েষ্টারমার্ক প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিকেরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে গোষ্ঠী-প্রথা সার্বিক নয়। পরিবারই সার্বজনীন। পৃথিবীতে বর্তমান অসভ্যজাতির সামাজিক প্রথা সন্ধান করিলে প্রমাণ হয় পরিবার কোন না কোন আকারে সব জাতিতেই আছে কিন্তু পৃথিবীতে গোষ্ঠী-প্রথা-বিহীন জাতি বহু রহিয়াছে। এই সব গোষ্ঠীবিহীন জাতি চিরকালই এই অবস্থায় আছে। পূর্বে কোনও কালে ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠীর সৃষ্টিই

হয় নাই। পৃথিবীতে সব জাতি গোষ্ঠী-প্রথার মধ্য দিয়া আসে নাই। এ-সম্বন্ধে সোয়ানটনের (Swanton) গবেষণায় ইহা প্রমাণ হইয়াছে। এঙ্কিমো, এথাব্রাস্কান, সলীশ প্রভৃতি বহুজাতি অতি আদিম হওয়া সত্ত্বেও গোষ্ঠী-বিহীন। লাউয়ী, গোল্ডেন্-ভাইজার এই তত্ত্বই আরো সুপ্রমাণ করিয়াছেন। মর্গান-এঙ্গেলসের কালে কেবল অষ্ট্রেলিয়ার দিকেই ইহাদের চক্ষু নিবদ্ধ ছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় গোষ্ঠী আছে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তথ্য তখন অজ্ঞাত ছিল। কাজেই তখন গোষ্ঠীপ্রথার সার্বজনীনতা সম্বন্ধে মর্গানের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল।

কাজেই গোষ্ঠী যদি সার্বজনীন না হয়, তবে রাষ্ট্রও গোষ্ঠী হইতে সার্বিকভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, একথাও সত্য নয়। প্রাচীন সভ্যজাতিগুলি (গ্রীক, রোম, আর্ষ প্রভৃতি) লাউয়ীর মতে পূর্বে গোষ্ঠীহীন ছিল। পরে সাময়িক কিছু কালের জন্য গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়া বিলোপ হইয়া গিয়াছে। গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে, এই মত ভিত্তিহীন।

পূর্বে সর্বত্রই গোষ্ঠী-সম্পত্তি-প্রথা ছিল এবং ব্যক্তি-সম্পত্তি পরবর্তী পশুপালনযুগে উদ্ভূত হইয়াছে, এই মতও আজিকার নৃতত্ত্ব স্বীকার করিবে না। একদল যেমন আদিম সম্পত্তির মালিকানা প্রথা সম্বন্ধে চরম মত দেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই একমাত্র প্রথা ছিল (Buecher), তেমনি মর্গানীদের মতে অসম্ভব হইল সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট। এই দুই চরম মতই একপেশে—তাহা লাউয়ী প্রমুখ নৃতত্ত্বিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন। ম্যালিনাউস্কীও বলেন, সম্পত্তি-প্রথা আদিমদেরও মিশ্র; ব্যক্তিসম্পত্তি ও সমষ্টিসম্পত্তি দুই প্রথাই প্রচলিত পাওয়া যায় সর্বত্র।\*

\* "As a matter of fact property which is but one form of legal relationship, is neither purely individualistic nor communal, but always mixed. (B. Malinowski—III, Crime & Custom, )

মর্গানী মতে ব্যক্তি-সম্পত্তি কেবল পশুপালন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এই কথাও ভুল। শিকারজীবী অসভ্যদের মধ্যেও নৃতত্ত্ব ব্যক্তিসম্পত্তির অস্তিত্ব পাইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ার মাইছ এবং টমসন ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে 'স্বাধ-সম্পত্তি' ও ব্যক্তি-সম্পত্তি দুইই রহিয়াছে। ওয়েষ্টারমার্ক এ-সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্তসহ প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আদিমদের মধ্যেও আছে। এঙ্গেলস্ বলেন, পণ্যবিনিময় এবং বাণিজ্য উদ্ভব হওয়াতেই মানুষ জমিতে ব্যক্তিগত চাষ আরম্ভ করে এবং তখন হইতেই জমি ব্যক্তিসম্পত্তি হয়।\* এই মত আধুনিক নৃতত্ত্বের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত।

এঙ্গেলস্ বলেন যে গোষ্ঠীসমাজের ভিত্তি সাম্য, এই সমাজে "মুদ্রা" বা Money উদ্ভব হইতেই পারে না। কারণ এই দুই-ই পরস্পর-বিরোধী।<sup>¶</sup> আধুনিক যুগে ডাঃ রিভাসও (Rivers) এই মর্গানী মতকে প্রমাণ করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মেলানেশীয়রা পূর্বে কমুনিজম ছিল এবং পরে বহির্জগতের সংস্পর্শ হইতে মুদ্রা বা money আমদানী হইয়াছে।<sup>†</sup> রিভাসের এই মত ম্যালিনাউস্কী প্রভৃতির অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রিভাস মেলানেশীয়রা মাছ, শূকরের চোয়াল, ঝিনুকের চাক্তী প্রভৃতিকে "Money"

\* "With the coming of commodity production, individuals began to cultivate the soil on their own account which soon led to individual ownership of land." (Engels, p 138)

¶ "The gentile constitution is absolutely irreconcilable with money economy." (Engels, p. 136)

† "A thoroughly communistic people can have no use for money among themselves." (History of Melanesian Society, II, p. 385)

আখ্যা দিয়াছেন, কারণ ইহাদের একটা নির্দিষ্ট মূল্যক্রম (Scale of Value) আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট মূল্যক্রমের হিসাব থাকিলেই কি Money হয়? আমাদের সভ্যজীবনের ব্যবহার্য সব জিনিষেরই মূল্যক্রম আছে। তাই বলিয়া কি ইহারা আমাদের কাছে Moneyতে পরিণত হয়? ম্যালিনাউস্কী বলেন, Money না-থাকিলেও কমুনিজ্‌ম থাকিবে এমন নয়। থাকিলেও কমুনিজ্‌ম থাকিবে না, তাহাও নয়। মধ্য অষ্ট্রেলিয়ানী, ফুয়েজিয়ানী ও পূর্ব-নিউগিনীর (Eastern New Guinea) মেলানেশীয়গণ ব্যক্তিগত-সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রথর চেতনাশীল অথচ তাহাদের মধ্যে কোন Money বা বিনিময় মুদ্রা নাই।\*

বর্তমান রুশদেশে ব্যক্তি-সম্পত্তির উচ্ছেদ হইলেও “মুদ্রা” বাঁচিয়া আছে, লুপ্ত হয় নাই। আবার ব্যক্তি-সম্পত্তিশীল সমাজেও মুদ্রা ছাড়া বিত্তপূর্ণ পণ্য বিনিময় চলিতে পারে। অসভ্যসমাজে Money না থাকিলে-কমুনিজ্‌ম প্রমাণ হইয়া যাইবে ইহা ভুল। আসল কথা ব্যক্তিসম্পত্তি সম্বন্ধে অসভ্য সমাজে ‘Money’র প্রয়োজন পড়ে না, তাই মুদ্রার প্রচলন হয় না।

এঙ্গেল্‌স্‌ বলেন, অসভ্যসমাজে পণ্য এত সামান্য উৎপাদন করা হয় যে সেখানে শ্রেণী বা শ্রেণী সংগ্রাম থাকিতেই পারে না। এ-মতও ভিত্তিহীন। স্বল্প পরিমাণ সম্পত্তিকে কেন্দ্র করিয়াও বৈষম্য, বিভেদ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

\* “The fact is that neither in primitive nor in advanced cultures is there any co-relation between communism and absence of money. ( B. Malinwaski III )

মানুষের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি আদিকালেও ছিল। এঙ্গেলস বলেন এই বৃত্তি আগে ছিল না, পরে আসিয়াছে। এঙ্গেলস, রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে এই অতি নীচ লোভবৃত্তিই কাজ করিয়াছে বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। গোষ্ঠীসমাজে কোন লোভ, ঘেঁষ, স্বার্থ, সংঘর্ষ ইত্যাদি ছিলনা এবং পুলিশ, চুরি, জুলুম ইত্যাদি হইতে মুক্ত একটা স্বর্গরাজ্য বলিয়া এঙ্গেলস ইহাকে কল্পনা করিয়াছেন। এই স্বর্গীয় সমাজে একদা মানুষের মনে বিষ ঢুকিল এবং স্বার্থবোধ সৃষ্টি হইল। ‘আমার সম্পত্তি’ বলিয়া অহং-বোধ জাগিয়া সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার উদ্ভম আকাঙ্ক্ষা জাগিল। সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্ত ও বঞ্চিত গোষ্ঠীসমাজের লোকদের দাবাইয়া রাখিবার জন্ত ‘রাষ্ট্র’কে বানাইল স্বার্থপর মানুষ। বর্বর মানুষ সভ্য হইয়াছে এই স্বার্থপরতার সাহায্যে। বর্বর-জীবনের আনন্দময় গোষ্ঠী-জীবনকে ধ্বংস করিয়াছে এই নীচ ঘৃণ্য স্বার্থবৃত্তি। \*

এঙ্গেলসের এই মত ভ্রান্ত। স্বার্থবুদ্ধি মানুষের জীবনে পরে উদ্ভব হইয়াছে, পূর্বে ছিলনা—এই মত বিজ্ঞানবিরোধী। মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব উভয় বিজ্ঞানই বলে আদি মানুষের মধ্যেও স্বার্থবৃত্তি ছিল। শুধু আর্থিক স্বার্থই নয়, জীবনের অন্যান্য ব্যাপারেও স্বার্থবুদ্ধি ছিল। এঙ্গেলস ও মার্ক্সীয়গণ কেবল আর্থিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য স্বার্থও ক্রিয়াশীল ছিল। এই আর্থিক স্বার্থ অসভ্য মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করিত না একথা ভুল। পশুপালন স্তরে ধনবুদ্ধি হওয়ার পরেই কেবল স্বার্থবুদ্ধি মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ আনিয়াছে তাহা নয়। পূর্বেও করিয়াছে, পূর্বেও সংঘর্ষ ছিল। বৈষম্য ছিল, সংঘর্ষও ছিল।

---

\* “It is the by vilest means—theft, violence, fraud, treason—that the old classless gentile society is undermined and overthrown.” (Engels, p 120.)

কেবল আর্থিক নয়, অথ নানা প্রকারের স্বার্থ ও অহংবোধ হইতে নানাপ্রকার সংঘর্ষ মানুষ-জীবনে বরাবরই আছে। কাজেই অসভ্যজীবনে সম্পত্তির বাহুল্য ছিল না বলিয়া স্বার্থবুদ্ধিও ছিল না, একথা অযৌক্তিক। কাজেই সমাজ বিকাশের একটি বিশেষ স্তরেই—অর্থাৎ পশুপালনজনিত ধনবৃদ্ধির যুগে এবং সভ্যতার স্তরে—কেবল রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে ইহা ঠিক নয়। মানুষ যদি স্বার্থরক্ষার তাকিদেই রাষ্ট্রসৃষ্টি করিয়া থাকে তবে অসভ্য জীবনের আদিস্তরে রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকা সম্ভব, কারণ আদি স্তরেও স্বার্থবোধ মানুষের ছিল। গোষ্ঠীসমাজের স্বর্ণযুগ মর্গান-মাক্সবাদী সম্প্রদায়ের কল্পিত একটা মানস সৃষ্টি মাত্র।

ব্যক্তি-সম্পত্তি হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি, এই মত যে একদেশদর্শী তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আদিস্তরে কেবল গোষ্ঠীসম্পত্তি বা সামাজিক সম্পত্তিই বিদ্যমান ছিল, এ কথা কোন নৃতত্ত্ববিদ বলিবেন না। পরিবার-প্রথা যেখানে বিদ্যমান সেখানে ব্যক্তিসম্পত্তিও বিদ্যমান থাকিবে। পৃথিবীতে পরিবারই আদিমতম প্রথা এবং গোষ্ঠীপ্রথারও পূর্বে বিদ্যমান ছিল তাহা লাউয়ী প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্বভাবতই প্রমাণ হয় যে ব্যক্তি-সম্পত্তিপ্রথাও চিরকাল বিদ্যমান আছে। বর্তমান পৃথিবীর অসভ্য সমাজেও ব্যক্তিসম্পত্তি ও সমাজসম্পত্তি এই দুই প্রথাই পাওয়া যায়। আদিকালেও যে ব্যক্তিসম্পত্তি প্রচলিত ছিল তাহা লাউয়ী, ম্যালিনাউস্কী প্রভৃতি প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি রিভাসও (Rivers)—যিনি মর্গানী মতের অনেকখানি মানেন—বলিয়াছেন যে সম্পত্তি-সমস্যা অত সহজ নয়। বাঁধাবাঁধিভাবে গোষ্ঠীসম্পত্তিকে লুপ্ত করিয়া সর্বত্র ব্যক্তি-সম্পত্তি আসিয়াছে, একথা এঙ্গেলসের যুগে বলা গেলেও অতীত যুগে বলা চলে না। \*

\* “We shall find that the matter is far from simple...”



যেখানে যেখানে গোষ্ঠীসমাজ রহিয়াছে সেখানে সেখানেই পরিবারও রহিয়াছে। কাজেই সম্পত্তি ব্যাপারেও তাই কোন সহজ স্তর বার করা চলে না। তাই গোষ্ঠীসম্পত্তির মধ্যেই আবার প্রায়ই লুকাইয়া থাকে ব্যক্তিসম্পত্তি। কাজেই দেখা যাইতেছে যে মর্গান-মাক্সবাদী রাষ্ট্রের উৎপত্তি-তত্ত্ব টিকে না। ব্যক্তিসম্পত্তি যদি চিরকাল থাকিয়া থাকে তবে রাষ্ট্রও চিরকাল আছে, এইরূপই দাঁড়ায়। তবে আসলে রাষ্ট্রের এই আর্থিক ব্যাখ্যাই ভ্রান্ত। সম্পত্তি হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে এই গোড়ার কথাই ভুল।

এই সূত্রে মাক্সীয় মতের আরেক দিকও ভ্রান্ত প্রমাণ হইতেছে। মাতৃক্রমিক গোষ্ঠীই এই মতে পূর্বতম। আর ব্যক্তি-সম্পত্তির আবির্ভাব হওয়ায়ই পিতৃক্রমিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছে, ইহারা বলেন। আধুনিক নৃতত্ত্ব এই পৌর্বাপর্য বা বিবর্তন-ক্রম স্বীকার করে না। বাধাধরা ছকই আজ অগ্রাহ। তাই রিভাসও স্বীকার করেন যে “মানবজাতির বর্তমান প্রথাগুলি কোনটিই বিবর্তনের একটা সরল রৈখিক গতির পরিণতি নয়”। \* কাজেই মাতৃক্রমকে বিনষ্ট করিয়া ব্যক্তি-সম্পত্তি কোন এক যুগে পিতৃক্রম আনিয়াছে এই মত আজ পরিত্যক্ত। রিভাসও বলেন, “যারা তুলনা-মূলক গবেষণা করিয়াছেন তারা আজকাল এই সিদ্ধান্তেই আসিয়া পৌঁছিতেছেন যে আদিম স্তরে মাতৃসত্ত্ব বা পিতৃসত্ত্ব কোন একটিই আদিতর ছিল তাহা বলা চলে না। †”

\* “The existing institutions of mankind are not the result of a simple process of evolution.” (Rivers. p. 97.)

† “The conclusion to which those students, whose ideas are based on a wide comparative study, are now coming is that we cannot regard the early state of human society as one in which it is possible to speak either of father-right or, of mother-right.” (Rivers, p 98.)

মাতৃসত্ত্ব বা মাতৃক্রমিক সম্পত্তিপ্রথা যদি পূর্বতন না হয় তবে মর্গানী-ক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাষ্ট্রের বিবর্তন-তত্ত্বও ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই মতে ব্যক্তি-সম্পত্তির সঙ্গে আসিল পিতৃক্রম বা পুরুষপ্রাধান্য এবং তারই ফল হইল রাষ্ট্র সৃষ্টি। রাষ্ট্র সৃষ্টি হইল ব্যক্তি-সম্পত্তি রক্ষার জন্ত। যদি গোষ্ঠীসমাজ, গোষ্ঠীসম্পত্তি, মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রম বা ব্যক্তি-সম্পত্তি উদ্ভব না হইয়া থাকে এবং যদি পূর্বাপর ব্যক্তি-সম্পত্তি বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মর্গান-মার্ক্সবাদী মতও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

ব্যক্তি-সম্পত্তি শ্রেণী সৃষ্টি করিল, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে নানা দেশের নানা গোষ্ঠীর লোককে একই স্থানে একত্রিত করিল। এই সব বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত লাগিয়াই থাকিত। এই সংঘর্ষকে কমান্বিয়া দাবান্বিয়া রাখিবার জন্তই ‘রাষ্ট্র’ নামক একটা বাহিরের শক্তি সৃষ্টি করা হইল। সাম্যবাদী সংঘর্ষহীন গোষ্ঠীসমাজের মধ্যে সম্পত্তি আসিয়াই এই সংঘর্ষ সৃষ্টি করিল। এই হইল এঙ্গেলসের ব্যাখ্যা। †

কেবল নূতন দৌলত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য হইতেই ‘রাষ্ট্র’ নামক অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হইল এই মত একপেশে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মর্গানী বিবর্তন-চক্র ভাঙ্গিয়া পড়িলে, মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্বও ভাঙিয়া পরে। পিতৃক্রম আসিল বলিয়াই সম্ভ্রান্তকে সম্পত্তি-দানের আকাঙ্ক্ষায় সঞ্চয়-বৃত্তি আসিল এবং সঞ্চিত অর্থের ফলে ধনবৈষম্য দেখা দিল। বৈষম্যের

† “But in order that these antagonisms, classes with conflicting economic interests shall not consume themselves and society in fruitless struggle, a power, apparently standing above society, has become necessary to moderate the conflict and keep it within bounds of ‘order,’ and this power.....is the state.” (Engels, p.216 & 132.)

ফল হইল এই যে ধনীরাই শক্তিশালী হইয়া উঠিলে পরে পুরুষানুক্রমিক রাজতন্ত্র দেখা দিল। এইভাবে পরিবারপ্রথা হইতেই গোষ্ঠীসমাজের ধ্বংস আসিল। গোষ্ঠীসমাজের সামাজিক ও সার্বজনীন প্রথা ধ্বংস হইয়া গেল। ব্যক্তি-সম্পত্তি ও ধনিকপ্রভুত্বকে রক্ষা করিবার জন্তই রাষ্ট্রকে আবিষ্কার করা হইল।

রাষ্ট্রের এই ব্যাখ্যা আজ অচল। মাতৃক্রম-পিতৃক্রম, গোষ্ঠীসম্পত্তি ও ব্যক্তিসম্পত্তি, গোষ্ঠী ও পরিবার, এইভাবে সমাজের বিবর্তনই হয় নাই। রাজতন্ত্রের উদ্ভবের এই ব্যাখ্যাও অবাস্তব ও একপেশে। মাতৃক্রম হইতে যদি পিতৃক্রম না উদ্ভূত হইয়া থাকে, গোষ্ঠীসম্পত্তি হইতে যদি ব্যক্তিসম্পত্তি না আসিয়া থাকে, গোষ্ঠী হইতে যদি পরিবারের উদ্ভব না হইয়া থাকে—তবে এই রীতিতে রাষ্ট্রও সৃষ্টি হয় নাই। তাছাড়া সংঘর্ষ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য হেতুই হয় না। আদিকালে উপজাতীয় সংঘর্ষ ছিল, ইহা সর্বস্বীকৃত। তাছাড়া, ভূমি বা দেশ লইয়াও সংঘর্ষ ছিল। ইহা ছাড়া, পরিবারের সঙ্গে পরিবারের ও ব্যক্তির সহিত ব্যক্তিরও সংঘাত ছিল। এ-অবস্থায় এই সব রকমের সংঘর্ষকে দাবাইয়া রাখিয়া শান্তিরক্ষার জন্তও-তো 'রাষ্ট্র' সৃষ্টি হইতে পারিত। কেবল একই পথে একই রীতিতে বাণিজ্য-জনিত শ্রেণী-সংঘর্ষকে শান্ত করিবার জন্ত এবং সম্পত্তির দাবিদারদের দাবাইয়া রাখিবার জন্তই রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়াছে একথার পিছনে যুক্তি নাই।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র কেবল অর্থনীতি হইতেই জন্ম নেই নাই। অপরাপর বহু কারণ হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে। বহুবিধ শক্তি ও কারণের সমবায়ে ও প্রভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি। এই সব কারণ কেবল কোন একটিমাত্র যুগেই দেখা দিয়াছিল তাহা নয়। মানব-জীবনে বহুবিধ শক্তি ও প্রয়োজনের তাকিদ চিরদিনই ছিল। মানুষ যতদিন আছে, পৃথিবীতে

রাষ্ট্রও কোনো-না-কোনো আকারে ততদিনই আছে। মানুষের ভিতরে দেহের ও মনের নানা দিক, নানা রুচি, নানা শক্তি ও প্রয়োজন চিরকালই রহিয়াছে। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত বিকাশ ঘটয়াছে কিন্তু মৌলিক বৃত্তিগুলি মানুষের ঠিকই রহিয়াছে। তাই অসভ্য ও সভ্য মানুষের গভীরতম অন্তরে একই সত্তা এবং একই প্রবণতা রাজত্ব করিতেছে। কাজেই প্রয়োজন এবং প্রয়োজনানুরূপ প্রতিষ্ঠান ও প্রথা চিরদিনই মানুষের একই রকম রহিয়াছে। বিবাহ, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিল্প, কলা—এসবই স্থূল আকারে আদিম মানুষে রহিয়াছে, তেমনি পরিণত আকারে সভ্য মানুষেও রহিয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রও আদিম প্রতিষ্ঠান। কারণ রাষ্ট্রও মানুষের মৌলিক কতকগুলি বৃত্তির প্রকাশ এবং কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজনের সৃষ্টি। কোন একটা মাত্র প্রয়োজন বা বৃত্তি নয় বহু বৃত্তি ও প্রয়োজন রাষ্ট্রের সৃষ্টির মূলে। রাষ্ট্রের এই বহুবাদী ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানসম্মত।

ভূগোলবাদীরা রাষ্ট্রকে ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রকাশ ও সৃষ্টি বলেন। ভূগোলের প্রভাব স্বীকার্য। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনে ইহাই সব নয়। তাই ব্লুন্টশলীর (Bluntschli) ভাষায় বলা যায়, “প্রাকৃতিক শক্তির গুরুত্বকে আভিশ্য দেওয়া ঠিক নয়। আসলে মানুষের পরম্পরের নৈতিক ও বুদ্ধিগত সহায়তা ও শিক্ষার উপরে রাষ্ট্র যতখানি নির্ভর করে প্রাকৃতিক শক্তির উপরে ততখানি করে না।……মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির সৃষ্টি নয়……। †

† “But must not exaggerate the importance of natural phenomena. After all, less depends on them than on the moral and intellectual education of man by man…… Man is not the creature of natural forces” …(The Theory of State—Bluntschli p. 231)

তেমনি সামাজিক চুক্তিবাদীরাও ( Social Contract ) আর এক দিকে আতিশয্য করিয়াছে। এই মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত পারস্পরিক চুক্তির ফলে। তিনজন পণ্ডিত এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন,—হব্‌স্ ( Hobbes ) লক্ ( Locke ) এবং রুশো ( Rousseau )। এই তিনের মতবাদে পার্থক্য রহিয়াছে। তিনেরই মতে, আদিকালে রাষ্ট্র ছিল না। মানুষ এক ‘প্রাকৃতিক অবস্থায় ( State of Nature )’ বাস করিত। শাসন ছিল না, সমাজ ছিল না, নীতি ছিল না। পরে একদা সবাই মিলিয়া এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া চুক্তি অনুসারে ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করিয়া এক রাষ্ট্র স্থাপন করে এবং রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। একেই ‘সামাজিক চুক্তিবাদ’ বলা হয়। ইতিহাসের কোন এক ক্ষণে মানুষ সচেতনভাবে ও স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র স্থাপন করিল, ইহাই এই মতের মূল কথা। হব্‌স্‌এর মতে আদিম প্রাকৃতিক স্তর হইল একটা সংঘর্ষময় বিশৃঙ্খল অবস্থা। মানুষ রাষ্ট্রশক্তির কাছে তার ব্যক্তি-অধিকারকে ছাড়িয়া দিয়া তবে সামাজিক জীবন গঠন করিল, রাষ্ট্র কায়েম করিল। রুশোর মতে, প্রাকৃতিক স্তরই মানুষের সাম্য ও শান্তির স্বর্ণযুগ। সার্বিক এষণার ( General Will ) প্রকাশ হয় রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া। আসলে যে রাষ্ট্রের কাছে মানুষ আনুগত্য দেয়, অধিকারকে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইল স্বয়ং জনসাধারণ। এই প্রাকৃতিক যুগে সম্পত্তি ছিল না, মর্যাদার তারতম্য ছিল না, অগ্নায় ছিল না। পরে মানুষের অবনতি হওয়ার জন্মই রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইল।

এই কল্পিত স্বর্ণযুগের সহিত মাক্সবাদী গোষ্ঠীসমাজের একদিক দিয়া সাদৃশ্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রহীন এবং সংঘর্ষহীন এই অবস্থা মাক্স-মর্গানী মতবাদও কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু কল্পিত রাষ্ট্রহীন স্বর্ণযুগ একান্ত

অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে রাষ্ট্রের প্রয়োজন, শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাই রাষ্ট্রহীন অবস্থা কাল্পনিক কোন-না-কোন আকারে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন রূপায়ন চিরদিনই সমাধে আছে। (এরিষ্টটল (Aristotle) বহুপূর্বে বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ 'রাষ্ট্রনৈতিক জীব'। রাষ্ট্র ব্যতীত মানুষের চলে না।। যেখানে মানুষ থাকিবে সেখানেই সে রাষ্ট্র পত্তন করিবে। তাই ব্লুন্টশ্লেই বলেন "সামাজিক চুক্তিবাদ মানুষের রাষ্ট্রনীতিপ্রবণ স্বভাবের কথাই ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছে। আর মানুষ যে 'রাষ্ট্রনৈতিক জীব' এরিষ্টটলের এই সত্যকে উপেক্ষা করিয়াছে।" এই চুক্তিবাদে—এবং মার্ক্সবাদেও—রাষ্ট্র একটা অবাঞ্ছিত অপপদার্থ, একটা necessary evil বলিয়া ধরা হইয়াছে কিন্তু রাষ্ট্র নীচ ও মিথ্যা একটা বৃত্তি হইতে জাত হইয়া মানুষের হাজার হাজার বছর ধরিয়া বিভ্রান্ত ও অধঃপতিত করিতেছে, একথা বলিলে ইতিহাসকে বিকৃত করা হইবে। রাষ্ট্র মানবজীবনের অমোক্ষ প্রয়োজন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে; আধুনিক সমাজতত্ত্ব তাই রাষ্ট্রকে এই দৃষ্টিতে দেখে না। মার্ক্সবাদেরও ক্রটি এইখানে। রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র অর্থলোভ ও নীচপ্রবৃত্তির সৃষ্টি বলিয়া নির্ধারণ করার মূলে রহিয়াছে মার্ক্সবাদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।

সামাজিক চুক্তিবাদ, বিজ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহাই বাস্তব সত্যের বিরোধী বলিয়া। তবে এই মতবাদেও কিছু সত্য রহিয়াছে ভূগোলবাদী যেমন ভূগোলকে সর্বমূল বলিয়াছে, চুক্তিবাদী মানুষের ইচ্ছা, শক্তি, স্বাভাবিক ও বুদ্ধির উপরে জোর দিয়াছে। মানবিক দিকটা উপরে গুরুত্বদান করিয়া ইহা একটা সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রকৃতিই সব নয়, ভূগোলই সব নয়, মানুষেরও কৃতিত্ব আছে।

রাষ্ট্রগঠনে।† এইটুকু সত্য চুক্তিবাদে আছে কিন্তু মতবাদ হিসাবে এইহা আজ অচল।

রাষ্ট্রের অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যাও ( Idealistic Interpretation of State ) অসম্পূর্ণ। হেগেল রাষ্ট্রকে অধ্যাত্ম ও নৈতিক শক্তির বিগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং রাষ্ট্র-শক্তির বিপুল সর্বগ্রাসী মাহাত্ম্যের মধ্যে ব্যক্তিকে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাও একপেশে। রাষ্ট্রই অধ্যাত্মশক্তির একমাত্র এবং অদ্বিতীয় আধার—এখানে যুক্তিতে ত্রুটি রহিয়াছে। রাষ্ট্রকেই বাছিয়া লইয়া এই গৌরব দান করিবার কোন কারণ নাই। রাষ্ট্র সমাজ-জীবনের একটা দিক মাত্র এবং বহুমুখী সমাজ জীবনের এক অঙ্গ। ঐহিক জগতে জড়শক্তি ও তাহার বহু ব্যাঞ্জনাতে হেগেল এড়াইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার মতবাদ একপেশে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তির রাষ্ট্রিক অধিকার এ-মতে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে এবং প্রশিয়ার রাজতন্ত্রই সমাজের চরম পরিণতি বলিয়া ধার্য হইয়াছে।

রাষ্ট্রের দৈবিক ব্যাখ্যা ( Divine Theory ) অনুসারে রাষ্ট্র ইইল দেবতার সৃষ্টি এবং দৈব অংশ। মধ্যযুগে বিশেষ করিয়া এই মতবাদ প্রচারিত হয়। খৃষ্টধর্মের প্রভাব এই মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ঈশ্বরের আদেশ পালন এবং তাঁহার ইচ্ছাকে রূপ দিবার জন্মই রাষ্ট্র। মুসলীম ও খৃষ্টধর্মের রাষ্ট্রতত্ত্বই এই। ভারতবর্ষেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যার উপর স্থাপিত।

---

† “Nevertheless it contains an element of truth. In opposition to the theory which sees in the state a mere product of nature, it accentuates the truth that the human will can determine and influence the formation of the state.....” ( Bluntschli p. 197 ).

ঐহিক জগতের বিবর্তন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দৈবী শক্তির আমদানী করিয়া এই সম্প্রদায় ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্বকে এড়াইয়াছেন।

রাষ্ট্রের বংশবাদী (Racialist) ব্যাখ্যাও তেমনি একপেশে। গোবিনু (Gobineau), চেম্বারলেন, আমন (Ammon), বার্জেস (Burgess) প্রমুখ বংশবাদী পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি বংশ বা রক্তদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের রূপও নিয়ন্ত্রিত হয় রক্তের প্রভাব দ্বারা। এই ব্যাখ্যাকে জনন-বিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব একযোগে বর্জন করিয়াছে।

রাষ্ট্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন ম্যাকডুগাল, ট্রটার \* (Trotter), ফ্রয়েড প্রভৃতি। ইহারা সবাই কতকগুলি সহজাত মনোবৃত্তি (Instinct) এবং চিত্তাবেগ (Impulse) হইতে রাষ্ট্র—এবং অন্যান্য সমাজপ্রথা—উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বলেন। ট্রটার যুথবৃত্তিকে, ম্যাকডুগাল এগারটী বৃত্তিকে এবং ফ্রয়েড যৌনবৃত্তিকে সমষ্টিজীবনের উৎস বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই মত জীবনের একদিকের উপরে অত্যধিক জোর দিয়া একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রধানতঃ মার্ক্সবাদেরই মূল তত্ত্ব। রাষ্ট্র-গঠনে যে অর্থনীতির প্রভাব রহিয়াছে তাহা লোরিয়া (Loria), ওপেনহাইমার (Oppenheimer), গুমপ্লাবিজ্ (Gumpowicz), দুর্খীম (Durkheim) প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিকেরা বিশেষভাবে স্বীকার ও বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু মার্ক্সবাদ যে-ভাবে রাষ্ট্রের বিবর্তনকে ছক কাটিয়া অনড় স্তরপর্যায়ের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে তেমনভাবে আর কেহ করেন নাই। এই মতবাদে রাষ্ট্র হইল অর্থনীতির ছায়া মাত্র। অর্থনীতি, এই মতে, সমাজের সর্বশক্তিমান সার্বভৌম প্রভু। অথচ, অর্থনীতি হইল

\* Instincts of Herd in peace and war.



সমাজ-জীবনের অগ্ৰাণ্ণ দিকের মধ্যে একটা দিকমাত্র। যাহারা রাষ্ট্রকেও সমাজে সার্বভৌম অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বলিয়া পূজা করিতে চাহেন তাহারা যেমন আতিশয্য-দুষ্ট, তেমনি যাহারা অর্থশক্তিকেও সার্বভৌম রাষ্ট্র বা রাজার আসনে বসাইতে চাহেন তাহারাও একদেশদর্শী। কোল (Cole) সাহেব তাই বলেন যে, এই মার্ক্সবাদ অগ্রহণীয়। “মার্ক্সীয় অর্থবাদও রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্ববাদেরই আরেক পিঠ মাত্র। সার্বভৌম রাষ্ট্রবাদ যেমন অগ্রাহ্য হইয়াছে, ইহাও তেমনি অগ্রাহ্য।” ৭৭ রাষ্ট্রের উপরে অর্থনীতির প্রভাব আছে এবং চিরকালই এ প্রভাব থাকিবে। কিন্তু এ প্রভাব সর্বগ্রাসী এবং সার্বিক নয়। মার্ক্সবাদ এখানেই ভুল করিয়াছে। গোটা সমাজ-জীবনকেই অর্থনীতি বলিয়া মার্ক্সবাদ মনে করিয়াছে। অংশকে পূর্ণ বলিয়া ভুল করিয়াছে। অবশ্য এই ভুলেরও কারণ রহিয়াছে। বর্তমান সমাজে রাষ্ট্রের উপরে পূঁজিবাদীদের অতিরিক্ত প্রাধান্ণ দেখিয়াই এই সম্প্রদায় রাষ্ট্রকে পূঁজিবাদের সৃষ্টি বলিয়া মনে করিয়াছে। আর্থিক শ্রেণী বা অর্থনীতির এই অতিরিক্ত প্রভাব একটা সাময়িক বিকৃতি বই আর কিছু নয়। অর্থনীতির সহিত রাষ্ট্রনীতি ও অগ্ৰাণ্ণ সামাজিক ব্যাপারের সম্পর্ক বিকৃত হইয়া এই আতিশয্য ঘটিয়াছে। স্বস্ত স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে এই বিকৃতি থাকিবে না। এ-সম্বন্ধে কোলও অর্থনীতির এই বিকৃত প্রাধান্ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।\*

৭৭ “In fact we are here faced by a theory which is the complete inversion of the theory of state sovereignty which we have already rejected. Having pulled down the state from its pedestal, we are asked to install the economic structure of society in its place.” (Social Theory, p 145 )

\* “We have, however, always treated the influence of economic factors upon non-economic forms of asso-

আর্থিক ব্যাখ্যার আর এক ক্রটি হইল এই যে, ইহা কেবল সংঘর্ষের উপরই সম্পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। লোরিয়া, ওপেনহাইমার, গুমপ্লাবিজ ও শ্রেণী-সংঘর্ষকে সামঞ্জস্য করিয়া সমাজকে রক্ষা করিবার জগুই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু সংঘর্ষের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তির সাহায্য হইয়াছে একথা ঠিক হইলেও সত্যের একপিঠ মাত্র। সমাজতত্ত্বে ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে সহযোগ এবং শান্তির মধ্য দিয়াও রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হইয়াছে। নোভিকোউ ( I. Novicow ) দেখাইয়াছেন যে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যদিয়া বিজয়ী জাতি যেমন রাষ্ট্রস্থাপন করিয়াছে, তেমনি শান্তিপূর্ণকালে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আদান-প্রদানের জগুও রাষ্ট্রস্থাপন চলিয়াছে।† ক্রোপটকিনও ( Kropotkin ) সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিকাশে সহযোগিতার ক্রিয়াকারিত্ব ও গুরুত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।‡ এ সম্বন্ধে ব্লুন্টশ্লেইও বলেন যে, পশুশক্তি রাষ্ট্রস্থাপনের মূলে থাকিলেও ইহাই একমাত্র কারণ নয়।‡

যারা পশুশক্তিকেই ( Force ) রাষ্ট্রোৎপত্তির মূল বলেন তারা একদেশদর্শী। এঙ্গেলস্ এই পশুশক্তি-বাদ ( Doctrine of force ) অস্বীকার

ciation as a form of perversion, leading to a failure of the association so affected to fulfil its proper function in society.” (Social Theory, p 145.)

† The Critique of Social Darwinism

‡ Mutual Aid, A factor in Evolution—Kropotkin.

‡ “Certainly, force shows itself more often in the foundation of states than contract, but only very seldom has brute force alone arbitrarily produced states and never great and lasting states.” ( Bluntschli,—“Theory of the State,” p. 292 ).

করিয়া তাহার “ডুয়েরীং-বিরোধী” পুস্তকে অর্থনীতিকেই একমাত্র কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু পশুশক্তিও যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির একটা প্রধান কারণ ইতিহাসে তাহা অস্বীকার করিবার উশায় নাই। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী স্পেন্সার, বেগ্‌হট্ ( Bagehot ), গুমপ্লাবিজ প্রমাণ করিয়াছেন যে দুর্বল উপজাতিকে আত্মসাৎ করিয়া বিজয়ী উপজাতিরাই চিরকাল রাষ্ট্রস্থাপন করিয়াছে। এই মত রাৎসেনহোকার ( Ratzenhofer ), ওপেনহাইমার প্রমুখ-রা গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই এঙ্গেল্‌স্ যে পশুশক্তি ও যুদ্ধ বিজয়কে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন ইহা তাহার গোড়ামা মাত্র। তবে এই ব্যাখ্যাও—যাহাকে রাষ্ট্রের শক্তিবাদী ব্যাখ্যা বলা হয়—একপেশে। পশুশক্তি একমাত্র কারণ নয়, অগ্ৰাণ্ণ বহু কারণের মধ্যে অগ্রতম।

আর্থিক ব্যাখ্যার অগ্ৰাণ্ণ ক্রট পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। নিদিষ্ট স্তরবিভাগ করিয়া অনিবার্য একটা ক্রম নির্ধারণ করায় এই ব্যাখ্যা বিজ্ঞানবিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। অনিবার্য স্তরপর্যায় আজ প্রত্যাখ্যাত। এই প্রত্যাখ্যানের মূলে আছে আমেরিকার নববিজ্ঞানীদল। এই নব সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন ফ্র্যান্‌জ বোয়াস্, লাউয়ী, ভিস্‌লার, গোল্ডেনভাইজার, ক্রোয়েবার এবং বোয়াসের নেতৃত্বে ইহারা আজ নূতন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন, বিস্তৃত গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহের দ্বারা। সম্পত্তিকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্র বিবর্তিত হইয়াছে এবং সম্পত্তির নানা রূপান্তরের সহিত রাষ্ট্রও রূপান্তরিত হইয়াছে, এই কার্যকারণ-শৃংখলা মর্গান-মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের একটা প্রধান কথা। মার্ক্স-মর্গানের অগ্ৰাণ্ণ ক্রম ও ছক যেমন ভুল প্রমাণ হইয়াছে রাষ্ট্রতত্ত্বের ছকও তেমনি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ছক অনুসারে আদিম জীবনে সম্পত্তি ছিল না, অতএব রাষ্ট্রও ছিল না। গোষ্ঠীজীবনে ( gentile ) ছিল প্রাকৃতিক, সরল গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি-সম্পত্তি সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হইয়াছে রাজতন্ত্র ও স্বৈচ্ছাচারতন্ত্র।

লাউয়ী এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে সম্পত্তির সহিত রাষ্ট্রের এই কল্পিত সম্বন্ধ ভিত্তিহীন। আদি গোষ্ঠীসমাজে গণতান্ত্রিক সাম্য ছিল, একথা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয় না। বহু আদি জাতির মধ্যে রাজতন্ত্র এবং সম্ভ্রান্ততন্ত্র (aristocracy) প্রচলিত ছিল ও আছে। বহু উন্নত জাতিতেও গণতন্ত্র রহিয়াছে। মর্গানের এই মত সম্বন্ধে লাউয়ী তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিয়াছেন, “স্পষ্ট বলা চলে যে মর্গান অনেক অর্থহীন উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার এই কথাটির মত অকাট প্রলাপোক্তি মর্গান অণু কোথাও করিতে পারেন নাই।”\*

গোষ্ঠীসমাজ হইতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হইয়া ভৌমিক রাষ্ট্র (territorial state) আবির্ভূত হইল, ইহাই মর্গান-মার্ক্সীয় মত। গোষ্ঠীসমাজে রাষ্ট্র ছিল না, পুলিশ ছিল না, ছিল জাতি ও গোষ্ঠীজনের রক্তের বন্ধন ও সামাজিক শাসন। যখন বহু গোত্র ও গোষ্ঠীর লোক বাণিজ্য করিতে একই স্থানে বসবাস শুরু করিল তখন গোষ্ঠীশাসন ভাঙিয়া গিয়া বিবিধ গোষ্ঠীর একটী স্থানীয় সমবায় এবং রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল। এই ভাবেই আধুনিক কালের ভৌমিক বা স্থানিক রাষ্ট্রের সূচনা হইল। পরম্পরের আর্থিক স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জগুই এই রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। রক্তসম্পর্ককে ছাড়াইয়া এইবার মানুষ অর্থ-সম্পর্ককে মর্যাদা দিল এবং স্থান বা ভূমিকে অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্র গড়িল।

মার্ক্সবাদী এই মতবাদও আমেরিকার নব-সমাজবিজ্ঞান খণ্ডন করিয়াছে। রক্তসম্পর্কিত গোষ্ঠীশাসন হইতে আকস্মিক এই স্থানিক রাষ্ট্রগঠন একটা

---

\* “It may be said categorically that even at his worst Morgan never perpetrated more palpable nonsense, and that is saying a good deal.” (Lowie.)

বৈপ্লবিক পরিবর্তন, কিন্তু এই ভাবেই ইতিহাসে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে একথা ভিত্তিহীন। লাউয়ী দেখাইয়াছেন যে ইতিহাসে এই ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে নাই। গোত্রবন্ধন এবং রক্তসম্বন্ধের সহিত স্থানিক রাষ্ট্রের এই রকম হঠাৎ ছেদ ঘটে নাই। সর্বসম্মতিতে বা আইন করিয়াও এই পরিবর্তন ঘটে নাই। স্থানিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি দীর্ঘ দিন ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘটয়াছে এবং তাহার ভিত্তিও ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া বহুবিধ আদিম প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক রূপায়নের মিশ্রণ হইয়া এই ধরনের রাষ্ট্র গড়িয়াছে। ইহার মূলে বহুবিধ প্রয়োজন কাজ করিয়াছে। নানা প্রকারের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্ত, নানা অবস্থায়, নানা কারণে ও নানা পদ্ধতিতে স্থানিক রাষ্ট্র আবির্ভূত হইয়াছে। বাইরের শত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন পড়িয়াছে। ভিতরেও দীর্ঘকাল একরাজ্যে বাস করিয়া সমবেত স্বার্থকে রক্ষা করিবার দরকার হইয়াছে। এই ভাবে একস্থানের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে একটা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। হঠাৎ একটা স্তরে কেবল একটি মাত্র কারণে—সম্পত্তিস্বার্থে এবং একই গোষ্ঠীর দরিদ্রকে শোষণ করিবার জন্ত—মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করে নাই।\*

কাজেই সম্পত্তিই মানুষকে রক্ত সম্পর্ককে ছাড়াইয়া স্থানিক রাষ্ট্র গড়িতে বাধ্য করিয়াছে, এ মত ব্রান্ত। মাতৃক্রম বা পিতৃক্রম, ইহার কোন পদ্ধতির

\* “Finally, Lowie shows.....that there was no sharp and complete break between kinship-society and the political or territorial state.....The origin of the territorial state was prepared for centuries before its formal and final appearance by many and diverse types of primitive associations and by special forms of group organizations which joined by the population of a territorial

উপরেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি নির্ভর করে নাই। মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রম আসিয়াছে এ মত আজ পরিত্যক্ত। কাজেই গোষ্ঠী সমাজ থাকুক কি না থাকুক, তাহার সহিত রাষ্ট্রের উৎপত্তির কোন সম্বন্ধই নাই। এমন সমাজ আদিমকালে ছিল, এবং এখনো আছে যাদের মধ্যে গোষ্ঠীপ্রথা (gens বা clan) উদ্ভবই হয় নাই। অথচ এসব সমাজেও কোন না কোন প্রকার রাষ্ট্র বিদ্যমান আছে। কাজেই এক স্থানে আবাস-ই মানুষ-জীবনের নানা স্বার্থ ও প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করিয়াছে, এই মতই অধুনা গ্রাহ্য। মার্ক্সবাদী আর্থিকব্যাখ্যা আজ তাই প্রত্যাখ্যাত।

উপরোক্ত রাষ্ট্রব্যাখ্যা ও রাষ্ট্রতত্ত্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি সবাই একদেশদর্শী। কী ভৌগোলিক ব্যাখ্যা, কী আর্থিক ব্যাখ্যা, কী মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, কী ধর্মীয় ব্যাখ্যা, কী দৈবিক ব্যাখ্যা, কী শক্তিবাদী ব্যাখ্যা, কী চুক্তিবাদী ব্যাখ্যা,—এই সব মতবাদই রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে একপেশে। কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে এই সব মতবাদেরই মধ্যে আংশিক সত্য কিছু আছে। সবগুলি ব্যাখ্যা বা মতবাদই কোন একটা মাত্র উপাদানকে লইয়া তাহাকেই রাষ্ট্র-বিবর্তনের মূল কারণ বলিয়া ধরিয়াছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান বলে, রাষ্ট্রের ব্যাখ্যাতেও বহুবাদী ব্যাখ্যারীতিই বিজ্ঞান-সম্মত। অর্থাৎ, বহু কারণের সমবায়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন হইয়াছে। ভৌগোলিক প্রয়োজন, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক প্রয়োজন, রক্তের প্রভাব, অর্থের প্রভাব, যুদ্ধবিগ্রহ, পশুশক্তি বা বলপ্রয়োগ,—এই সব কারণই রাষ্ট্র-বিবর্তনের মূলে আছে।

সম্পত্তিহীন ও রাষ্ট্রহীন একটা অবস্থা মানুষের আদিম অবস্থা, এই মত মার্ক্সবাদের ভিত্তি। রাষ্ট্র যে একদা ছিল না তাহা প্রমাণ করিবার

aggregate into unity for certain forms of action, many of them of a political nature, irrespective of the diversity of kinship relations." (H. E. Barnes,—Recent Political Theories, p 368.)

জন এঙ্গেলস যথারীতি চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রীসদেশেই প্রথম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এর আগে রাষ্ট্র ছিল না। রাষ্ট্র ছিল না এ মত আজ অগ্রাহ্য। এঙ্গেলস 'রাষ্ট্র' বলিতে যদি আধুনিক পরিণত ও উন্নত রাষ্ট্রই ধরিয়া লন, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে আদিমকালে আধুনিক রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রেরও যে ক্রমবিবর্তন আছে একথা এঙ্গেলস ও মার্ক্সবাদীরা ভুলিয়া যান। রাষ্ট্রেরও প্রাথমিক অবস্থা গিয়াছে, আদিম অবস্থা গিয়াছে। দীর্ঘকালের বিবর্তনেই আধুনিক রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। আদিম কালে যে রাষ্ট্র ছিল তাহার রূপও আদিম কালোপযোগী ছিল। সেই রাষ্ট্র হইল আধুনিক কালের রাষ্ট্রের জ্ঞান এবং বীজ। রাষ্ট্রের যা সার্বকালিক লক্ষণ তাহা আদিম কালের রাষ্ট্রেরও ছিল। আদিমকালের সমাজব্যবস্থা যে শাসনশক্তি ও কেন্দ্র সমাজকে অব্যাহত রাখিত সেই শাসনকেন্দ্রই সে যুগের রাষ্ট্র। সংঘজীবন যখন একটা কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হয়, সেই কেন্দ্রই রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। শুধু এভাবে বলা চলে যে একত্র বাসের ফলে মানুষের মতে যে বৃহত্তর ঐক্যবোধ জন্মায় তাহার সংঘরূপই রাষ্ট্র। সংঘরূপ বলিতেই শাসনশক্তি বোঝা যায়। নিয়ন্ত্রণ করিয়া শাসন করিবার অধিকার যখন একস্থানে সর্বস্বীকৃত তখন সেখানেই রাষ্ট্র আছে বলিতে হইবে। কোলের মতে মানুষ সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করিলে কতকগুলি ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং যে সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য এই সব পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়া কারবার করা সেই সংঘকেই রাষ্ট্রনৈতিক সংঘ বা রাষ্ট্র বলা চলে। \* একটা জনসমবায়ের সমবেত সাধারণ হিতের জন্ম যে সংঘ তাহাই

\* "By a political association I mean an association of which the main purpose is to deal with those personal relationships which arise directly out of the fact that

রাষ্ট্র। সমবায়ের অন্তর্গত ব্যক্তির রক্ষাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এমন কতকগুলি স্বার্থ আছে যা সকলেরই সমানভাবে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। এই সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করার জন্তু ভিতরের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বাইরের অগ্রাগ্র সমবায় বা জনসংহতির সঙ্গে সম্পর্ক, এই দুইকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। নিয়ন্ত্রণ যে করে তাকেই বলি রাষ্ট্র। + আদিম সমাজেও এই সাধারণ কল্যাণের জন্তু সংঘজীবন ছিল, তার আইনকানুন ছিল, আইনভঙ্গের সাজা দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থাও ছিল।

এঙ্গেলস কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। তিনি রাষ্ট্রের অগ্র সংজ্ঞা কল্পনা করিয়া তারপর বলিতেছেন যে রাষ্ট্র পূর্বে ছিল না। অতি আদিমকালে তো দূরের কথা, রাষ্ট্র এথেন্সে ও রোমানদের মধ্যেও প্রথম দিকে ছিল না। রাষ্ট্র বলিতে এঙ্গেলস বোঝেন এমন একটা সংঘ, যাহাতে সাধারণ প্রজাগণ হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক একটা সাধারণ ও পার্লিক শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। †

পার্লিক শক্তি মানে কি, স্পষ্ট নয়। তবে মনে হয় এঙ্গেলস পুলিশ ও সৈন্য সামন্ত বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কাজেই মার্ক্সবাদী মতে যে

men live together in communities, and which require and are susceptible to, social organisation.” (Cole, p. 66).

† “The state is the political organisation of the individuals of a community for the common good.”

‡ “.....essential characteristic of the state is the existence of a public force differentiated from the mass of the people.” (Engels—Origin of Family p 146.)



সমাজে পৃথক সৈন্য-পুলিশ শক্তি সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকেই রাষ্ট্র আছে বলা চলিবে। ইহাই এঙ্গেলসের মতে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই মত বৈজ্ঞানিক নয়। এঙ্গেলস রাষ্ট্রহীন অবস্থা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে সামনে রাখিয়া রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। রাষ্ট্রেরও ক্রমবিকাশ হইতেছে। ক্রমবিকাশের একটা লক্ষণ বিভক্তিকরণ বা বিভাগায়ন (differentiation)। বিবর্তন ও অগ্রগতির মুখে রাষ্ট্রের নানা প্রকার নূতন নূতন ক্রিয়া (Function) এবং বিকাশবৈচিত্র্য দেখা দেয়। নানা বৈচিত্র্য ও জটিলতা সৃষ্ট হয়। এই সব বিচিত্র ও বিবিধ ক্রিয়া বাহুল্যকে নানাবিভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য বিধানই উন্নত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এই ক্রিয়াবৈচিত্র্য এবং ক্রিয়াবিভাগ আদিম ও সহজ রাষ্ট্রব্যবস্থায় কী করিয়া আশা করা যাইতে পারে? কাজেই বিশেষায়ণ (Specialisation) ও বিভাগায়ন (Differentiation) আদিম রাষ্ট্রে আরোপ করা অগ্রায়। যৌথ সমবেত জীবনকে বিশৃঙ্খলা হইতে বাঁচাইয়া জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিবার সরল ব্যবস্থাই আদিম রাষ্ট্রের মধ্য রূপ পাইয়াছে। এঙ্গেলসের সংজ্ঞাটি অবাস্তব। এই অবাস্তব সংজ্ঞার উপর দাঁড়াইয়া তিনি রাষ্ট্র খুঁজিয়াও আদিম ও প্রাচীন কালে কোথাও রাষ্ট্রের সন্ধান পান নাই। তাই গ্রীক-রোমেও ঐতিহাসিক যুগে যে সব রাজাদের কাহিনী সাহিত্যকে ভরিয়া রাখিয়াছে তাহাদের এঙ্গেলস 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। গ্রীক সমরপতি বা 'Basileus'কে তিনি "রাজা" বলিবেন না, বলিবেন "রাজতন্ত্রের প্রথম সূচনা" ("First beginnings of a future for.....monarchy" (p 124.) রোমের রাজাদের (Rex) এঙ্গেলস 'রাজা' বলিবেন না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মমসেন (Mommson) হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই জানে 'Rex' মানে রাজা। কিন্তু এঙ্গেলস বলেন, এটা মোটেই মমসেন-কথিত স্বৈচ্ছাচারী

রাজা নয়—“not at all the almost absolute king”।  
কুঠারকে কুঠার বলিতে এঙ্গেলসের বাঁধে। রাজাকে রাজা বলিবেন না।  
কারণ তাহা হইলে থিওরী টিকেনা। এঙ্গেলসের এই মনগড়া ব্যাখ্যা ও  
ভাষার মারপ্যাঁচে সত্যকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা ইতিহাস ও সমাজতন্ত্র  
স্বীকার করে নাই। তাই নৃতত্ত্ববিদ গোল্ডেনভাইজার আধুনিক সিদ্ধান্তকে  
এই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—“রাষ্ট্রব্যবস্থাও সামাজিক জীবনের  
চাইতে কম প্রাচীন নয়; বুণ্ট, ওপেনহাইমার, টেগার্ট প্রভৃতি যত  
ইচ্ছা আধুনিক রাষ্ট্রের সেই সব বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিন না কেন  
যেগুলির জন্ম আধুনিক রাষ্ট্র আদিম রাষ্ট্রগুলি হইতে পৃথক ও বিভিন্ন।” \*

যারাই অনড় ও অকাটা স্তরপর্যায় কল্পনা করিয়া ইতিহাসের বিবর্তনকে  
ছকে বাঁধিতে চাহিয়াছেন তারাই পূর্বে রাষ্ট্রহীন স্তর একটা ধরিয়া লইয়াছেন,  
এই সব বিবর্তনবাদীদের কথা মনে করিয়া একদা ব্লুন্টশ্‌লী বলিয়াছিলেন.  
“দার্শনিক জল্পনা চিরকালই একটা রাষ্ট্রহীন আদিম স্তর কল্পনা করিয়া সেই  
অবস্থা হইতে কী করিয়া মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল তাহা লইয়া প্রশ্ন  
তুলিতে ভালবাসে।” †

\* “Political organisation must be regarded as no less ancient than social organisation, in the narrower sense. Writers such as Wundt, Oppenheimer, Teggart and others are, of course, at liberty to emphasise those aspects of the modern historic state which differentiate it from its primitive prototype.” (Goldenweiser,—Recent Political Theories, p. 445.)

† “Philosophical speculation is fond of imagining a primitive condition in which men lived without government and then asking how from that condition mankind has arrived at the State.” (p 283.)

বুণ্টু প্রভৃতিরও এই বিবর্তনী মোহে পড়িয়া আদিম ও আধুনিক রাষ্ট্রে পার্থক্য দেখিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে আদিম রাষ্ট্র 'রাষ্ট্রই' নয়। গোল্ডেনভাইজার বলেন, প্রত্যেকটি আদিম উপজাতিই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-জনিত বৃহত্তর ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হইল এই ঐক্যবন্ধ করিবার প্রবণতা—“integrating tendency of political organisation”। এক স্থানে বাস, একই সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, একই ভাষা এবং সর্বোপরি উপজাতীয় 'নাম' ( Tribal name )—এই সব হইতে একটা ঐক্যবুদ্ধি বা অহংবোধ—বাকে গোল্ডেনভাইজার নাম দেন 'we-ness'—জাত হয়। এই 'আমরা'-'তাহারা'-চেতনা ; এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, জাতিবোধ, শান্তিকালে চাপা থাকিলেও যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সময়ে প্রথর হইয়া উঠে। এই বোধ হইতেই রাষ্ট্র-চেতনা—political sense—জন্মিয়া উঠে। এই চেতনা পাই অসভ্য জাতির মধ্যে এবং তাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আভাস পাই তাদের উপজাতীয় নেতা বা chief-দের মধ্যে। হয় কর্তাপুরুষ ( old man ), নয় পুরোহিত বা যোদ্ধা, নয় বাতুকর—এরাই আদিম সমাজে নেতা এবং দার্বজনীন জীবনের হিতাহিতের নিয়ন্ত্রক। এই সব উপনেতাদের ক্ষমতা কোথাও বেশী কোথাও কম। কিন্তু সর্বত্রই তারা আদিম জীবনের কেন্দ্রশক্তি।

এস্কিমোদের, সালিশ ( Salish ) জাতির, হাইদা ( Haida ), ইরোকোয়া, এমন কি অষ্ট্রেলিয়ানী জাতিগুলির মধ্যেও উপনেতাদের প্রাধান্য রহিয়াছে। কোথাও কোথাও নেতৃত্ব বংশানুক্রমিক। ইরোকোয়াদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জটিল ও উন্নত। আফ্রিকার কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র বৃহৎরাজ্য ও বিপুল জনসংখ্যার উপরে কর্তৃত্ব করে। এখানে বংশানুক্রমিক ও স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র রহিয়াছে। এখানে, গোল্ডেনভাইজারের মতে যুদ্ধজয়, পররাজ্য আত্মসাৎ-করণ, দাসপ্রথা ইত্যাদির মধ্য দিয়া শক্তিশালা সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে। শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবও একটা কারণ।

রিভাস'ও উপজাতীয় সমাজে তিন রকম রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতন্ত্র, শাসন-পরিষদে ঞ্চস্ত ক্ষমতা (Vested in council), ও সম্ভ্রান্ত-শাসন। † অনেক স্থানে—যথা সলোমন দ্বীপের এডিষ্টোন (Eddystone) দ্বীপে নেতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যুদ্ধে ও ধর্মে নেতৃত্ব। কিন্তু হাওয়াই দ্বীপ প্রভৃতি প্রশান্ত সাগর দ্বীপগুলিতে আবার আধুনিক রাষ্ট্রেরই মত রাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। † আফ্রিকায়ও এই একই অবস্থা। জুলু ও পশ্চিম আফ্রিকার কতকগুলি জাতিতে নেতার ক্ষমতা সীমাহীন। \* রিভাস' এবিষয়ে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনেকস্থানেই নেতৃত্ব ধর্ম ইত্যাদি ব্যাপারেই প্রধান কিন্তু মেলানেশিয়া,

‘In tribal societies we can discern, at first sight, three main varieties of government. One in which authority is vested in one or two persons, giving us the institution of chieftain-ship or kingship, single or dual ; ...a second, in which authority is vested in a council ; and a third, in which authority is in the hands of a few who may be either a body of hereditary nobility or may attain their position by age or wealth.’ (Social Organisation, p 160.)

† “....The institution of chieftainship having developed into a form of kingship not greatly different from that of our own society.” (Rivers, p. 162.)

as among the Tulus and in parts of W. Africa, the power of the chief is almost unlimited.” (Rivers, p. 163)

পলিনেশিয়া এবং আফ্রিকা-আমেরিকার বহুস্থানে রাজতন্ত্রের দৈবী অধিকার ও ধর্মগত দিক, নেতাদের প্রাধাত্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ও মেলানেশিয়ায় বৃদ্ধদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়।† আদিমকালে রাজারা সব পুরোহিতও ছিলেন। এই সব পুরোহিত-রাজার সমাজের কর্তা ছিলেন।‡ এ সম্বন্ধে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ফ্রেজার (Frazer) এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনিও দেখাইয়াছেন যে আদিম কালে রাজতন্ত্র ছিল, তবে রাজতন্ত্রের সাথে সাথে পুরোহিততন্ত্রও জড়িত ও মিশ্রিত থাকিত। আধুনিক নৃতত্ত্ব সর্বত্র গবেষণা দ্বারা এঙ্গেলসের পুরাণে ঐওরিকে ভিত্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে।

এই কারণে সব দিক বিবেচনা করিয়া গোল্ডেনভাইজার বলেন যে, সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক জীবনও চিরকালই ছিল। রাষ্ট্র পরবর্তী কালের, একথা বলা চলে না। আদিম যুগ হইতেই রাষ্ট্র রহিয়াছে। §

† “The divine right of kings and the religious aspect of kingship ... form the essence of the chieftainship of such regions as Melanesia and Polynesia as well as of many parts of Africa and America.” (Rivers, p. 165.)

‡ “The combination of priestly functions with royal authority is familiar to everyone.” (Frazer—Golden Bough, p 9.)

§ “To Summarise :—political organisation and social organisation in the narrower sense, represent two polar aspects of social life. Both are omnipresent in human society.” (Goldenweiser, p. 454.)

এই সব আলোচনা ও তথ্য দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে এঙ্গেলসের মত ভুল। আদিম সমাজ রাষ্ট্র চেনে ও বোঝে। কোন-না-কোন রূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, রাষ্ট্র সকল জাতিতেই বিদ্যমান রহিয়াছে শুধু তাই নয়, আরো আদিকালে যদি বাই তবে একথা বলা চলে পরিবারেই প্রথম রাষ্ট্রের আভাস সৃষ্টি হইয়াছিল। পরিবারে কর্তার প্রাধান্য পরিবারের সামঞ্জস্য রক্ষা ও মঙ্গলবিধান করে। পরিবারই মানুষ জীবনের প্রথম সংঘরূপ। সংঘ-জীবনে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ শুরু হয় প্রথম এই পরিবার হইতেই। এই সংঘ-নিয়ন্ত্রণই এককালে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে পরিণত হইয়াছে একথা অনেকেই মনে করেন। প্রফেসার ব্ল্যাকমার ও প্রফেসার গিলিনের মতে, এই সব কর্তাব্যক্তি (patriarch) হইতেই উপজাতীয় নেতার (chief) উদ্ভব হইয়াছে। এই সব নেতারা এই সংঘ-জীবনকে পরিচালনা করেন।† নেতারা ই ম্যাজিক, ধর্ম ইত্যাদি সহযোগে—কিংব

+ “In the establishment and maintenance of social order, the family frequently performed in a primitive way all the essential duties of the state. As the family multiplied in numbers through adoption and natural increase until it became a great tribe under the direction of the patriarch and chief, it became necessary to establish more elaborate methods of control .....In him (patriarch) we find one historical origin of political control.” (Blackmar, and Gillin, p. 213.)

+ “Direction of tribal affairs by a man of authority constitutes chieftainship.” (Walis, Introduction to Anthropology p 354.)

সোজার্সজ—রাজা হইয়া দেখা দিয়াছেন। এঙ্গেল্‌স্ “উপনেতা” এবং “রাজা” এই দুটা শব্দে পার্থক্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পার্থক্য নাই। এঙ্গেল্‌স্‌র এই পার্থক্য-কল্পনা যে মনগড়া তাহা স্বীকার। প্রফেসর ওয়ালিসও বলেন, “উপনেতা” ও ‘রাজার’ মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই, যারা পার্থক্য করেন তারা জবরদস্তি এই ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন।”† ফ্রেজার বলেন যে, যারা যাচুকর, প্রকৃতিকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করিয়া যারা অসভ্যসমাজে শক্তিশালা ও সম্মানিত হইয়া ওঠেন তাহারাই প্রায়শঃ নেতা ও রাজা হইয়াছেন।‡

রাজতন্ত্রের উদ্ভবের মূলে কোথাও কোথাও ম্যাজিকের প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিও সার্বজনীন স্তর বলিয়া স্বীকৃত হয় না। ফ্রেজারের মত সর্বগ্রাহ্য নয়। তাহা ছাড়া ফ্রেজার নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে একই পদ্ধতিতে রাজতন্ত্র সর্বত্র বিকশিত হইয়াছে ইহা বলা চলে না।‡ আসলে রাজতন্ত্র বা রাষ্ট্র কিছুই কোন একই পদ্ধতিতে গড়িয়া ওঠে নাই। বহু কারণের সমাবেশের ফলেই রাষ্ট্র বিবর্তিত হইয়াছে।

‡ “There is no distinction, other than an arbitrary one, between a chief and a king.” (Walis —Introduction to Anthropology, p 354.)

‡ “In point of fact magicians appear to have often developed into chiefs and kings.” (Golden Bough, p. 83.)

† “I am far from affirming that the course of development has everywhere rigidly followed these lines ; it has doubtless varied greatly in different societies.” ( Frazer. p.106, )

গোল্ডেনভাইজারের ভাষায়, “রাষ্ট্র-বিকাশের প্রধান কারণগুলি এইরূপ ; যুদ্ধ, বাসস্থানের প্রভাববৃদ্ধি, রাজ্যবিস্তার, সামাজিক শ্রেণীবৈচিত্র্যের বাহুল্য, সম্পত্তির উদ্ভব এবং আর্থিক বৈষম্য, মর্যাদা, পদবী ও অধিকারের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার প্রথা, নেতার শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং শাসন সম্প্রদায় বা আমলাতন্ত্রের উদ্ভব।”\* কাজেই যুদ্ধ, ভূগোল, বংশ, অর্থনীতি, ব্যক্তিগত প্রতিভা প্রভৃতি বহু বিচিত্র শক্তির ক্রিয়াফলই রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করিয়াছে। এই সব বহু কারণের সবগুলিই যে সর্বত্র একই ভাবে সক্রিয় হইয়াছে তাহা নয়। ইহাদের ভারতম্য এবং ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে উদ্ভূত হইয়াছে। আফ্রিকাতে যুদ্ধ, রাজ্যবিস্তার, শক্তিশালী নেতা ও বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার মিলিয়া কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় অগ্ন্যাগ্ন কারণ না থাকায় কেবল ব্যক্তিগত নেতৃত্বই খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। একই রীতিতে রাষ্ট্রবিকাশ সর্বত্র হয় নাই। এই প্রকার বিভিন্ন অবস্থা-সমাবেশেতু, বিভিন্ন ধরনের রূপায়ন নানা স্থানে হইয়াছে। যারা বাধাধরা ভাবে গোষ্ঠী-সমাজ হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলেন, তাহাদের মত বিজ্ঞানসম্মত নয়। গোল্ডেনভাইজার এর প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, “আদিম সমাজে রাষ্ট্র-বিবর্তন ঘটিয়াছে গোষ্ঠীসমাজের ধ্বংসের ভিতর হইতে একথা কোন অর্থেই বলা চলে না।”\*

\* p. 454, ibid.

\* “In no sense can it be said that political organisation in primitive society, emerges upon the ruins of kinship organisation. On the contrary, everywhere they co-exist……(p. 455.)



এঙ্গেল্‌স্ গ্রীসদেশ হইতেই পৃথিবীতে রাষ্ট্রের বা রাজতন্ত্রের প্রথম উৎপত্তি ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু গ্রীসদেশের পূর্বে মিশর দেশে এবং তাহারও পূর্বে মহেঞ্জো-দারো বা ভারতে যে সুবিকশিত রাষ্ট্রতন্ত্র প্রচলিত ছিল তাহার উপযুক্ত জ্ঞান এঙ্গেল্‌সের ছিল না। এঙ্গেল্‌সের মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রের ইতিহাস সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ব যে সব প্রাচীন রাষ্ট্রের সন্ধান খুঁজিয়া লাইয়াছে তাহাতেও মার্ক্সীয় ছক ভাঙিয়া পড়ে।

মর্গানী-মার্ক্সবাদী ছক অচল হওয়ায় উক্ত ছকের রাষ্ট্রতত্ত্বও অচল হইয়াছে। প্রাদিমকালে রাষ্ট্রহীন সমাজ ছিল এবং পশুপালন স্তরে ব্যক্তি-সম্পত্তি হইতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটয়াছে, এই মার্ক্সীয় মতবাদ নবসমাজবিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়াছে। লাউয়ী, গোল্ডেনভাইজার প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদগণ এই মর্গানী ও মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের অর্থোক্তিকতা দেখাইয়া বহু তথ্য সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক বিচার সহকারে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের আলোচনার প্রমাণ হইয়াছে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বহু কারণে ঘটয়াছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যাই (Pluralist Interpretation) বিজ্ঞানসম্মত। এই ব্যাখ্যাকে অন্তর্ভাষায় বলা চলে “চিদ-ভৌতিক ব্যাখ্যা” বা Psycho-materialist Interpretation. এই ব্যাখ্যায় রাষ্ট্র কেবল জড়শক্তি বা মর্থাশক্তিরই সৃষ্টি নয়; রাষ্ট্রোৎপত্তির মূলে আছে চিৎশক্তি এবং জড়শক্তি, মনসিক এবং ভৌতিক শক্তি উভয়েরই ক্রিয়া। এই ব্যাখ্যা অনুসারে রাষ্ট্র মানব-প্রকৃতির একটা নিশ্চিত প্রয়োজন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। বাহ্যিক প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে রাষ্ট্র ইতিহাসে উৎপত্তি দিয়াছে। বর্বর যুগের কোন একখানে কেবল ব্যক্তিসম্পত্তিই রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করে নাই। যতদিন মানুষ পৃথিবীতে আছে, ততদিনই কোন-না-কোন আকারে মানুষজীবনে রাষ্ট্র বিদ্যমান আছে। তবে এই রাষ্ট্রকে আধুনিক রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিলে ঐকান্তিক ক্রটি ঘটবে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে

মার্ক্সীয় মতবাদ অবৈজ্ঞানিক, তাহা দেখান হইল। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও এই মতবাদ ভ্রান্ত তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এখন সেই প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে।

## রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতবাদ ভ্রান্ত হইলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধেও এই মতবাদ ভ্রান্ত হইবে ইহা যুক্তিবৃত্ত। মার্ক্সীয় মতে, রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে নীচ উদ্দেশ্যে—ধনহীনদের শোষণ করিবার ও দাবাইয়া রাখিবার জন্ত। রাষ্ট্র হইল একটা অত্যাচারের যন্ত্র, প্রবল ধনশালীদের স্বার্থসিদ্ধির একটা উপায় মাত্র।\*

যুগে যুগে রাষ্ট্র বিত্তশালীদের ও প্রবল শ্রেণীর একটা “কার্ষকরী সমিতি” রূপে সমাজে দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রের এই পরিচয়, মার্ক্সবাদী আর্থিক ব্যাখ্যার যৌক্তিক পরিণতি। রাষ্ট্র বিত্তবানদের বিত্তরক্ষার জন্ত সৃষ্টি করা হইয়াছে। কাজেই সম্পত্তিশালীদের হাতের যন্ত্র এবং আর্থিক শোষণের একটা উপায় রাষ্ট্র হইতে বাধ্য।

কিন্তু আর্থিক ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। সম্পত্তির প্রভাব রাষ্ট্রের উপরে পড়িয়াছে চিরকাল। সম্পত্তিশালীদের সামাজিক প্রাধান্যের প্রভাবও রাষ্ট্রের উপরে পড়িয়াছে। একথা স্বীকার্য। কিন্তু নিছক সম্পত্তির থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় নাই, ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। রাষ্ট্র অর্থশক্তি ছাড়াও

---

\* “Economically, ruling class, which by its means, becomes also the politically ruling class, and so acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class.” p. 218.

না কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। কাজেই রাষ্ট্রের ক্রিয়া প্রভাব ও সার্থকতা বল আর্থিক শোষণের মধ্যেই প্রকট হইয়াছে, একথা বিজ্ঞানবিরোধী। পুষ্টির মূলে মনোজগতের, জৈবিক ক্ষেত্রের, ভৌগোলিক পরিস্থিতি প্রভৃতির না শক্তি রহিয়াছে। তেমনি বহুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রের ক্রিয়া (function) ও সার্থকতাও বহুবিধ। মানুষজীবনের বহুবিধ প্রয়োজনই সাধন করে। বহু শক্তির সৃষ্টি বলিয়াই রাষ্ট্রের ক্রিয়াকারিত্বও বহুবিধ।

এরিষ্টটল্ বলিয়াছিলেন, ‘মানুষ স্বভাবতঃই রাজনৈতিক জীব’।\* রাষ্ট্রের প্রয়োজন মানবজাতির স্বাভাবিক প্রয়োজন। মানুষের মধ্যেই আছে মানব একত্র বাস করিবার প্রবৃত্তি। সেই সঙ্গেই আছে পারস্পরিক পর্ক রক্ষা করিয়া সংঘজীবনে রাষ্ট্র স্থাপনের বৃত্তি।†

রাষ্ট্র মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষজীবনের অগ্ৰাণ্য দিকের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ তাই বিড়। ধর্ম, পরিবার, সম্পত্তি, আত্মরক্ষা প্রভৃতি সকল বৃত্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে। তাই ধর্ম কেবল সম্পত্তি রক্ষা করে, তাই নয়। অগ্ৰাণ্য সকল অধিকারকে যেমন রাষ্ট্র রক্ষা করিয়া থাকে তেমনি সম্পত্তিকেও তেমনি রক্ষা করে রাষ্ট্র। কেবল তাই নয়। ধর্ম, পরিবার, যৌনজীবন, ইত্যাদি সকল প্রকার সামাজিক অধিকারকেই রাষ্ট্র রক্ষা করে। রাষ্ট্রের সহিত অগ্ৰাণ্য সামাজিক দিকের এই পারস্পরিক সম্পর্ক (functional co-relation) সমাজ-জীবনের প্রধান সত্য। কেবল অর্থনীতির সহিত সম্পর্কটাকে বাড়াইয়া অতিরিক্ত গুরুত্বদান করিয়া মার্ক্সবাদ আতিশয়া করিয়াছে। তবে এই পারস্পরিক সম্পর্কের কখনো

\* “Man is by nature a political animal.”

† “We find in human nature the tendency to and the need for, political existence.” Blutschli, p. 23.

কখনো আতিশয্য ও বিকৃতি ঘটিতে পারে। পারস্পরিক সম্পর্কে সামঞ্জস্যটা নষ্ট হইয়া তাহাতে সমাজের ভারসাম্যও নষ্ট হইয়া বান্ধু আর্থিক ব্যবস্থা কখনো রাষ্ট্রকে গ্রাস করিতে পারে, তখন রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিকৃতি ঘটে। কোন যুগধর্মও রাষ্ট্রকে অতিরিক্ত প্রভাব করিতে ফেলিতে পারে, যেমন মধ্যযুগে হইয়াছিল। পুঁজিবাদীরা রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করিয়া যদি যন্ত্রের মত ব্যবহার করিতে পারে তবে তাহা একটা বিশেষ অবস্থার বিকৃতি। একটা বিশেষ আর্থিক ব্যবস্থার অতিরিক্ত প্রভাব রাষ্ট্র উপরে পড়িয়া রাষ্ট্র যদি রাষ্ট্রধর্ম হইতে বিচ্যুত হয় তবে সেই বিকৃতিতে রাষ্ট্রের স্বরূপ বলা চলে না। মার্ক্সবাদ এই ক্রটিই করিয়াছে। পুঁজিবাদের প্রভাব ও প্রাবল্য দেখিয়া এই মতবাদ পুঁজিবাদকেই রাষ্ট্রের জননিত্য উৎপাদক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। প্রোফেসার কোল-ও (Cole) মার্ক্সবাদে এই ক্রটি দেখাইয়াছেন। পুঁজিবাদীদের হুকুম রাষ্ট্রকে আজ তামিল করিতে হয়। তামিল করিতে রাষ্ট্রকে বাধ্য করা হয়। এখানে পুঁজিবাদী স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে বিকৃত করা হইয়াছে। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্কে একটা বিকৃতি ও আতিশয্য দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বৃত্তি পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষা ও শোষণ নয়। মার্ক্সবাদীরা রাষ্ট্রতন্ত্রের সমালোচনায় কোল বলেন, ‘পুঁজিবাদের আমলে যাহা ঘটে তাহা রাষ্ট্রের ক্রিয়া ও স্বধর্মের একটা বিকৃতি এবং এতে রাষ্ট্রকে সমগ্র জাতির রাষ্ট্রিক ষন্ত্র হিসাবে না ব্যবহার করিয়া প্রবলতম আর্থিক শ্রেণীর এক আর্থিক-রাষ্ট্রিক ষন্ত্র হিসাবে অপব্যবহার করা হয়।\*

\* “What occurs under Capitalism is a perversion of the free function of the state and its use, not a political instrument of the whole people but as secondary economic-political instrument by the dominant economic class.” (Cole, 148.)

এখানে মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের সহিত বহুবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের পার্থক্য স্পষ্ট, মার্ক্সীয় ভ্রমের অসঙ্গতিও স্পষ্ট। পুঁজিবাদ রাষ্ট্রকে দিয়া অনেক কিছু করাইয়া লইতে পারে। তাহাতে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ পুঁজিবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইল। কিন্তু রাষ্ট্রের পত্তি এবং রূপ ও প্রকৃতি পুঁজিবাদ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রমাণ নহে।

তাহা ছাড়া, আরো ক্রটি আছে। রাষ্ট্র যদি বা প্রবলতর শ্রেণীর যন্ত্রনাকান্ধে হইয়াও থাকে, তবু সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র পুঁজিবাদী যন্ত্র হইতে পারে না। অত্যাচার কারণ ও অবস্থার প্রভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বধর্মও কিছু সক্রিয় হইতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র কেবল অর্থনৈতিক শোষণ করে না। রাষ্ট্র কল্যাণকর সাধারণ বিষয়গুলিও রাষ্ট্র সমাধা করে। রাষ্ট্রের নিজস্ব স্বার্থক সার্থকতাও অব্যাহত থাকে।\* কোল মার্ক্সবাদের অনেকখানি স্বীকার করিয়াই একথা বলিতেছেন। আসল কথা হইল এই যে, রাষ্ট্রকে মার্ক্সবাদ কবারে ঘোলো আনা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বানাইয়াছে, ইহার রাষ্ট্রিক স্বধর্ম চরিত্র মার্ক্সবাদ স্বীকারই করে না। এইখানে মার্ক্সবাদের আতিশয্য হইল এই খান হইতেই মার্ক্সবাদী বিচার ও সিদ্ধান্তের ক্রটি উৎপন্ন হইয়াছে।

মার্ক্সবাদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নিছক শোষণযন্ত্র এবং সকল অকল্যাণের উৎস। মার্ক্সবাদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই কল্পনাও ভ্রান্ত। রাষ্ট্র কখনো হয়তো

\* “Secondly, although the state is in fact largely an executive committee for administering the affairs of the capitalist class, it is not exclusively so. Perversion of its function is not carried so far as to obliterate all signs and traces of its real function.” (Cole, 149.)

বা শোষণ বা অত্যাচারের জগু ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে রাষ্ট্রের চরিত্রই সমাজ শোষক ও ক্ষতিকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। রাষ্ট্রের একটা স্বধর্ম আছে। সামাজিক জীবনের জটিল সম্বন্ধ জালের মধ্যে রাষ্ট্রেরও একটা সার্থকতা ও স্থান রহিয়াছে। এই স্বধর্ম ও সার্থকতা ছাড়াইয়া যদি রাষ্ট্র অপরের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করে তবে সামাজিক সহসম্পর্কে ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং রাষ্ট্র ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু “রাষ্ট্র” প্রতিষ্ঠানটী অমঙ্গলজনক একথা বলা অসঙ্গত। সামাজিক জীবনের অগু দশটা দিবে মধ্যে রাষ্ট্রও একটা। কাজেই রাষ্ট্রকে অতিরিক্ত ফাঁপাইয়া ও বাড়াইয়া ঈশ্বরের আসনে বসানো যেমন একটা বিকৃতি, তেমনি রাষ্ট্রকে ধর্ম করি বিনষ্টির পথে পাঠাইলে তাহাও ততোধিক বিকৃতি। মার্ক্সবাদ রাষ্ট্রকে অবিমিশ্র অমঙ্গল বলিয়া ইহার বিলুপ্তিই কল্যাণকর মনে করে। নৈরাজ্যবাদ (Anarchism) সহিত পরিণামে একই সিদ্ধান্তে মার্ক্সবাদ উপস্থিত হইয়াছে। তবে মার্ক্সবাদ রাষ্ট্রের ক্রমবিলুপ্তির কথা বলেন, সাম্প্রতিক অবস্থায় রাষ্ট্রের ধ্বংস চায় না। নৈরাজ্যবাদ অবিলম্বে রাষ্ট্রের ত্বরিত বিলুপ্তি চায়। কিন্তু মূলতঃ এই দুই মতবাদই রাষ্ট্রকে অমঙ্গল (evil) বলি মনে করে। রাষ্ট্র সকল সুরের সকলের সাধারণ কল্যাণের জগু ব্যবস্থা করে সমষ্টির, তথা ব্যষ্টির রক্ষা ও পোষণই হইল রাষ্ট্রের লক্ষ্য। সমাজে বিভিন্ন রকমের শ্রেণী, বিভিন্ন রকমের বিভাগ ও স্বার্থ রহিয়াছে। আদিম কালে ছিল। আদিম কালে যে কেবল বুভুক্ষাই একমাত্র বৃত্তি ছিল তাহা না

---

\* “The state is the political organisation of the individuals of a community for the common good .....Its purpose is the protection & preservation of the group and incidentally, of the individuals (Blackmar & Gillin, p, 210.)

বিচিত্র রুচি ও বিভিন্ন প্রয়োজন চিরকালই আছে। এই সঙ্গে বিভিন্ন স্বার্থের ও শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ ও স্বার্থবিরোধ আছে। কিন্তু এত বিভিন্নতা ও স্বার্থবিরোধ থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি বিষয়ে স্বার্থসাম্য এবং সাদৃশ্যও ছিল। কতকগুলি সুখদুঃখ-স্বার্থ সকল শ্রেণীর সকল মানুষেরই মধ্যে সমানভাবে আছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে আত্মরক্ষার স্বার্থ এক দেশবাসী সকল শ্রেণীরই সমানভাবে রহিয়াছে। তেমনি জীবনযাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থায় ঐক্য ও শৃংখলা স্থাপনও সকলেরই স্বার্থ। এই সব সমস্বার্থকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কাজ।

এইখানে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। রাষ্ট্রের কাজ সাধারণের মঙ্গলের জন্মই বা কতদূর বিস্তৃত হইবে তাহা লইয়া মতভেদ। একপ্রান্তে আছে নৈরাজ্যবাদী রাষ্ট্রবিলুপ্তির দাবি, ক্রোপট্কিন প্রমুখদের রাষ্ট্রবিবেষ। মাক্সবাদও এই পর্যায়ের। গান্ধীবাদও পূর্বে এই পর্যায়ের ছিল, কারণ গান্ধীজীও রাষ্ট্র-প্রাধান্য বিলুপ্ত করিতে চান। (সম্প্রতি গান্ধীবাদে কিছু-পরিবর্তন দেখা যাইতেছে।) অন্যপ্রান্তে রহিয়াছে সমষ্টিবাদীদের রাষ্ট্র-পূজা, রাষ্ট্রের বেদিতে ব্যক্তিকে বলি দিতে যারা দ্বিধা করেন না। মাঝামাঝি রহিয়াছে স্পেন্সার, নোভিকাউ, লা বো (Le Bon), সূমনার (Sumner) প্রভৃতির মত। এরা রাষ্ট্রের কাজ কেবল ধনপ্রাণরক্ষা এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ, এই দুটীতেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চান। এদের মতে রাষ্ট্র হইল সমাজের পুলিশম্যান। বর্তমান যুগেও হবহাউস্, ওয়ার্ড (Ward), গিডিংস্ (Giddings), ষ্টাইন্ (Ludwing Stein), কোল, (Cole), লাস্কি (Lasky), দুরখীম্ (Durkheim) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রকে অমঙ্গল মনে করেন না। তাহারা রাষ্ট্রকে জনমঙ্গলের বাহন ও যন্ত্র বলিয়া মনে করেন। প্রফেসর গিডিংস্ রাষ্ট্রকে বলেন, “মানবমনের

সব চাইতে শক্তিশালী সৃজন এবং মানবলক্ষ্যের মহত্তম প্রকাশ”।\* ওয়ার্ড বলেন, “...রাষ্ট্রের একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা, সেটি হইল গোটা সমাজের কল্যাণ, ব্যক্তিকে সমাজবিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখা হইল ইহার কর্মপদ্ধতি। রাষ্ট্র স্বয়ং সমাজহানিকর যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ রাষ্ট্র মানুষের কর্মের স্বাধীনতাকে বৃদ্ধি করে।...রাষ্ট্রের জন্মই ইতিহাসে সকল অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। এবং রাষ্ট্রের জন্মই সমস্ত সামাজিক, শিল্পিক, সাহিত্যিক, ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সম্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা চলে এমন কোন প্রতিষ্ঠানই সমাজে নাই, এবং এই কারণে মানুষের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রই সব চাইতে গুরুত্বশীল।”\*

---

\* “The mightiest creation of the human mind, the noblest expression of human progress.” (The Responsible State, Giddings p 48.)

\* “We thus see that the state.....has but one purpose, function, or mission, that of securing the welfare of society; that its mode of operation is that of preventing the anti-social action of individuals; that in doing this it increases the freedom of human action so long as it is not anti-social;.....it has always been the condition to all achievement, making possible all the social, industrial, artistic, literary and scientific activities that go on within the state and under its protection. “There is no other institution with which the state may be compared, and yet in view of all this, it is the most important of all human institutions.” (Ward, Pure Sociology, p 555.)



হবহাউস্-ও রাষ্ট্রের সামাজিক সার্থকতা সম্বন্ধে ইহাদের সহিত একমত। লার্ক এবং কোলও রাষ্ট্রের সার্থকতা স্বীকার করেন। ইহাদের মতে, রাষ্ট্র সমাজের একটি অগ্রতম প্রতিষ্ঠান এবং সকল শ্রেণীর সাধারণ সমষ্টি জীবনের সাধারণ প্রয়োজনগুলি লইয়াই ইহার ক্ষেত্র ও রাজ্য। রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারী ও সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়া অগ্রাগ্র প্রতিষ্ঠানের উপরে জুলুম করিলে তাহার বিকৃতি হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহা না হইলে রাষ্ট্র সমাজে একান্ত প্রয়োজনীয় সার্থক প্রতিষ্ঠান। ব্লুন্টশ্লেই-ও বলেন যে রাষ্ট্র মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির পরিণতি। রাষ্ট্রকে যাহারা অনিবার্য অমঙ্গল বলিয়া মনে করেন তাহাদের ভুল।\*

রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে মতভেদ নাই। রাষ্ট্রের ক্ষেত্র ও সীমা কোথায় তাহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ বিজ্ঞানীই রাষ্ট্রকে সাধারণ কল্যাণের বাহক বলিয়া মনে করেন। প্রত্যেক মানবীয় প্রতিষ্ঠানেরই ভাল-মন্দ দুই দিক আছে। রাষ্ট্রের সহিত ধর্মের, রাষ্ট্রের সহিত অর্থনীতির, রাষ্ট্রের সহিত পরিবারের, সম্পর্ক সর্বদাই মাত্রা রাখিয়া চলে না। নানা কারণের বিচিত্র সমাবেশ হেতু এই মাত্রা ও সামঞ্জস্যের ব্যতিক্রম হয়। এই ব্যতিক্রম ও বিকৃতি থেকে সমাজের সমষ্টিজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতির জন্ম রাষ্ট্রকে দায়ী করা ঠিক নয়। রাষ্ট্রের অপব্যবহার ও বিকৃতি ঘটে বলিয়া রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানকেই ধ্বংস করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এই কারণে মাক্সবাদী ব্যাখ্যায়ও আংশিক সত্য আছে। রাষ্ট্র অত্যাচারের যন্ত্র হইয়াও দাঁড়াইয়াছে কখনো কখনো। প্রবলের হাতের যন্ত্র

\* “ The state is thus not an arrangement only for the purpose of taming evil passions. It is not a necessary evil, but a necessary good.” (Bluntschli. 302)

হইয়া রাষ্ট্র সমাজে জনগণের লাঞ্ছনার কারণও হইয়াছে। একথা ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের জন্মই অত্যাচারের জন্ম এবং ইহার একমাত্র সার্থকতাই শোষণ করা, একথা একদেশদর্শিতার পরিচয়। রাষ্ট্রের এই একচোখো ব্যাখ্যা যে বিজ্ঞানীরা বর্জন করিয়াছেন তাহা এই আলোচনার প্রমাণিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের নানা বিকৃতি সম্বন্ধে সমাজের ইতিহাসে রাষ্ট্র বহু মঙ্গলকে সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্র না সৃষ্ট হইলে মানবজীবনে কোনো সৃষ্টি, কোন বিকাশই সম্ভব হইত না। এই দিক থেকে মার্ক্সবাদী সংজ্ঞা এবং বর্ণনা ভ্রান্ত ও একপেশে।

## রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ

এইবার রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। মার্ক্সবাদী মতে রাষ্ট্র সম্পত্তি-প্রথা থেকে উদ্ভূত হইয়াছে, কাজেই ব্যক্তিসম্পত্তি লুপ্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি অনিবার্য।\* রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা হইতে যুক্তিসংগত ভাবেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বিলুপ্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যাখ্যা স্বীকার না করিলে, রাষ্ট্রের বিলুপ্তিও স্বীকার করার কথা আসে না। সম্পত্তি-প্রথার সহিত রাষ্ট্রের এই কার্যকারণ সম্পর্ক, পূর্বেই দেখান হইয়াছে, আধুনিক সমাজবিজ্ঞান স্বীকার করে না। আর্থিক নিয়ন্ত্রণ-বাদ বা Economic determinism আজ প্রত্যাখ্যাত এবং মানবজীবনের ক্ষেত্রে ও সমাজ-ব্যবস্থায় জড়জগতের যান্ত্রিক কার্যকারণের অমোঘ ও অনড় বন্ধন আজ অস্বীকৃত। কাজেই সম্পত্তি-প্রথার সহিত রাষ্ট্রের এই বন্ধন বিজ্ঞান বর্জন করিয়াছে। অর্থনীতি সমাজ-জীবনের বহু

\* "The state inevitably falls with them (classes)."  
Engels, 221.)

নীতির অগ্রতম মাত্র। রাষ্ট্রের উপর ইহার প্রভাব স্বীকার করিয়াও বলিতে হয় যে অর্থনীতির প্রভাব ব্যতীত অগ্ৰাণু আরও বহু প্রভাব রাষ্ট্রকে রূপ দান করিতেছে। এক্ষেত্রে কেবল অর্থনীতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক করিয়া দাঁড় করানো যুক্তিবিরুদ্ধ একেদেহদর্শিতা। তাই রাষ্ট্রকে পশুপালকপর, কৃষিতন্ত্রী (agricultural), সামন্তিক (Feudal), শিল্পিক বা পূঁজিবাদী, ইত্যাদি সংজ্ঞা দান করিলেই সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হইল না। রাষ্ট্রের একদিক মাত্র এই সব বিশেষণে সূচিত হয়। অর্থনীতি কখনো খুব বেশী প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। এই আতিশয্য ক্ষতিকর।\* মার্ক্সবাদ এই আতিশয্যকে সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে স্বাভাবিক মনে করিয়া সমাজ-বিবর্তন কল্পনা করিয়াছে। তাই নবসমাজ-বিজ্ঞানে মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের আর্থিক ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য হইয়াছে। আর্থিক ব্যাখ্যা, যদি অগ্রাহ্য হয়, ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়, তবে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী মতও অগ্রাহ্য ও ভ্রান্ত প্রমাণ হয়। অর্থাৎ সম্পত্তি হইতে রাষ্ট্রের জন্ম। এই মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া সম্পত্তি লুপ্ত হইলে রাষ্ট্রও লুপ্ত হইবে এই সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত। মার্ক্সবাদী মতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাষ্ট্র লুপ্ত হইবে। রাষ্ট্র শ্রেণী-সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত, প্রবল ধনী শ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধির জন্ম সৃষ্টি; এই জন্ম শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্র থাকা অসম্ভব। এখানে রাষ্ট্র থাকা না থাকা, উচিত বা অনুচিত প্রশ্ন নয়। রাষ্ট্র থাকিতেই পারে না।

মার্ক্সবাদের এই রাষ্ট্রতত্ত্বে দুইটি মতবাদ জড়িত আছে। প্রথমতঃ আর্থিক নিয়ন্ত্রণবাদ; দ্বিতীয়তঃ যান্ত্রিক কার্যকারণবাদ। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও তথ্যসংগ্রহে দেখা গিয়াছে যে রাষ্ট্রের সহিত অর্থনীতির এই

\* "An exclusive or undue devotion to them leads to the neglect of the other functions of the state and damages all other interests." (Bluntschli, p. 323.)

বিমুখী বন্ধন প্রমাণ হয় না। গিন্সবার্গ, হুইলর (Wheeler) ও হবহাউস যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে (“নিম্নতর জাতি” বা “Simpler Peoples” পুস্তকে) এই বন্ধন খণ্ডিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সোরোকিন (Sorokin), গোল্ডেনভাইজার, লাউয়ী প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। সম্পত্তিপ্রথা লুপ্ত হইলেও রাষ্ট্র লুপ্ত হওয়ার কারণ নাই। কারণ সম্পত্তি হইতেই রাষ্ট্রের জন্ম হয় নাই। বাস্তব ইতিহাসের সাক্ষ্যও আমাদের এই মতকে প্রমাণ করে। বাস্তব তথ্য মার্ক্সবাদকে খণ্ডন করিয়াছে। পৃথিবীতে একমাত্র রুশ দেশে ব্যক্তি-সম্পত্তি উচ্ছেদ হইয়াছে। কাষতঃ সেখানে ব্যক্তি-সম্পত্তি নাই, শ্রেণী নাই, শ্রেণীশোধন নাই। মার্ক্সবাদ অনুসারে এখানে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে বিলুপ্তির দিকে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আজ রাষ্ট্রের ক্রমবিলুপ্তির কোন সম্ভাবনাই নাই। সুদূর ভবিষ্যতেও নাই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে রাষ্ট্র ব্যক্তিসম্পত্তি হইতেই উদ্ভব হয় নাই। তাই সম্পত্তি লোপ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র-বিলুপ্তি ঘটে নাই। রাষ্ট্রীয়ই প্রমাণিত হইয়াছে যে মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব ভুল। রাষ্ট্র যে অর্থনীতির সৃষ্টি নয়, তাহা হাতে-কলমে প্রমাণ হইয়াছে। এঙ্গেলসও ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, শ্রেণীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের পতনও অবশ্যস্বাভাবী। শ্রেণীলোপও অনিবার্য, তাই রাষ্ট্র-লুপ্তিও অনিবার্য। \*

এঙ্গেলসের এই ভবিষ্যৎবাণী রাষ্ট্রীয়ই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মার্ক্সবাদী হয়ত বলিবেন যে, এখনো অন্তর্বর্তী (Transition) অবস্থা চলিয়াছে; একদা ভবিষ্যতে রাষ্ট্র লুপ্ত হইবে এবং উৎপাদন সংঘ (‘Association of

\* “They (classes) will fall as inevitably as they once arose. The state inevitably falls with them.” (Engels, 221.)

producers') রাষ্ট্রের স্থান দখল করিয়া সমাজ-ব্যবস্থাকে চালাইবে। অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা উঠাইয়া লাভ নাই। বাস্তব বিচারে সূদূর ভবিষ্যতে এই কাল্পনিক অবস্থার উদ্ভবের কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। জল্পনার আশ্রয় লইয়া বিজ্ঞান ও বাস্তবকে এড়ান সম্ভব নয়।

বহুবাদী রাষ্ট্রব্যাপ্যাই বিজ্ঞানসম্মত। রাষ্ট্রের উৎপত্তির কোন একটি মাত্র কারণে হয় নাই। রাষ্ট্রের সামাজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রও শুধু একটি মাত্র নয়। রাষ্ট্রের দুইমুখী ক্রিয়াকারিত্ব। প্রথম, সমাজের সকল শক্তির পোষণ ও রক্ষা। দ্বিতীয়, সামাজিক শক্তিগুলির বিকাশসাধন।†

এই দ্বিবিধ ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিলেই পাইব বহুমুখী ক্রিয়া। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের সম্ভাবনাকে মুক্তি দেয় রাষ্ট্র। বিকাশের পথকে সহজ করে বিকাশকে সম্ভব করে। রাষ্ট্র সহায়ক এবং নিমিত্ত। কাজেই কোন একদিকের ক্রিয়া খর্ব কিংবা লুপ্ত হইলেও রাষ্ট্রের লুপ্ত হইবার কারণ ঘটে না। বহু সম্বন্ধের মধ্যে একটি সম্বন্ধ ব্যাহত হইলে সর্বাঙ্গীন জীবনের সামঞ্জস্যে ব্যাঘাত বা চাঞ্চল্য ঘটে। কিন্তু সর্বাঙ্গীন জীবন লুপ্ত হয় না। সম্পত্তি-প্রথাও জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। সম্পত্তি লুপ্ত হইলে নিশ্চয় তাহার প্রভাব গোটা সমাজ-জীবনে পড়িবে। কিন্তু সে প্রভাবের অর্থ গোটা সমাজ-জীবনের বিলুপ্তি বা রাষ্ট্র বা পরিবারের বিনষ্টি নহে। পূর্বোল্লিখিত ওয়ার্ড, হবহাউস, কোল, সোরোকিন, লাউয়ী, গোল্ডেনভাইজার, ম্যালিনাভস্কী, ওয়েষ্টারমার্ক, গিন্সবার্গ, টয়েনবী প্রমুখ আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদগণ কেহই রাষ্ট্রের

---

† “Thus the state has a double function. Firstly, the maintenance of the national powers; and secondly, their development.” (Bluntschli, p. 321.)

বিলুপ্তিবাদ স্বীকার করেন না। কারণ তাঁহারা রাষ্ট্রের বহুমুখী সার্থকতা স্বীকার করেন এবং তাই বহুবাদী ব্যাখ্যাও স্বীকার করেন।

তারপরে মার্ক্সবাদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধকেও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছে। এই মতে রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেবল ব্যক্তিকে ও শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখিবার জন্ত। পুলিশ, সৈন্য, বিচারালয় এই সব রাষ্ট্রের প্রতীক। এগুলি সবই ব্যক্তিসম্পত্তি ও শ্রেণীকে রক্ষা করার জন্ত আছে। কাজেই ভবিষ্যৎ সমাজে পুলিশ ইত্যাদি সহ রাষ্ট্র লুপ্ত হইবে। মানুষ এই মতে পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি। কাজেই ব্যক্তিসম্পত্তি উচ্ছেদ হইলে আর্থিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইবে। তাহার ফলে মানুষও বদলাইবে। অর্থাৎ মানুষের মনে লোভ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা থাকিবে না। মানুষ সামাজিক ধর্ম সততার সহিত পালন করিবে। প্রত্যেক মানুষের গ্রায্য শ্রমফল ও দরকারী জীবিকাদ্রব্য সুলভ হইবে। ফলে নূতন মানুষ চুরি করিবে না, ফাঁকি দিবে না। সমাজধর্মের তাকিদেই সামাজিক কর্তব্য করিবে। এক কথায় মানুষের মনোধর্ম ও মনোবৃত্তিই রূপান্তরিত হইবে।

এই মার্ক্সবাদী সমাজতত্ত্বের মূল রহিয়াছে পরিবেশ-বাদ ও নিয়ন্ত্রণ-বাদ। পরিবেশবাদীর মতে, মানুষ পরিবেশের পুতুল। পরিবেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এখানে বক্তব্য এই যে এই পরিবেশবাদ (ও নিয়ন্ত্রণবাদ) সমাজবিজ্ঞান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মনোধর্ম কেবলি পরিবেশের সৃষ্টি নয়। বিজ্ঞানের বহুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের মনোবিকর্তনের বহুবাদী ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। বহু শক্তির ও কারণের সমবেত ঘাতপ্রতিঘাতে মনোবৃত্তিগুলি বা মানুষের অধিমানস গড়িয়া ওঠে। জৈবিক ও মানসিক কারণও রহিয়াছে। কেবল বহির্জগতের বাহ্য পরিবেশই (external environment) সবটুকু নয়। আধুনিক আচরণবাদ (behaviourism) মানুষের সকল আচরণকেই বাহ্য পরিবেশের সৃষ্টি বলে। মার্ক্সবাদ যদিও

আচরণবাদ ( ওয়াটসন-প্রবর্তিত ) সম্পূর্ণ গ্রহণ করেনা বলিয়া বলে তবুও মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের আধিক নিয়ন্ত্রণবাদ ( economic determinism ) আচরণবাদেরই রকমফের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের মন নূতন সমাজতত্ত্বী সমাজে একমাত্র সম্পত্তিবদ্ধিত বলিয়াই কি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইবে? মার্ক্সবাদ তাই বলে।

কিন্তু এই পরিবেশবাদ অণুকার সমাজবিজ্ঞান গ্রহণ করে নাই। পরিবেশ যতই কেন সুন্দর হোক, ত্রায়-সঙ্গত হোক, মানুষের মনস্তত্ত্বে সমাজ-বিরোধী ( anti-social ) উপাদান থাকিয়াই যাইবে এবং সমাজেও অসামাজিক, বেয়াড়া ধরনের ব্যক্তি থাকিবে। মানুষ যতই সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশের প্রভাবে থাকুক না কেন, পরিবেশ-বিরোধী রুত্তিও মানুষের মধ্যে থাকিবে। এই সব সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিদের উপর বল প্রয়োগের প্রয়োজনও থাকিয়া যাইবে। কেবল অর্থনৈতিক কারণে ও সম্পত্তিবোধ হইতেই অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি হয় ও সামাজিক অপরাধ ঘটে, অপরাধ-বিজ্ঞানও আজিকাল একথা স্বীকার করে না। আধুনিক প্রজননবিদ্যাও ( genetics ) মানবচরিত্রের ষোলআনা নিয়ন্ত্রণের কথা স্বীকার করে না। সমাজ-পরিবেশের পরিবর্তন দ্বারা নিশ্চয়ই ব্যক্তি-মন ও ব্যক্তিকার্যকে খানিকটা প্রভাবিত করা চলে। কিন্তু ষোলআনা প্রভাবিত করা চলে না! একথা বিজ্ঞানই বলে। কাজেই একদা বল-প্রয়োগের প্রয়োজন ফুরাইবে, শ্রেণীহীন সমাজে দাবাইয়া রাখিবার প্রয়োজন ( coercion ) থাকিবে না, এই মার্ক্সবাদী মতবাদ কাল্পনিক ও মনস্তত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের বিরোধী। সমাজের একটা অংশ, কিছু ব্যক্তি থাকিবে যাদের শাসনের প্রয়োজন থাকিবে—এই কারণেও রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকিবে এবং রাষ্ট্রও বিদ্যমান থাকিবে। এদিক হইতেও মার্ক্সবাদ ভ্রান্ত।

তারপরে রাষ্ট্রের মূলে কেবল বলপ্রয়োগ (force) বা শাসনই একমাত্র শক্তি নয়। সমাজে বহু শ্রেণীভাগ থাকিবেই—সম্পত্তিকে কেন্দ্র করিয়া না হইলেও অগ্ৰাণ্য বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া থাকিবে। স্বার্থবোধ নানা বৃত্তির মারফৎ কার্যকরী হইবে। বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাও রাষ্ট্রের একটি কাজ। তাছাড়া সমাজমঙ্গলের নানা ব্যবস্থারও রাষ্ট্র দায়িত্ব নিতে পারিবে। বহুবিধ ক্রিয়ার মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের সার্থকতা সমাজতন্ত্রী সমাজেও বজায় থাকিবে বহুবাদী ব্যাখ্যা তাই বলে।

কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রের রূপ বদল হইবে না তাহা নয়। বিভিন্ন দিকের পরিবর্তনের—তথা সম্পত্তিপ্রথার উচ্ছেদের—প্রভাবে রাষ্ট্রেরও রূপান্তর হইবে নূতন সমাজে—কিন্তু ধ্বংস বা বিলুপ্তি নয়। সমাজতন্ত্রের অর্থ গণতন্ত্র, আর্থিক গণতন্ত্র। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রও অদৃশ্যকার ভূমি গণতন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে, বহুবাদী চিদ-ভৌতিক ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক নির্দেশই এই। রাষ্ট্রের বিলুপ্তি নয়, রূপান্তর—এই হইল নব-সমাজবিজ্ঞানের কথা। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও মার্ক্সবাদী সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও একপেশে।





## সপ্তম অধ্যায়

### মাক্সবাদী ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা

#### ধর্মের উৎপত্তি

(ক) মাক্সবাদের ভিত্তি জড়বাদ, জড়াতীত কোন মত্বা স্বীকার ইহা করে না। কাজেই 'ধর্ম' বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্থান মাক্সবাদী ভবিষ্যৎ সমাজে নাই, কারণ ধর্ম এই মতে, মিথ্যা কল্পনা এবং দাস্ত বুদ্ধির সৃষ্টি। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা অনুসারে ধর্ম জড় পরিবেশেরই সৃষ্টি। জড়পরিবেশ বলিতে প্রথম আদিযুগে প্রাকৃতিক পরিবেশই প্রধানতঃ ইহারা বুঝাইতে চান। সঙ্গে আর্থিক পরিবেশও আছে। ক্রমে আর্থিক পরিবেশই প্রবল হইয়া ধর্মের রূপ কেবল আর্থিক ব্যবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে আরম্ভ করিল। কোনো চৈতন্য শক্তিই বিশ্বজগতের পিছনে নাই, কাজেই চিৎশক্তির সঞ্চিত মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন বা ধর্মের কোন বাস্তব ভিত্তিই নাই। এঙ্গেল্‌স্‌ বলেন, "যে সব বাহ্যশক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহারই আচ্ছাদিত প্রতিচ্ছায়া মানুষের মনের উপরে পতিত হয়; এই ছায়াই ধর্ম এবং এর মধ্যে পার্থক্য পরিবেশ বা শক্তিগুলি দৈবিক শক্তির রূপ লইয়া দেখা দেয়।"\*

\* "All religion, however, is nothing but the fantastic reflection in men's minds of those external forces which control their daily life, reflection in which the terrestrial forces assume the form of supernatural forces." (Anti-Duehring p. 300.)

আদিকালে গোষ্ঠীসমাজ (Gentile) ছিল সমাজের রূপ। সমাজে অর্থব্যবস্থা অতি নিম্নস্তরের ছিল। তাই প্রকৃতির বিরাট দুর্বোধ্যতা সম্মুখে এই কালের মানুষ আত্মবিহ্বল দাসত্বের মনোভাব লইয়া দাঁড়াইত। এবং এই প্রকৃতির দাসত্বের প্রতিফলন পাই তাহার ধর্মসম্বন্ধে শিশুমূলভ ধারণাগুলির মধ্যে \* একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে গোষ্ঠী উপজাতি ও তাহার অর্থব্যবস্থা, এই সবার দুর্বোধ্যতা থেকে আত্মবিহ্বল এবং তার থেকে ধর্মভাব উৎপন্ন হইয়াছে। “আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে মানুষ এমন ভাবে তার নিজের সৃষ্ট আর্থিক পরিবেশের দ্বারা উৎপাদন-যন্ত্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, যেন আর্থিক পরিবেশ একটা বাহিরের শক্তি।”† অর্থনৈতিক পরিবেশ বা উৎপাদন-ব্যবস্থা একটা বহিঃশক্তির মত মানুষকে প্রভাব করে। এই বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণে মানুষ আত্মবিস্মৃত ও অভিভূত হইয়া পড়ে এবং এই ভয়মিশ্রিত আত্মবিস্মৃতি ও আত্মসমর্পণ হইতেই ধর্মভাব সৃষ্টি হইয়াছে। আর্থিক ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রী মানুষ যখন আয়ত্তে

---

\* “The gentile constitution.....presupposed an extremely undeveloped state of production,..... man’s attitude to nature was therefore one of almost complete subjection to a strange incomprehensible power, as is reflected in his childish religious conceptions.” (Origin of Family p. 119.)

† “in existing bourgeois society, men are dominated by the economic conditions created by themselves, by the means of production which they themselves have produced, as if by an extraneous force.”

আনিয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় চালাইবে তখনই ভয়মুক্ত মানুষ ধর্মভাব হইতেও মুক্ত হইবে। ইহাই ধর্মের জড়বাদী ও আর্থিক ব্যাখ্যা।

এ-সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান ইতিহাসের জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যাকে বর্জন করিয়াছে।

সুতরাং ধর্মতত্ত্বেরও এই জড়বাদী ব্যাখ্যা বর্জিত। জড়বাদ আজ বিজ্ঞান কর্তৃক পরিত্যক্ত। তাই জড়বাদ যাহার ভিত্তি সেই মতবাদ সমাজ-ব্যাখ্যায় বা জীবন-ব্যাখ্যায় গ্রহীতব্য হইতে পারে না। বহুবাদী ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পণ্ডিতেরা বলেন, ধর্মেরও মূলে বহুবিধ শক্তি কাজ করিয়াছে। কোন একটা মাত্র শক্তির দ্বারা ধর্মকে ব্যাখ্যা করা চলে না, করিলে তাহা একদেশদর্শী হইতে বাধ্য। ধর্ম কোন-না-কোন আকারে মানব-সমাজে চিরকাল বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর সবচাইতে পুরাতন এবং ব্যাপক প্রথা ও সমাজ প্রতিষ্ঠান হইল ধর্ম। ইহার প্রভাব কেবল ঐতিহাসিক জাতিগুলি নয়, অসভ্য আদিম জাতিগুলির জীবনেও অতি শক্তিশালী এবং গভীর। এই রকম সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কেবল একটা মিথ্যা এবং নিছক ভ্রান্তির উপর বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। এই প্রথাকে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেই বিচারেই আজ সাব্যস্ত হইয়াছে যে ধর্ম সমাজের অতি-প্রয়োজনীয় একটা শাস্ত প্রতিষ্ঠান। মানব-প্রকৃতির গভীর মূলদেশে ইহার শিকড় রহিয়াছে এবং বহুল সার্থকতা ও প্রয়োজনের তাকিদেই মানব-জাতির সঙ্গে সঙ্গে ইহা চিরকাল আছে। তাই সমাজবিজ্ঞান বলে যে, এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান মিথ্যার উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।†

† “In reality, it is inadmissible that systems of ideas like religions which have held so considerable place in history and to which, in all times, men have

বিখ্যাত সমাজবিৎ দুর্খাইম্ ( Durkheim ) ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আধুনিক নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব এ-সম্বন্ধে বহু ভণ্ডসংগ্রহ ও বিচার করিয়া এই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে।

ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী মতবাদ পরিবেশকে দায়ী করিয়াছে। কিন্তু মানুষী দিক্টাকে নজরে আনে নাই। অর্থাৎ মানুষের জীবনেরও যে বহু দিকের বহু মৌলিক প্রয়োজন এবং বৃত্তি ধর্মসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে। কেবল মাত্র এক আর্থিক দিক ও প্রয়োজন-কেই একছত্র প্রভুত্ব দান করিয়া ধর্মকেও আর্থিক ব্যাখ্যার মধ্যদিয়াই দেখিয়াছে। মানুষের মনেরও একটা বৃত্তিকেই ধর্মের উৎপত্তি ব্যাপারে দায়ী করিয়া মার্ক্সবাদ চূড়ান্ত একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। এই বৃত্তি হইল, ভয়। লেনিনের ভাষায়, “ভয়ই দেবদেবীদের সৃষ্টি করিয়াছে।—ক্যাপিটাল বা মূলধনের অন্ধ শক্তিগুলির ভয়। অন্ধ শক্তি বলিতেছি, কারণ পুঁজিবাদীর এই মূলধনের ক্রিয়া জনসাধারণের বুদ্ধিতে আসে না। এই পুঁজির শক্তি প্রতি পদে পদে মজুরের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ধ্বংস সূচিত করে।... এই হইল এযুগের ধর্মের উৎস বা শিকড়।”† মানুষী বৃত্তির মধ্যে কেবল

come to receive the energy which they must have to live, should be made up of a tissue of illusions.” (Durkheim. p 70.)

‡ “Fear created the gods. Fear of the blind forces of capital, blind because its action cannot be foreseen by the masses, a force which at any step threatens the worker,.....with sudden, unexpected ‘accidental’ destruction.....this is the tap-root of modern religion.” (Lenin on Religion.)

ভয় এবং পরিবেশের মধ্যেও কেবলমাত্র আর্থিক শক্তিকেই ম্যাক্সবাদের ধর্মোৎপত্তির উৎস বা কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

(খ) আধুনিক বিচারে এই মত একপেশে। সমাজতন্ত্র ধর্মকে বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়াছে। এই বিচারের ফলে ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব মতবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক্। প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে এই সব মতবাদকে ভাগ করা চলে। একদল ধর্মকে প্রকৃতি-পূজা (nature worship) হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন এবং অণুদল কুটায়্যা পূজা বা প্রেতপূজা (animism) হইতে ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ধর্মের এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ প্রকৃতিবাদ (Naturism) প্রতিষ্ঠা করেন ম্যাক্সমুলার। বেদ আবিষ্কার করার পরেই এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৫৬ সালে ম্যাক্সমুলার তাঁর বই 'অক্সফোর্ড রচনাবলি' লেখেন। ম্যাক্সমুলারের মতে বিরাট গম্ভীর প্রকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানুষের মনে আসিয়াছিল বিশ্বয়, ভয় এবং অনন্তের আভাস। সেই মনোভাব থেকেই একটা গম্ভীর অনুভূতি তাহাকে 'ধর্মে'র অনুভূতি আনিয়া দেয়। ম্যাক্সমুলার প্রকৃতির সহিত মানব-মনের সংস্পর্শ হইতে এবং সংস্পর্শজনিত অধ্যাত্মানুভূতি হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ম্যাক্সমুলার প্রকৃতিবাদী এবং সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্ববাদী (Psychological) ব্যাখ্যাই দিয়াছেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নেতা ও স্থাপয়িতা টাইলর (Tylor) এবং স্পেন্সার (Spencer)। টাইলর তাঁহার 'আদিম সংস্কৃতি' (Primitive Culture), নামক বই ১৮৭১ সনে লেখেন। এই বইয়ে তাঁর বিখ্যাত মতবাদ 'কুটায়্যবাদ' (Animism) তিনি প্রথম প্রচার করেন। এই মতেয় মূল কথা এই যে, আদিম মানুষ প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তুতে মানুষেরই

মত চেতনা এবং একটি করিয়া কূটস্থ 'আত্মা' আরোপ করিয়া সব প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করিয়াছে। নির্ব্যক্তিক কোন কারণের বা শক্তির ধারণা তাহার ছিল না। নিজের দৃষ্টান্তে মানুষেরই মত সব কিছুকেই সচেতন মনে করিয়া প্রত্যেক বস্তুরই আত্মা ( Spirit ) আছে কল্পনা করিয়াছিল। এই সব অগণিত আত্মা এবং প্রেতাত্মা চারিদিক পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। ইহারা মানুষেরই মত সুখঃখ ক্রোধ হিংসা পূর্ণ, তাই ভুষ্ট রাখা প্রয়োজন। ইহা হইতেই পূজাপার্বন, তুকতাক, ইত্যাদি ধর্মানুষ্ঠান আসিল। টাইলরের মতে এই প্রেতাত্মা বা কূটাত্মার পূজা ( Animism ) হইতেই প্রকৃতি-পূজা ( Nature worship ) আসিয়াছে।

স্পেন্সার ১৮৭৬ সনে তাঁহার "সমাজতত্ত্বের মূলনীতি" \* প্রকাশ করেন। স্পেন্সার যদিও টাইলরের কূটাত্মাবাদকে অস্বীকার করেন নাই, তবুও তিনি নিজে একটা পৃথক মতবাদ যোগ করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদকে 'প্রেতাত্মা-পূজা' ( ghost worship ) বা 'পিতৃপূজা' ( ancestor-worship )ও বলা চলে। তাঁর মতে, ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে মৃত পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার ভয় ( fear ) থেকে। অসভ্য মানুষ স্বপ্ন, নিদ্রা, ছায়া, মুচ্ছা, মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা থেকে আত্মার ধারণা করিয়াছে। ( টাইলর প্রেতপূজার কথা বলিলেও এতটা প্রাধান্য দেন নাই। ) মৃত্যুর পরে আত্মা জীবিত থাকে এবং মৃত পিতৃপুরুষের ভয় তখনো বজায় থাকে। জীবিত পিতৃপুরুষকে যেমন ভেমনি, মৃত পুরুষকেও ভুষ্ট করা চাই। এইভাবে আসিল মৃতের উদ্দেশে তুকতাক ও নানা অনুষ্ঠান। টাইলরের সাথে স্পেন্সারের মত পার্থক্য আছে। স্পেন্সারের মতে, নদ-নদী, গাছপালা, পর্বত সব কিছুই অধিষ্ঠাত্রী প্রেতাত্মা কোন পূর্বপিতৃপুরুষের

প্রেতাত্মা। সুতরাং পিতৃপুরুষের (Ancestor-Ghost worship) প্রেতপূজা থেকেই প্রকৃতি পূজা আসিয়াছে।

টাইলর এবং স্পেন্সার দুইয়েরই মতবাদ একদেশদশী এবং অবাস্তব বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। আদিম জাতি সকলেই টাইলর-কথিত কূটাত্মবাদী নয়। অনেক জাতি পাওয়া যাইতেছে যাহাদের ধর্মে প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুকেই অধিষ্ঠাতা একটা আত্মার আবাস বলিয়া মনে করা হয় না। তাছাড়া কূটাত্মবাদ আদিমতম ধর্মমত বলিয়াও আজ স্বীকৃতি পায় না। যথা ম্যারেট (Marett) নামক বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ করিয়াছেন যে টাইলরের মত ভ্রান্ত। কূটাত্মবাদের থেকে বিভিন্ন এক ধরনের ধর্মবিশ্বাস আদিম জাতিতে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ধর্মবিশ্বাসকে ম্যারেট নাম দিয়াছেন 'সর্বপ্রাণবাদ' ('Animatism')। সর্বপ্রাণবাদ মানে এই যে প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে অপ্রাকৃত শক্তি বা গুঢ় অনুস্থ্যত একটা প্রাণময়তা রহিয়াছে। কিন্তু এই শক্তি কোন spirit বা ব্যক্তিত্বশীল আত্মা নয়। একটা একাকার প্রাণময় শক্তি প্রত্যেক বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপক শক্তিকে অসভ্যরা পূজা করে। ম্যারেটের মতের দ্বারা টাইলরের মতবাদ ধর্মের একমাত্র ব্যাখ্যা হিসাবে অগ্রহণীয় হইয়া পড়িয়াছে। দুর্খাইম (Durkheim) এই কূটাত্মবাদ এবং প্রেতবাদ (Ghost Theory) বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। দুর্খাইম যুক্তি বিচারের বিরোধী বলিয়া এই টাইলর-স্পেন্সার মতবাদকে প্রমাণ করিয়াছেন : তা ছাড়া, পিতৃপূজা অনেক জাতিতেই নাই, অথচ সেখানে ধর্ম আছে।

দুর্খাইম ধর্মোৎপত্তির অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁর মতে সমাজ-পরিবেশের সার্বিক প্রভাব মানুষকে অভিভূত করে। আদিম

মানুষও তার চতুঃপার্শ্ববর্তী বিরাট সমাজ-দেহের সম্মুখে দাঁড়াইয় প্রভাবিত হইত। এই প্রভাবই রূপ নিয়াছে আদিম মানুষের টোটেম পূজায় (Totemism)। কোন প্রাণী বা বস্তুকে পূজা করাকেই টোটেমবাদ বলে। বুণ্ডট (Wundt)ও টোটেম হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। টোটেমের সাহিত গোষ্ঠী-প্রথার নিকট ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে এবং গোষ্ঠীকে (clan-gens) যেমন ইতিহাসের একটা অনিব্যস্ত স্তর মনে করা হইত তেমনি কিছুদিন আগে পর্যন্তও টোটেমবাদকে একটা সার্বজনীন ঐতিহাসিক স্তর বলিয়া অনেকে মনে করিতেন। বুণ্ডট, ছুরখীম প্রভৃতিদের এই সার্বিক টোটেমবাদ আজ নূতন গবেষণায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। লাউয়া, গোল্ডেন-ভাইজার প্রমুখ নবসমাজ-বিজ্ঞানীরা গোষ্ঠী-প্রথাকে পরবর্তী কালের একটা স্তর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। টোটেমবাদ আজ আদিমতম ধর্মবিশ্বাস বলিয়া গৃহীত হয় না। অনেক জাতিতে গোষ্ঠীপ্রথার উদ্ভবই হয় নাই। তাই গোল্ডেনভাইজার বলেন, গোষ্ঠীযুগ বাতিল হইয়া যাওয়ায় সার্বজনীন টোটেম যুগও বাতিল হইয়া গিয়াছে।† কাজেই ধর্মের টোটেমবাদী ব্যাখ্যা অচল।

ধর্মকে ফ্রেজার (Frazer) ম্যাজিক বা ষাডুবিদ্যা থেকে উদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আদিম যুগে ধর্ম ছিল না, ষাডুবিদ্যা ছিল। প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে নিজের বিপদ-আপদে আত্মরক্ষায় ব্যবহার করিবার প্রথাকেই ষাডুবিদ্যা বলা চলে। ক্রমে ষাডুবিদ্যার বার্থতা দেখিয়া মানুষ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিরাশ হইল এবং প্রকৃতির মধ্যে উচ্চতর

† “The rejection of the clan-gens era necessarily led to the abandonment of the theory of an universal totemic age.” (Political Thesis, p. 443.)



( Frazer, p. 53 )

‡ Ancient magic was the very foundation of religion

ଆଦିକାର (Adler) ଏବଂ (Jung) ଭଦ୍ରା ମନୋସାଧନ କର୍ତ୍ତାମାନେ ।  
ସାମାଜିକ ସାଧନା କର୍ତ୍ତାମାନେ ଭଦ୍ରା ମନୋସାଧନ କର୍ତ୍ତାମାନେ ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।

ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।

ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।

ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।  
ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର ରହିଛି ।

করিতেছে ; সমষ্টি-চেতনার অজ্ঞাত সমুদ্র হইতেও প্রভাব আসিয়া নির্দিষ্ট খাতে মনোলোককে রূপায়িত করিতেছে। ফ্রয়েড কেবল ভাবাবেগকেই নিয়ন্ত্রক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বুদ্ধিবৃত্তিরও জীবনে প্রভাব রহিয়াছে তাহাকে ফ্রয়েড স্বীকার করেন নাই। তাহা ছাড়া ফ্রয়েডের সম্পূর্ণ মতবাদটাই ম্যাকডুগাল ও ওয়েষ্টারমার্ক প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকেরা নানা যৌক্তিক ক্রটি দেখাইয়া একপেশে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

মার্ক্সের আর্থিক ব্যাখ্যাও এইসব বিবিধ ব্যাখ্যার মধ্যে অগ্রতম। ধর্মের সহিত অর্থনীতির কারণিক (causal) বন্ধন এবং অনড় নিয়ন্ত্রণবাদ আজকাল বিজ্ঞান স্বীকার করে না। ইহা পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে। বাস্তব জগতেও ক্ষেত্র-গবেষণায় এই অকাটা কারণিক সম্বন্ধ প্রমাণ হয় নাই। হব-হাউস-ভাইলার-গিন্সবার্গ কর্তৃক লিখিত বিখ্যাত গবেষণা পুস্তকে দেখা গিয়াছে, ধর্মের সহিত অর্থনীতির যান্ত্রিক বন্ধন অসভ্য সমাজে দেখা যায় না। অর্থনীতির প্রভাব ধর্মের উপর আছে ইহা সত্য। কিন্তু ধর্মের উপরও অর্থনীতির প্রভাব রহিয়াছে। সম্পর্কটা পারস্পরিক। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সর্বদাই বিদ্যমান। ধর্মও যে অর্থনীতিকে কতখানি প্রভাব করিয়াছে, রূপায়িত করিয়াছে, তাহা ম্যাক্সাওয়েয়ার, বেঞ্জামিন কিড, ছুরখাম প্রমুখ অসংখ্য সমাজতত্ত্ববিদ প্রমাণ করিয়াছেন। আদিম কালে ধর্মের প্রভাব আবার বেশী ছিল। প্রাচীন ও মধ্যকালেও ধর্ম জীবনের সব দিকেই রূপ দিয়াছে। আধুনিক কালেই বরং ধর্মের প্রভাব কম। কিন্তু এখনো পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্রের অর্থনীতি সমাজনীতি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ধর্মশাস্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম হইতেই রাষ্ট্র-অর্থনীতি উৎপন্ন হইয়াছে, ধর্মবাদীদের এ দাবিও ভিত্তিহীন। আসলে ধর্মের রূপায়নেও অগ্রাগ্র সমাজ শক্তিগুলির (অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনকানুন, যৌনবৃত্তি শক্তিকাম প্রভৃতি

মনাবৃত্তি, ভূগোল, বংশপ্রভাব ইত্যাদি) দান রহিয়াছে। ধর্মের উৎপত্তিরও জড়বাদী ব্যাখ্যাই সম্ভব।

অথচ মার্ক্সবাদীরা কেবল অর্থনীতি বা সম্পত্তির সহিতই ধর্মের কারণিক সম্পর্ক টানিয়াছেন। ইহাদের কারণিকতাবাদ বা causality সম্পর্কে ধারণাও যান্ত্রিক। এঙ্গেলস্ এবং মার্ক্স যান্ত্রিক জড়বাদকে নিন্দা করিয়াও শেষে নিজেদের মতবাদকেও যান্ত্রিকতায় পরিণত করিয়াছেন। সমাজক্ষেত্রেও ইহারা প্রাকৃতিক জগতের নিয়মাবলীর মতনই অব্যর্থ ও অমোঘ কার্য-কারণ-নিয়মাবলী রহিয়াছে বলিয়া বলিয়াছেন।\* প্রকৃতি ও সমাজ, এই দুই ক্ষেত্রে একই ধরনের কারণিকতা ক্রিয়াশীল বলিয়া যাহারা বলেন, তাহারা যান্ত্রিকতাবাদী বই আর কী? সমাজবিজ্ঞান এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্জন করিয়াছে। তাই ধর্মব্যাখ্যায়ও অর্থনীতির (বা সম্পত্তি-প্রথার)

মোঘ কর্তৃত্বকে সমাজতত্ত্ব স্বীকার করে না। এদিক দিয়া মার্ক্সবাদী ধর্মব্যাখ্যাও ভ্রান্তিপূর্ণ।

মার্ক্সবাদ অর্থনীতির সহিত ধর্মের সম্পর্ক টানিয়া বলে, যে উৎপাদন-শক্তি গোষ্ঠীসমাজে নিয়ন্ত্রণের ছিল, কারণ প্রকৃতিকে তারা জানিত না, ও প্রকৃতিকে মানুষের কাজে লাগাইতে-ও তারা পারে নাই। এই অজ্ঞাত প্রকৃতির প্রতি ভয় হইতেই প্রকৃতি-পূজা ও ধর্মের উদ্ভব হইল। প্রকৃতি ও উৎপাদন-শক্তিকে একবার বুঝিয়া ফেলিতে পারিলে প্রকৃতি ও উৎপাদন শক্তিগুলি তখন মানুষের দাস হইয়া দেখা দিবে।† তখন আর মানুষের

\* “The forces operating in society work exactly like the forces operating in Nature.”.....Anti-Duehrring, 265.)

† “Once their nature is grasped.....they can be transformed from demoniac masters into willing servants.”)

প্রকৃতি সম্বন্ধে কিংবা উৎপাদন-শক্তি সম্বন্ধে কোন ভয় বিস্ময় থাকিবে না। তাই তখন ধর্মও থাকিবে না। দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদন-ব্যবস্থা শ্রমিকের হাতে না আসা পর্যন্ত বিপুল উৎপাদন-ব্যবস্থার কর্তৃত্বে ও অধীনে বাস করিয়া শ্রমিকের মনে ভয়জনিত ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মবৃত্তি অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। উৎপাদন-ব্যবস্থাও বাহিরের একটা ছুজ্জের প্রবল শক্তিরূপে শ্রমিক বা সাধারণ মানুষের কাছে একটা ভয়ের বস্তু। এই যুক্তিতে পূঁজিবাদীদের তো ধর্মবৃত্তি থাকাই চলে না। পূঁজিবাদীরাই প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের শক্তি দ্বারা দাসে পরিণত করিয়াছে, আয়ত্তে আনিয়াছে। কাজেই পূঁজিবাদী সমাজে ধর্ম লুপ্ত হওয়াই উচিত। কিন্তু পূঁজিবাদী সমাজই, মার্ক্সবাদী মতে, ধর্মের পাঠভূমি। ধর্মের উৎপত্তির এই মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা ভাঙিয়া পড়ে একথাও বলা চলে যে প্রকৃতিকে মানুষ কোনোদিনই সম্পূর্ণ জানিবে না। (একথা এঙ্গেলস্ স্বীকার করেন) যতই বিজ্ঞান অগ্রসর হোক একদিন প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান শেষ হইয়া যাইবে, একথা অস্বীকার্য। কাজেই এই যুক্তিতে, তাহা হইলে, চিরদিনই মানুষের মনে অজ্ঞাত প্রকৃতির প্রতি ভয় থাকিবে এবং ধর্মও থাকিবে।

মার্ক্সবাদী হয়ত বলিবেন যে, তা নয়, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ধর্মের পিছনে থাকে বলিয়াই ধর্ম অর্থের সৃষ্টি। এখানে মার্ক্সবাদ স্পষ্ট নয়। উদ্দেশ্য দ্বারাই যদি প্রতিষ্ঠানকে বিচার করিতে হয় তবে আদিমকালের মানুষ প্রকৃতির ভয় থেকে ধর্মবোধ লাভ করিল কী করিয়া? আদিম মানুষ যে স্বার্থসিদ্ধির ও আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মকে সৃষ্টি করে নাই, তাহা তো এঙ্গেলসের ও লেনিনের উক্তি হইতেই দেখা যাইতেছে আর যদি বলা হয় যে, ধর্মকে আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তবে আদিম ধর্ম সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য নয়। পরবর্তীকালে, ধর্মের অপব্যবহার হইয়াছে, যেমন প্রত্যেক প্রথারই হইয়া থাকে

আর্থিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে অপব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া ধর্মের উৎপত্তিও আর্থিক কারণে ঘটিয়াছে বলা অযৌক্তিক। এই কারণে মাক্সবাদী আর্থিক ব্যাখ্যা ধর্মের বেলায় মোটেও খাটে না। বাস্তব তথ্যেও আর্থিক ব্যাখ্যা সীমিত হয়। আদিম ধর্ম ম্যাজিক প্রভৃতি নানা মনোভাবের সহিত জড়িত হইয়াছে। কিন্তু তার সহিত অর্থনীতির কোনো বিশিষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মাক্সবাদী ব্যাখ্যার মতে আদিম কালেও ধর্মের মধ্যে অর্থনীতিরও সম্পর্ক ছিল। কারণ ধর্ম প্রধানতঃ মনোলোকের ব্যাপার হইলেও বহু জীবনের ভাবও তাহার মধ্যে মিশ্রিত থাকে। বহু বুদ্ধি ও শক্তির সমবেত ফলই ধর্ম।

এঙ্গেলস-লেনিন কার্যতঃ 'ভয়' হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রকৃতির ভয় এবং বিপুল সমাজশক্তির ভয়। স্পেন্সারও প্রত-আত্মার ভয় ও পূর্বপুরুষের ভয় হইতে ধর্মকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হাইলরও সেই ধর্মপদ্ধতিতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার মতে প্রেতভয় থেকে ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ভয়ই মানুষের একমাত্র মনোবৃত্তি নয়। ধর্মের মূলে কেবল ভয়ই আছে, এমতও সম্পূর্ণ একদেশদর্শী। তুরখীম এই ভয়-বাদ (Theory of fear)কে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁর মতে ধর্ম কেবল ভয় হইতেই উৎপন্ন হয় নাই।\*

\* "The first religious conceptions have often been attributed to feelings of weakness and dependence, of fear and anguish which seized men when they came into contact with the world.....We have now shown that the first religions were of a wholly different origin.....The primitive does not regard his gods as foreigners, enemies, or thoroughly and

ধর্মের মূলে আছে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা। দৈবীশক্তির প্রতি আদি মানুষের মনোভাব বন্ধুত্বের। দৈবীশক্তিকে তারা বন্ধু বলিয়া, স্বজন বন্ধু বলিয়া মনে করে। শত্রু বা অজানা পরদেশী বা ছুষ্টবুদ্ধি বিদ্রোহ প্রবণ জীব বলিয়া কখনো ভাবে না। যারা ধর্মকে ভয়প্রসূত মনে করেন তারা একপেশে মতাবলম্বী। বার্গসন<sup>৩</sup> (Bergson) বলেন “ধর্মবিশ্বাস বলিতে বুঝিতে হইবে মূলতঃ বিশ্বাস, আস্থা; ধর্মের মূলে উৎস কখনো ভয় নয়, বরং ভয়ের বিরুদ্ধে আশ্বাস-বোধ। ম্যাক্সমুলারের মতে ধর্মের মূলে আছে ‘অনন্তের অনুভূতি’ (“The perception of the Infinite.”)। বলডুইনের মতে, ধর্মের মূলে আছে বিশ্বয়জনিত শ্রদ্ধাসম্মম। কিং<sup>৪</sup> (King) মতে, প্রমূল্য বোধ (Sense of value) থেকে ধর্মের উৎপত্তি। সমাজতত্ত্ববিদগণ ধর্মের উৎপত্তি নানা মনোবৃত্তি হইতে হইয়াছে বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। কোন একটি বৃত্তিই ধর্মকে ব্যাখ্যা করিতে সথেষ্ট নয়। মাক্সবাদী ব্যাখ্যাও ভয়বাদকে ভিত্তি করিয়াছে। এদিক হইতে মাক্সবাদ অসম্পূর্ণ।

(গ) ধর্মের উপরি-উক্ত সব ব্যাখ্যাই একটী মাত্র শক্তি বা বৃত্তিকে ভিত্তি করিয়া। তাই এইসব ব্যাখ্যাই অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। প্রকৃত ব্যাখ্যা হইল বহুবাদী বা চিন্তাত্তিক (Psycho-Materialist theory) ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে আদিম মানুষ প্রকৃতি, বিশ্বভুবন, মানব-সমাজ

---

necessarily malevolent beings whose favours he must acquire. Quite on the contrary, they are rather friends, kindreds or natural protectors for him.....

In fine, the sentiments at the root of Totemism are those of happy confidence rather than of terror and compassion.” (Durkheim, p. 223.)

এইসব কিছুই সম্মুখীন হইয়া নানা বিমিশ্র ভাব ও অনুভূতির বশে ধর্মকে সৃষ্টি করিয়াছে। ঐচ্ছিকভাবে, পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে নয়। মানুষ সৃজনশীল। তাই পরিবেশ-সৃষ্ট সমস্যা ও তাহার জীবন-জনিত সমস্যার সমাধান মানুষ সৃজনপর প্রতিভা ও পরিকল্পনার সাহায্যে করিয়াছে। এই সমাধানের মধ্যে 'ধর্ম' অগ্রতম। এই সমাধানে ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও মানসিক জগৎ, এই তিন জগতেরই প্রভাব ও ছাপ পড়িয়াছে। তাই ধর্মের মধ্যে প্রকৃতি, মনোবৃত্তি ও সমাজ এই তিনেরই দান রহিয়াছে।

(ঘ) ধর্ম সহজ অবিমিশ্র পদার্থ নয়। ইহা জটিল, মিশ্র পদার্থ। গোল্ডেন ভাইজার, হুরখীম, ম্যালিনাউস্কী (Malinowski), প্রমুখ সকলেই এ-সম্বন্ধে একমত। কোন একটা মাত্র ক্রিয়া করিয়াই ধর্মের সার্থকতাও শেষ হয় না। সার্থকতাও বহুমুখী। জীবনে ধর্মের দান নানা দিকে।

### ধর্মের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ

ধর্মের দানও যদি বহুমুখী হয় এবং ধর্মের উৎপত্তিও যদি বহুমুখী ও বিবিধ হয়, তবে সিদ্ধান্ত স্বভাবতই এই হয় যে ধর্মের প্রকৃতি সমাজ কল্যাণমূলক এবং ধর্মের ভবিষ্যৎও নিশ্চিত। এইখানে মার্ক্সীয় আর্থিক ব্যাখ্যার কথা আসে। মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যায় ধর্ম একটা ভ্রান্তি ও ভয় থেকে উৎপন্ন। অতএব এই কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন মিথ্যা সমাজের হানিকর এবং অমঙ্গলজনক। মার্ক্স ইহাকে “আফিম” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লেনিনও ঘোষণা করিয়াছেন, যে ধর্মকে ধ্বংস করিতেই হইবে। ধর্মের বিকল্পে তাই প্রচার চালাইতে হইবে। “মার্ক্সবাদ হইল জড়বাদ। অতএব মার্ক্সবাদ ধর্মের নির্মম শত্রু, যেমন শত্রু ছিল ১৮শ শতকের ‘আভিধানিক দল’ (Encyclopaedist).....আমাদের ধর্মকে

বিরোধিতা করিতে হইবে। এটাই হইল সব জড়বাদ—অতএব মার্ক্সবাদের কথগ। (লেনিন) \* “স্বভাবতঃই নাস্তিক্যবাদ প্রচার আমাদের প্রগ্রামের অঙ্গ।” (লেনিন) † মার্ক্সবাদীকে জড়বাদী অর্থাৎ ধর্মের শত্রু হইতেই হইবে। ‡ লেনিন প্রমুখ মার্ক্সবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে তাই যুক্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু আধুনিক সমাজতন্ত্র ও মনস্তত্ত্ব কি বলে? নবসমাজবিজ্ঞান বলে, ধর্ম সমাজের ও মানুষের অপরিহার্য অঙ্গ। যতদিন মানুষ আছে ধর্মও আছে। কারণ ধর্ম সমাজের সহিত জড়িত, সমাজের কল্যাণপ্রসূ। ম্যালিনাউস্কীর (Malinowski) মতে, “ধর্ম এবং তত্ত্ববিদ্যা যতদিন মানুষের জ্ঞান ও ভাষা আছে ততদিন পৃথিবীতে আছে। আদিতে ধর্ম ছিল মূল—কুটাম্ববাদ, ম্যাজিক শক্তিতে বিশ্বাস, তুকতাক, প্রেত, টোটেম ইত্যাদি—অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের আধ্যাত্মিক সাধর্ম্য—এসব হইল জীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধানে মানুষের জবাব।” § ম্যালিনাউস্কী বহু গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। প্রত্যেক কৃষ্টিতে ধর্ম অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

\* “Marxism is Materialism. As such it is as relentlessly opposed to religion as was the materialism of the Encyclopaedists. .... We must combat Religion—this is the A B C of all Materialism and so of Marxism.” (Lenin.)

† “Our programme thus necessarily includes propoganda of atheism.” (Lenin.)

‡ “The Marxist must be a materialist i. e. an enemy of religion.” (Lenin.)

§ “Metaphysics and religions. Speculations are as old as knowledge and as old as language itself. At the



মানুষের বাঁচবার উপায় ধর্ম, জীবনে নৈতিক শক্তি হইল ধর্ম। সে ধর্মকে বাদ দিয়া কোন কৃষ্টি সম্ভব নয়। সংস্কৃতির ভিত্তিই হইল ধর্ম।\* দুর্দখীম সমাজ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতেও, সমাজ ও ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজে ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে, সমাজকে রক্ষা ও পোষণ করাই ধর্মের প্রধান সার্থকতা। ধর্ম সমষ্টি-জীবনকে গঠন করিয়াছে। নীতি-নিষেধ, সংযম, ত্যাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতি উদ্বেক করিয়া সমাজপ্রগতিকে সম্ভব করিয়াছে। †

বার্গশেঁঁ জীবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব খ্যাতিনামা পণ্ডিত। তাঁরও মতে, “সত্য কথা এই যে ধর্ম মানবজাতির সর্বত্রই বিদ্যমান এবং নিশ্চয়ই মানুষের গঠনেরই মধ্যে ধর্ম রহিয়াছে।” ‡ বার্গশেঁঁও বলেন যে ধর্মের সমাজ-রক্ষায় বহুগুণী

beginning they are extremely simple and crude. Animism, beliefs in magical force, fantasies about sorceries, ghosts, totemism—i. e. the belief in the spiritual affinity between man and nature, are the answers of primitive man to the fundamental riddles of life.” (Malinowski, Article in ‘Human affairs’.)

\* “Religion and to a lesser degree magic, thus becomes the very foundation of culture.” (Malinowski, Article in ‘Human Affairs.’)

† “If religion has given birth to all that is essential in society, it is because the idea of society is the soul of religion.” (Durkheim, p.418, Elementary forms of Religion.)

‡ “The truth is that religion being co-extensive with our species, must be an effect of our structure.” (‘Two Sources’, Bergson, p 150.)

দান রহিয়াছে। স্থানকাল অনুসারে ইহার পার্থক্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম সর্বত্রই সমাজকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।\*

কিন্তু সমাজে ধর্মের দান মার্ক্সবাদী স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে ধর্ম ভবিষ্যৎ সমাজে বিলুপ্ত হইবে, সমাজগতির অব্যর্থ নিয়মে। ধর্ম অর্থনীতির সৃষ্টি, পুঁজিবাদের সৃষ্টি। কাজেই সমাজতত্ত্বী সমাজে শ্রমিকের হাতে উৎপাদন-ব্যবস্থা আসিলে এই দুর্বোধ্য ভয়াল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রহস্য লোপ পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভয় এবং ধর্ম মানুষের মন হইতে লুপ্ত হইবে। এঙ্গেলস্ একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন; লেনিনও বলিয়াছেন, “অর্থনীতির প্রগতির ফলে ধর্ম ক্রমেই আবর্জনারূপে নিষ্কিপ্ত হইবে।”† এক কথায় ধর্ম লুপ্ত হইবে ইহাই হইল ধর্মের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। মার্ক্সবাদ অর্থনীতি হইতেই ধর্মের উৎপত্তি স্থির করিয়া স্বভাবতঃই আর্থিক কারণেই ইহার বিলুপ্তি ঘটিবে বলিয়া নির্দেশ করিবে। পুঁজিবাদ মানুষের ভয়ের কারণ। পুঁজিবাদ লুপ্ত হইলে ভয় ও ধর্ম দুইই লুপ্ত হইবে। কারণ ভয় হইতেই ধর্ম।

বহুবাদী ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আর্থিক নিয়ন্ত্রণ যে ভুল তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। economic determinism বা আর্থিক নিয়ন্ত্রণের বদলে আজি সমাজতত্ত্ব বহু শক্তির পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতকেই (functiona

---

\* “One thing is certain, that religion has always played a social role. This part indeed is a complex one.”.....ibid, Bergson, 4.)

† “Only then will the last extraneous force which is still reflected in religion, vanish, and with it will also vanish the religious reflection itself.”.....(Anti-Duehring, p 301.)

‡ “being steadily relegated to the rubbish-heap by the normal course of economic development.” (Lenin.)

interaction ) সমাজ-বিবর্তনের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই দৃষ্টিতে অর্থনীতির প্রভাব স্বীকৃত। কিন্তু তাহা পারম্পরিক প্রভাব। অর্থাৎ ব্যক্তিসম্পত্তি লুপ্ত হইলে, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটলে সমাজের জীবনে অগাণ্ঠ দিকেও তার প্রভাব পড়িবে, কারণ ব্যক্তিসম্পত্তির উচ্ছেদ সমাজে একটা প্রধান ও বৈপ্লবিক ঘটনা। এতবড় ঘটনার প্রভাব সমাজের জীবনে পড়িবেই সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রে পড়িবে, বিবাহে পড়িবে, আইন-কানুনে পড়িবে—ধর্মের উপরও পড়িবে। কিন্তু এই প্রভাবের রূপ কি? মার্ক্সবাদী বলেন, ধর্মের বিলুপ্তি; বহুবাদী নবসমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, অর্থনীতির জীবনের মাত্র একটা দিক। সে দিকের পরিবর্তনে বা বিপ্লবে, ধর্মের আর্থিক দিকে পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু ধর্ম লুপ্ত হইতে পারে না। কারণ ধর্ম মানুষের বহুবিধ বৃত্তি, প্রয়োজন ও সার্থকতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষের জীবনে গভীরতম প্রদেশে ধর্মের মূল রহিয়াছে। মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে ততদিন এই মূলের উচ্ছেদ নাই। তাই বার্গশেঁ বলিয়াছেন, আমাদের সংগঠনের মধ্যে, আমাদের সত্তারই মধ্যে ধর্মের অস্তিত্ব। বিখ্যাত সমাজবিদ্ গিডিংসের মতে, যারা কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাদের মতবাদ একদিন সমাজে প্রত্যাখ্যাত ও খণ্ডিত হইবেই। আদিম ধর্মও বহু উপাদানের সমষ্টি। বর্তমান কালের পদার্থ-বিজ্ঞানও ধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান আজ ধর্মকে সমাজকল্যাণের ধারক বলিয়া প্রচার করিতেছে। বেঞ্জামিন কিড্ ( Benjamin Kid ) বলেন, “সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অহরহ বে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে তাহার মূল প্রেরণা দান করিয়াছে ধর্ম বিশ্বাস।”\*

\* “The motive power in this struggle has undoubtedly been supplied by his religious beliefs.” (Social Evolution, p 100.)

বেঞ্জামিন কিডের মতবাদের আতিশয্য ছাড়িয়া দিলে একথা বলা চলে যে সামাজিক ক্রমবিকাশের মূলে ধর্ম একটা প্রধান শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে। ব্যক্তি-সম্পত্তির লোপ হইলেও যে ধর্মবিশ্বাস লোপ পায় না, তাহার প্রমাণ সোভিয়েট রাশ্যা। রাশ্যায় আজ ধর্ম লুপ্ত হয় নাই। রাষ্ট্রের শক্তিপ্রাবল্য ও প্রচার এবং কম্যুনিষ্ট দলের সর্বব্যাপী প্রচার ও প্রচেষ্টাও মানুষের মনকে ধর্ম হইতে বিমুক্ত করিতে পারে নাই। আসলে মার্ক্সবাদী সমাজতত্ত্ব একদেশ-দর্শী এবং তাই সামাজিক জীবনের বাস্তব বিবর্তনও এই মতবাদকে খণ্ডন করিতেছে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানও মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

---

# মাত্র-মর্গানী বিবাহ ও পরিবার- তাত্ত্ব সমালোচনা

## পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি

বিবাহ ও পরিবারের উৎপত্তি সম্বন্ধে মর্গানী মতবাদের ভিত্তি হইল আর্থিক ব্যাখ্যা। এই আর্থিক ব্যাখ্যার দুইটী অংশ। প্রথমতঃ অর্থ নৈতিক কারণে আর্থিক ব্যবস্থা হইতেই পরিবারের উদ্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিবাহ ও পরিবার একটা নির্দিষ্ট স্তরপর্যায়কে অনুসরণ করিয়া, একটা বিশিষ্ট ছকের মধ্যদিয়া ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিবাহ ও পরিবারের এই ছকটী পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশের এই আর্থিক ব্যাখ্যা আজ বিজ্ঞান কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয় বলিয়া সংক্ষেপে মূল কথা কয়টী এখানে আলোচিত হইতেছে। এই আর্থিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তিই এই যে, বিবাহ ও পরিবারের মূলে কেবল অর্থশক্তি বা economicsই ক্রিয়াশীল নয়, অগ্ৰাণু বহুবিধ শক্তিও কাজ করিতেছে। বিবাহের ও পরিবারের একবাদী ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ বলিয়া বিজ্ঞানীরা স্বীকার করিয়াছেন। বহু প্রকারের একবাদী ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে।

বিবাহ ও পরিবারের যৌনবাদী ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ফ্রয়েড প্রচলন করিয়াছেন। যৌনবৃত্তির উদ্দামতাকে আদিম মানুষ দমন করিয়াছে, শক্তিশালী ব্যক্তির ভয়ে। এই অবদমন হইতেই নরনারীর যৌনবৃত্তি একটা খাতে বহিয়াছে। তাই আদিম কাল হইতেই একবিবাহ ও পিতৃক্রম প্রচলিত রহিয়াছে।

ভৌগোলিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন বিখ্যাত সমাজবিদ লা প্লে ( La-Play ) এবং তাঁহার সম্প্রদায়। পরিবার পিতৃতন্ত্রী হইবে, একবৈবাহিক হইবে, না যৌথপরিবার হইবে তাহা ভৌগোলিক পরিস্থিতির উপরেই নির্ভর করে বলিয়া ইহারা দেখাইয়াছেন। জীবন সংগ্রামের রূপ নির্ভর করে ভৌগোলিক স্থিতির উপরে। তাহারই উপর নির্ভর করে নরনারীর সংখ্যানুপাত এবং কন্যাহত্যা প্রভৃতি সামাজিক প্রথা। ইহার উপরেই নির্ভর করে বহুপতিক ( poly-androus ) বা বহুপত্নীক বিবাহ ও পরিবার।

সামাজিক ও ধার্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন দুর্খীম। দুর্খীম (Durkheim) টোটেম প্রথা ও সামাজিক প্রথার প্রভাবকেই বিবাহ ও পরিবারের ভিত্তি বলিয়াছেন। প্রকারান্তরে ধর্মকেই বিবাহের মূল বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আদিম কালে টোটেম প্রথা ধর্মের কেন্দ্র ছিল। এই ধর্মবিশ্বাসই শ্রেণীভেদ ও তথা বিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।\* বেঞ্জামিন কিড্ ও ( Kid ) ধর্মকে সমাজপ্রগতির মূল বলিয়াছেন। বিবাহ ও পরিবারের মূলে যে আত্মোৎসর্গবৃত্তি রহিয়াছে তাহা ধর্মবুদ্ধিই মানুষকে দান করিয়াছে, কিড্-কে অনুসরণ করিয়া ইহা বলা চলে। এদেশে দায়ভাগপ্রবর্তক জীমূতবাহন পরিবারকে ধর্ম দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিবাহ ও পরিবারের মূল উৎস আত্মিক কল্যাণের কামনা, ১১শতকে জীমূতবাহন এই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

বিবাহ ও পরিবারের জৈবিক এবং বংশবাদী ( Racial ) ব্যাখ্যাও আছে। বিবাহ যে জৈবিক বৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশ এবং এই বৃত্তিরই যে পরিণতি পরিবার-প্রথা, তাহা অনস্বীকার্য। রক্তের প্রভাব বিবাহকে আদি

\* “Also, the primitive family organisation cannot be understood before the primitive religious beliefs are known ; for the latter serve as the basis of the former.”  
( Durkheim, 106 p.p ).

কালেও বহুশাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বংশের গণ্ডী অসভ্যও নানাভাবে মানিয়া তাহার যৌন জীবনকে পরিচালিত করে। আধুনিক কালে সুপ্রজননবাদীরা (eugenist) বিবাহকে বংশ ও রক্তের দ্বারাই ষোলআনা নিয়ন্ত্রিত করিতে চান। বিবাহে মনস্তত্ত্ব, ভাববৃত্তি ও নৈতিকতার স্থান ও গুরুত্ব তাহারা স্বীকার করেন না।

বিবাহের আর্থিক ব্যাখ্যাও এই ধরনের নানা ব্যাখ্যার মধ্যে অগ্রতম। পশুপালন হেতু ধনবৃদ্ধি এবং ধনবৃদ্ধি হেতু স্বার্থবৃদ্ধি ও সম্মানপ্রীতি উদ্ভূত হইয়াছে, এই যুক্তি ও কল্পনা অবাস্তব। মর্গান-মার্ক্সীয় মতে অর্থশক্তির প্রভাবই বিবাহ ও পরিবার সৃষ্টি করিয়াছে। গোধন বৃদ্ধি হওয়াতেই গোষ্ঠীপতিদের মনে লোভ হইল এবং সামাজিক সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রবর্তন তাহারা করিলেন, এতদ্ব আজ স্বীকার করা চলেনা। ব্যক্তি-সম্পত্তি হইতে এক-বিবাহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্যক্তি-সম্পত্তির উদ্ভবের পূর্বে যৌথ সম্পত্তি প্রচলিত ছিল। যৌথসম্পত্তির যুগে বিবাহও যৌথবিবাহ (group marriage) ছিল। সম্পত্তি-প্রথার সহিত বিবাহ প্রথার এই অচ্ছেদ্য যোগ মর্গানী ব্যাখ্যার প্রধান কথা।

কিন্তু মানুষের জীবনকে ব্যাখ্যা করিতে কেবল আর্থিক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়। অর্থশক্তি, জৈবিক বৃত্তি, বংশ-প্রভাব, ভূগোল, সমাজপ্রথা, যৌনবৃত্তি, এই সব বৃত্তির প্রভাব ও পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই বিবাহ ও পরিবার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের মনে ও দেহে বিবিধ বৃত্তি ক্রিয়াশীল। আদিম কালেও মৌলিক বৃত্তিগুলি তেমনি ছিল। আজিও বহু বৃত্তি ও শক্তির কাজ অব্যাহত রহিয়াছে। আর্থিক পরিবেশের মত ভৌগোলিক, ধার্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের প্রভাবও গভীর।

এই কারণে একবাদী ব্যাখ্যাগুলি একপেশে। বিবাহ ও পরিবারের ব্যাখ্যায়ও বহুবাদী ব্যাখ্যাই বিজ্ঞান-সম্মত। বিবাহের মধ্যে স্নেহ-

বাৎসল্য-মমতা-প্রেম প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি যেমন রহিয়াছে, বংশরক্ষার জৈবিক তাগিদ ও যৌনবৃত্তির প্রবল দাবিও তেমনি ভাবে ইহার পিছনে রহিয়াছে। শুধু তাই নয়। সমাজ রক্ষার স্বার্থ ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনও বিবাহের একটা উপাদান, পরিবার প্রথার একটা অঙ্গ। মানুষ কেবল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা সম্পত্তি রক্ষার জগুই বিবাহ করিয়া পরিবার বাধে না। তাহার মনোলোকের প্রয়োজন, অধ্যাত্ম জীবনের তৃষ্ণাও বিবাহ ও পরিবারের মধ্যেই ব্যঞ্জনা প্রাপ্ত হয়। বাৎসল্য ও প্রেম, এই দুই বৃত্তির মধ্যে তাহার আত্মার সম্প্রসারণ ঘটে, তাই পরিবার ও বিবাহের আধ্যাত্মিক সার্থকতাও এই দুই প্রতিষ্ঠানের অন্ততম ভিত্তি। কথা উঠিতে পারে, আধুনিক পরিবারের ও বিবাহের মধ্যে এই সব উন্নত বৃত্তির প্রভাব থাকিলেও আদিম মানুষের জীবনে এসব বৃত্তির চিহ্নও ছিল না। এ সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে আদিম মানুষ ও আধুনিক মানবের মধ্যে কৃষ্টির পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক বৃত্তিগুলি সর্বকালের মানুষেই আছে। আদিম মানুষের সহিত সভ্য মানুষের ছস্তর ব্যবধান কল্পনা করার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নাই। বিজ্ঞান এই ব্যবধান স্বীকার করে না। এ সম্বন্ধে ম্যালিনাউস্কী, ওয়েস্টারমার্ক, গিন্সবার্গ, ফ্রেজার, লাউয়ী প্রমুখ সকল নৃতাত্ত্বিকই একমত। বহুবাদী ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানীরা যুক্তিসম্মত মনে করেন। এসম্বন্ধে বিখ্যাত পণ্ডিত গিন্সবার্গের একটা কথা তুলিয়া দিতেছি। গিন্সবার্গ বহুবাদী ব্যাখ্যাই যে বিজ্ঞান-সম্মত তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। তাহার ভাষায়, “বিশেষজ্ঞগণ স্বভাবতই নি সমাজজীবনের যে দিক ও অঙ্গকে লইয়া গবেষণা করিয়াছেন তিনি সেই দিক ও অঙ্গকেই বেশী গুরুত্ব দান করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ রাষ্ট্রকেই গোটা সমাজ বলিয়া মনে করেন, আধিক ইতিহাসজ্ঞ সর্বত্রই অর্থনীতিকে দর্শন করেন। জীবতত্ত্ব বংশতত্ত্ব এবং জনন-



তত্ত্বের ব্যাপারগুলিকেই গুরুত্ব দেন। মনোবিকলনবাদী মানবজীবনের সর্ব সমস্তার সমাধান খোঁজেন অবচেতনের দুর্বোধ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীকে আজ বুদ্ধি ও বিজ্ঞানরাজ্যের প্রচলিত ফ্যাশানগুলির জ্বরদৃষ্টিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে এবং সমাজ-জীবনের মৌলিক ঐক্যের মূলে যে বহুবিধ শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটি শক্তির যথাযথ মর্যাদা দিতে হইবে।” \*

অগণিত শক্তির প্রভাব রহিয়াছে। তাহার প্রত্যেকটিরই ক্রিয়াকে স্বীকার করিতে হইবে। কেবল অর্থশক্তিই নয়, কেবল মৌনশক্তিই নয়, বহু শক্তির সমন্বিত ক্রিয়াফল বিবাহ ও পরিবারের মূলে রহিয়াছে। তাই বিবাহ ও পরিবারের আর্থিক ব্যাখ্যাও একদেশদশী।

তারপরে মর্গানী ছক বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশকে যে স্তর-পর্যায়ে বাঁধিয়া দিয়াছে তাহা সমাজবিজ্ঞান আজ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

---

\* “The specialist very naturally tends to give prominence to the factors of social life of which he has made close study. The student of politics tends to identify the state with the whole of society, the economic historian to see the economic factor everywhere, the Psycho-Analyst to seek the solution of all human problems in the mysterious working of the unconscious, the biologist to stress the genetic and racial factors. It is the duty of the sociologist to resist the tyrannous intellectual fashions of the day and to give due weight to each of the numerous factors which enter into the unity of social life.” (Ginsberg II.)

পাঁচটি ধাপের মধ্য দিয়া প্রত্যেক সমাজকে যাইতে হইয়াছে ও হইবে, এই মতবাদ আধুনিক গবেষণা খণ্ডন করিয়াছে। নির্দিষ্ট ও অনড় কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়া বিবর্তন ঘটিবে, এই মতবাদকেই একরৈখিক (unilinear) বিবর্তনবাদ, বলা হইয়া থাকে। এই বিবর্তনবাদ কোনও সমাজবিদ-ই স্বীকার করেন না। লেনিন মার্ক্স-মর্গানী বিবর্তনকে ঘূর্ণিক বা spiral বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মার্ক্সীয় বিবর্তন রৈখিক। প্রত্যেক সমাজ যদি একই স্তরের মধ্যদিয়া বিবর্তিত হয় তবে তাহাকেই রৈখিক বিবর্তন বলা চলে। মার্ক্স-মর্গানী বিবর্তনও তাই একরৈখিক। কিন্তু একরৈখিক ক্রমবিকাশ আজ বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সমাজবিকাশ কোন নির্দিষ্ট বাঁধা পথে কখনো অগ্রগতির দিকে যায় না। বিবিধ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে বিচিত্র পথে ক্রমবিকাশ বহিয়া চলে। ১৯শতকে মর্গান বিবর্তনের একটা ফর্মুলা বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তি তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণায় এই ফর্মুলা কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। রৈখিক বিবর্তন আজিকার যুগে অচল। বোয়াস (Boas), রিভার্স (Rivers), গোল্ডেনবাইজার, বিসলার (Wissler), লাউয়ী (Lowie), ক্রোয়েবার (Kroeber), সোয়ানটন (Swanton), স্টার্ক (Starcke), গ্রসে (Grosse), ওয়েস্টারমার্ক (Westermarck), প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতত্ত্ববিদগণ রৈখিক বিবর্তনকে খণ্ডন করিয়াছেন।

সাধারণভাবে মার্ক্স-মর্গানী বিবর্তনবাদ যে বিজ্ঞানগ্রাহ্য নয় তাহা দেখান হইল। একদিকে আর্থিক ব্যাখ্যা একপেশে, অন্যদিকে রৈখিক বিবর্তন এবং নির্দিষ্ট ধাপ বা স্তরপর্যায়-ও বিজ্ঞান-বিরোধী ইহা আলোচিত হইল। এখানে মর্গানী ধাপগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

পাঁচটি মর্গানী ধাপের প্রথম ধাপ বা স্তর অবাধ-সংসর্গ যুগ (promiscuity)। আদিম যুগের প্রথম মানুষ যৌন নিষেধ বা সংযমের ধার ধারিত

না, অবাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা সে যুগের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য, পিতামাতা ভাইবোন, কোন সম্বন্ধই যৌন সংসর্গের বাধা হইত না। মর্গানী ছকের ভিত্তিই হইল এই অবাধ সংসর্গ স্তর। এই স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তবেই অগ্রাণু স্তর স্বীকার করিবার অর্থ হয়। এই স্তর স্বীকার না করিলে মর্গানী ছক ভাঙ্গিয়া পড়ে। কার্যতঃও তাহাই হইয়াছে। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান এই স্তর মোটেও স্বীকার করে নাই। মর্গানের কল্পনাপ্রবণতাই এই স্তরকে কল্পনা করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীর কোথাও কোন অসভ্য সমাজে এই স্তরের কোন চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না। মর্গান ও এঙ্গেল্‌স তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এঙ্গেল্‌স বলেন, “এই স্তরের সামাজিক ধ্বংসচিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করিয়া আজ ইহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করার আশাই করা যায় না”।\*

ইহার কোন চিহ্নই কোথাও নাই। তবে মর্গান ইহার অস্তিত্ব কোথায় পাইলেন? মর্গান নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা ‘অনুমান’ করিয়া লইতে হইয়াছে।\*

যে সব কারণের উপর নির্ভর করিয়া মর্গান এই অনুমান করিয়াছেন তাহা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ওয়েস্টারমার্ক সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার ‘মানববিবাহের ইতিহাস’ এই সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাহা ছাড়া অগণিত সমাজবিদ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই অবাধ-সংসর্গ-স্তরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যে কয়টি বৃত্তি মর্গান দিয়াছেন তাহা সবই বাতিল হইয়া গিয়াছে।

\* “We can hardly expect to prove its existence directly by discovering its social fossils among backward savages” (p 31 Engels I).

\* “Promiscuity may be deduced theoretically as a necessary condition.” (Morgan, P 509).

প্রথমতঃ মর্গান প্রচলিত আয়ীয়াতা-সম্বন্ধস্থচক সম্বোধন-শব্দগুলির একপ্রকারের ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে পূর্বে একদা এই সব সম্বোধনের বাস্তব ভিত্তি ছিল। হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসীরা এক পুরুষের নরনারী সকলেই ভাইবোন এবং তাহাদের পিতামাতার সমবয়সীদের সকলকেই 'মা-বাবা' বলিয়া সম্বোধন করে। ইহা হইতেই মর্গান অনুমান করিয়াছেন যে একদা এইসব ভাইবোনেরা সত্যিকার ভাইবোনই ছিল এবং ইহাদের পিতামাতারাও একদা সকলেই সকলের যৌথ স্বামিন্দ্রী ছিল। অর্থাৎ একদা সম্পূর্ণ বাধানিষেধহীনভাবে যৌন উচ্চুঃখলা বিদ্যমান ছিল। হাওয়াই সম্বোধনপদ্ধতিকে প্রাচীনতম পদ্ধতি ধরিয়া লইয়া এই ধরনের ব্যাখ্যা-প্রণালীর সাহায্যে মর্গান তাঁহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা-প্রণালীকে বলা হয় "সম্বোধনশব্দের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা" (sociological interpretation of kinship terms)। এই ব্যাখ্যারীতিকে কিছু বদলাইয়া আধুনিক কালে রিভার্স (Rivers) নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যারীতি যে অযৌক্তিক তাহা ওয়েস্টারমার্ক, ক্রোয়েবার এবং লাউয়ী অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি রিভার্স-ও একথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার কথা, "মর্গানের অবাধসংসর্গ মতবাদ যে সত্য তাহা বিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। হাওয়াই-রাই মানব সমাজের আদিম অবস্থা ও স্তরের প্রতিনিধি, মর্গানের এই প্রথম অনুকল্প বা অনুমানই বরং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।"\*

\* "There is no reason to believe that Morgan's theory of an original promiscuity is correct. On the contrary, as has already been seen, his initial assumption that the Hawaiian represent a primitive stage of human society is entirely unfounded." ('Social Organisation', Rivers 18 pp.)

দ্বিতীয়তঃ মর্গান অপর একটি ব্যাখ্যারীতিও অবলম্বন করিয়াছেন। সেটিও নিছক কাল্পনিক। এই রীতিকে বলা হয় উত্তরন-নীতি বা doctrine of survival. কতকগুলি যৌনপ্রথা বর্তমান কালের অসভ্যদের মধ্যে দেখা যায় বাহার মধ্যে যৌন উচ্ছৃংখলার আভাস পাওয়া যায়, যথা পত্নী ধার দেওয়া প্রথা। এই ধরনের প্রথাগুলি হইতে মর্গান অনুমান করিয়াছেন যে ইহারা আদিম অবাধসংসর্গস্তরের ধ্বংসাবশেষ বা Survival। আদিম উচ্ছৃংখলতা কমিতে কমিতে এই সব প্রথা বর্তমানেও রহিয়া গিয়াছে।

এই ব্যাখ্যারীতি বা উত্তরন-শ্রায়ও যে একপেশে এবং ভুল তাহাও আধুনিক সমাজতত্ত্ব প্রমাণ করিয়াছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এই সব প্রথা বিবাহপ্রথারই বিকৃতি। আদিকালেও এক-বিবাহ প্রথাই প্রচলিত ছিল। সেই প্রথারই স্থানকালজনিত বিকৃতি ঘটয়া এই সব অস্বাভাবিক যৌন রীতি পৃথিবীর বহুস্থানে দেখা দিয়াছে। এই প্রথাগুলি সঙ্ক্ষেপে সমাজ-বিজ্ঞানীরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, মর্গান দুইটি টাবু বা যৌননিষেধের প্রচলনকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার ছকটি গড়িয়াছেন। প্রথম নিষেধ হইল “পিতামাতা-সন্তান টাবু” (parent-children tabu) এবং দ্বিতীয় নিষেধ হইল “ভাইবোন টাবু” (brother-sister tabu). অবাধ সংসর্গস্তরে প্রথম আবির্ভূত হইল প্রথম টাবুটি। ফলে উদ্ভব হইল সমশোণিত (consanguine) বিবাহের। কিছুকাল পরে আবির্ভাব ঘটিল দ্বিতীয় টাবুটির; ফলে উদ্ভূত হইল পুনালুয়া বিবাহ। যুগযুগান্ত-ব্যাপী যৌন উচ্ছৃংখলতার মধ্যে অকস্মাৎ কেন এই দুইটি নিষেধের বা টাবুর উদ্ভব হইল তাহার যুক্তিবদ্ধ ব্যাখ্যা মর্গান দিতে পারেন নাই। যে ক্রম এবং স্তরপর্যায় তিনি কল্পনা করিয়াছেন তাহা বাস্তব

তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। প্রাণীজগতের যৌনজীবন সংক্রান্ত তথ্যও মর্গানী ছককে খণ্ডন করে। ওয়েস্টারমার্ক এসম্বন্ধে বিস্তৃত ও অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রবার্ট ব্রিফট (Robert Briffault) নামক নৃতত্ত্ববিদ একালে মর্গানী মতকে কিছু সংশোধন করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। ওয়েস্টারমার্ক এই চেষ্টার যৌক্তিক জবাব দিয়া ব্রিফটের মতকে খণ্ডন করিয়াছেন। লাউয়ী প্রমুখ আধুনিক নব সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতার এসম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া মর্গানকে খণ্ডন করিয়াছেন।

তারপর মর্গানী ছকের দ্বিতীয় স্তর হইল “যৌথ বিবাহ” (group marriage)। প্রথম ধরনের যৌথবিবাহের—বা সমশোণিত বিবাহ—ইহাও একটা স্তর হিসাবে স্বীকৃত হয় নাই। এই স্তরেরও কোন বাস্তব চিহ্ন বা প্রমাণ পৃথিবীতে নাই। মর্গান পূর্বোল্লিখিত ব্যাখ্যারীতিকে—উদ্বর্তননীতি ও সম্বোধন শব্দের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা—অবলম্বন করিয়া এই ধরনের সার্বজনীন স্তর কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয় ধরনের মর্গানী যৌথবিবাহ ‘পুনালুয়া বিবাহ’ ও আধুনিক সমাজতন্ত্রে স্তর বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তবে একথা ঠিক যে পৃথিবীতে কয়েকটা জাতির মধ্যে কোন প্রকারের যৌথ যৌন সংসর্গ দেখা যায়। মধ্য অস্ট্রেলিয়া ও উত্তরপূর্ব সাইবেরিয়ায় দেখা যায়, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী পরপুরুষ ও পরনারীর সহিত বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যৌনসংসর্গের অধিকারী। কিন্তু গোল্ডেনবাইজার ও লাউয়ী এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এইসব প্রথা আদিম নহে। একবিবাহেরই সীমার মধ্যে এই সব উচ্ছৃঙ্খলতা বা যৌন অধিকারের সম্প্রসারণ সর্বদাই বিद्यমান থাকে। ইহা বিবাহের সম্প্রসারণ বা স্থানীয় বিকৃতি মাত্র। গোল্ডেনবাইজার বলেন, “এই প্রথা সর্বদাই খুব সীমাবদ্ধ। প্রকৃত স্বামী-স্ত্রী অগ্ৰাণ্ণ যৌনসঙ্গীদের থেকে সর্বদাই স্পষ্টভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র থাকে। স্বামীস্ত্রীর অধিকার ও সামাজিক মর্গাদা এবং তাহাদেরকে সম্বোধন

করিবার পৃথক পরিভাষা সর্বদাই প্রথরভাবে স্পষ্ট।\*” ইহা ছাড়াও যৌন জীবন যদি কোথাও যৌথ আকার ধারণ করিয়াও থাকে, তবে তাহা ব্যক্তিগত বিবাহ ও পরিবারেরই বিকৃতি ঘটয়া হইয়াছে। রিভার্স পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যৌথবিবাহের প্রমাণ নাই।†

তারপরে মর্গানী ছকের অপর ভিত্তি ও যুক্তি হইল মাতৃক্রম ও পিতৃক্রমের স্তরপর্যায়। এই মতে মাতৃক্রমই (matriliney) আদিমতম এবং পরবর্তিকালে পিতৃক্রমের (patriliney) উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু মর্গানী ছকের ভিত্তি অবাধসংসর্গ ভাঙ্গিয়া পড়ায়, তাহা হইতে উদ্ভূত এই বংশ-নির্ণয় পদ্ধতির ক্রমও ভিত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্ট্যাক, গ্রাস, এবং ওয়েস্টারমার্ক প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্যক্তিগত পরিবারপ্রথাই আদিমতম এবং অধিকতর সার্বজনীন। পূর্বে পরিবারপ্রথাই ছিল। পরবর্তিকালে এইসব গোষ্ঠীপ্রথা—পিতৃক্রমী গোষ্ঠী (gens) ও মাতৃক্রমী গোষ্ঠী (clan)—উদ্ভূত হইয়াছে। পরিবার হইতেই গোষ্ঠীর জন্ম হইয়াছে। মর্গানের মতে গোষ্ঠীই পূর্বতর এবং গোষ্ঠী হইতেই পরিবারের উৎপত্তি হইয়াছে। মর্গানের গোষ্ঠী-পরিবার ক্রম উপরোক্ত পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্তিকালে আমেরিকার নবসমাজবিজ্ঞানী সম্প্রদায় বিস্তৃত তথ্যসংগ্রহেরদ্বারা মর্গানের মতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়াছেন। তাহারা দেখাইয়াছেন যে পরিবার পৃথিবীর সর্বত্র অসভ্যদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পরিবার নাই, এমন

\* “The custom is always strictly circumscribed ; the true husbands and wives are, moreover, invariably distinguished, both in status and terminologically, from the other mates.” (Goldenweiser).

† “But we have no conclusive evidence that such a form of marriage exists or has ever existed.” (‘Social Organisation’, Rivers. p 45).

জাতি নাই, সমাজ নাই। কিন্তু গোষ্ঠী-প্রথা নাই, তেমন সমাজ ও জাতি বিদ্যমান রহিয়াছে। সোয়ানটন (Swanton) দেখাইয়াছেন যে এন্টিমে' আথাবাস্কান (Athabaskan), সলিশ (Salish) প্রভৃতি জাতির মধ্যে মাতৃক্রমী বা পিতৃক্রমী গোষ্ঠীর কোন চিহ্নও নাই। এ-ছাড়া উত্তর আমেরিকার শুধু ইরোকোয়', হোপী (Hopi), জুনী (Zuni), প্রভৃতি উন্নততর জাতির মধ্যেই কেবল মাতৃক্রমী গোষ্ঠী এবং মাতৃকেন্দ্রিক বংশক্রম-প্রথা প্রচলিত আছে। কাজেই মাতৃক্রমই প্রাচীনতর প্রথা এ মর্গানী মত গ্রহণযোগ্য নয়।

রিভাস'ও স্বীকার করিয়াছেন যে মাতৃসত্ত্ব বা মাতৃক্রমই আদিম তাহা বলা যায় না। তাঁহার মতে পিতৃক্রম বা মাতৃক্রম কোনটী আদিমতর তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু পরিবার প্রথা যে সার্বজনীন তাহা রিভাস ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, "পরিবার প্রথা হইল একটা মৌলিক প্রতিষ্ঠান। এই আদিম মৌলিক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সকল রকম সমাজেই ক্রিয়াশীল রহিয়াছে।"<sup>†</sup>

লাউয়ী প্রমুখ পণ্ডিতদের মতই আজ সর্বজন-গ্রাহ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে মাতৃক্রম হইতে পিতৃক্রম উদ্ভূত হইয়াছে তাহা সম্ভব; কিন্তু সর্বত্র সর্বকালে এই ক্রমকে অনুসরণ করিয়া বিবাহেরও পরিবর্তন কেন হইবে তাহার কোন যুক্তিই মর্গানীরা দেন নাই। সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া লাউয়ী প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদগণ বহুবাদী ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কোন একটিমাত্র শক্তির প্রভাবে কোন একটা মাত্র ক্রমকে অনুসরণ করিয়া লৌহকঠিন বাধা সড়কে সমাজবিবর্তন অগ্রসর হইয়াছে, এই ভ্রান্ত মত ও

† "The fundamental institution of the family thus plays its part in all forms of society." ("Social Organisation', Rivers pp 40 ).



গোঁড়ামি আঙ্গিকার সমাজতত্ত্ব মানে না। বহু শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে নানা বিচিত্র কুটিল পথে বিবর্তন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইহাই বিজ্ঞান-সম্মত মত। এই কারণে মার্ক্স-মর্গানী বিবাহ ও পরিবারের ছক গ্রহণযোগ্য নয়।

## পরিবার ও বিবাহের ভবিষ্যৎ

পরিবার ও বিবাহের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে মর্গানী ছক ভ্রান্ত। কাজেই স্বভাবতই পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতামতও ভ্রান্ত প্রমাণ হয়। এখানে মর্গানের সঙ্গে মার্ক্সবাদের কিছু পার্থক্য আছে। মর্গান এক-বিবাহী পরিবারই ভবিষ্যতের সার্বজনীন প্রথা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু মার্ক্সবাদীরা বলেন, পরিবার ও একবিবাহ ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইবে। সম্পত্তিপ্রথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বোগ কল্পনা করার জগুই এই সিদ্ধান্ত মার্ক্সবাদকে নিতে হইয়াছে। সম্পত্তিপ্রথা বিলুপ্ত হইলে বিবাহপ্রথা ও পরিবার বিলুপ্ত হইবে।

মার্ক্সবাদী এই মতও ভ্রান্ত প্রমাণ হইয়াছে। কারণ আর্থিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞান কর্তৃক অগ্রাহ হওয়ার অর্থ নৈতিক কারণে বিবাহ-বিলুপ্তিও অযৌক্তিক প্রমাণ হয়। পরিবার ও বিবাহ বহু কারণের সমবেত ফল। কাজেই কেবল আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে ও সম্পত্তিপ্রথার বিলুপ্তি দ্বারা বিবাহ ও পরিবার বিলুপ্ত হইতে পারে না। বর্তমান রাশিয়ায় সম্পত্তি বিলুপ্ত হইলেও বিবাহ ও পরিবার লুপ্ত হয় নাই। ইহাও বহুবাদী ব্যাখ্যার সমর্থন করে। পরিবার রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে কিন্তু বিলুপ্ত হইবে না। এই মতই বিজ্ঞান-সম্মত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী মতামতও কাল্পনিক। \*

\* বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থকারের “বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ” নামক অধুনা প্রকাশ্য পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

## সাহিত্য প্রণীবাদ

সাহিত্য নিয়েও আজ তর্ক উঠেছে। যেমন তর্ক উঠেছে জীবনের অন্ত্যস্ত সব কিছু নিয়ে। এ তর্কটা হলো আরো একটা বড়ো তর্কের অংশ মাত্র। সেই আসল তর্কটা হলো মানুষের জীবন সম্বন্ধে, মানুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে। তর্কটা প্রবল হয়ে উঠেছে, কারণ সংশয় ও প্রশ্নও প্রখর হয়ে উঠেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রই আজ প্রশ্নের দ্বারা আক্রান্ত; সর্বত্রই আঁকা রয়েছে বড় বড় অগণিত প্রশ্নবোধক চিহ্ন যাকে ওয়েল্‌স্‌ সাহেব বলেছেন এ যুগের মশার ঝাঁক, 'mosquitoes of modern world'. এরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের আক্রমণ করেছে এবং প্রশ্নের মশকদংশনে আমরা আজ সংশয়বিষে জর্জরিত হয়ে উঠেছি,—'now they swarm on every path and infect us with a fever of doubt.' (Wells)। এই তাড়নায় আমরা আরম্ভ করেছি বিচার, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান। এরই ফলে ঘটেছে আমাদের আদর্শের দ্রুত রূপান্তর। আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে গড়তে চাই। কিন্তু ভাঙ্গাগড়ার পরিকল্পনা নিয়ে মতভেদ আছে। এবং মতভেদ থেকেই দলভেদের উৎপত্তি হয়েছে। সমাজনীতি ও রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের সংঘর্ষ আজ সাহিত্যেও এসে পড়েছে, কারণ সাহিত্য সমাজনীতির এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যিককেও তাই পলিটিশিয়ান ও সমাজতাত্ত্বিক হয়ে বিতর্কের আসরে নামতে হয়েছে।

কথা উঠেছে সাহিত্যের মূল্যবিচার নিয়ে, সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে। একদল বলেছেন সাহিত্যের কারবার হলো ব্যক্তি নয়, সমষ্টির জীবন এবং সাহিত্য হলো সমাজ-বিপ্লবের ষষ্ঠ মাত্র। কথাগুলো পুরাণো নয়, এবং অনেকেই ইতিপূর্বে একথা বলেছেন। কিন্তু একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে

একদল আজ কথাগুলো বলছেন। এরা হলেন মার্ক্সবাদী এবং একটা স্পষ্ট সমাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে এরা সর্বত্র দল গঠন করেছেন। এই দল একটা বিশিষ্ট মানদণ্ডে সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনকে বিচার করে কতকগুলো সিদ্ধান্তকে উপস্থিত করেছেন। সাহিত্য সম্বন্ধেও এদের একটা সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে এবং এ সিদ্ধান্ত তাদের সমাজতাত্ত্বিক মতবাদেরই একটা প্রয়োগ বই আর কিছু নয়। মার্ক্সীয় সাহিত্য মানেই হলো মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব। এবং সে সাহিত্যের বিচারে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বকেই বিচার করতে হবে। এ বিচারে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব যেমন সঙ্কীর্ণদৃষ্টি বলে প্রতিপন্ন হয়, তেমনি মার্ক্সীয় সাহিত্যও প্রতিপন্ন হয় একদেশদর্শী বলে।

মার্ক্সীয়দের প্রথম সিদ্ধান্ত হলো সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে। ব্যক্তির সুখদুঃখ, ব্যক্তির জীবন নিয়ে যে সাহিত্য তা এই মতে অপাংক্তেয়। ওরা বলছেন, এ যুগের সাহিত্য হবে সমষ্টির ব্যাপক ও বহুজনীন সুখদুঃখ নিয়ে। আর এ সমষ্টি বলতে মার্ক্স-বাদী বোঝেন একটি বিশেষ ধরনের সমষ্টিকে —; মানে, শুধু কৃষাণমজুরের গোষ্ঠীকে। এই হলো মার্ক্সীয় শ্রেণীবাদ; সমাজ দুটো অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত, একদিকে ধনিক এবং অন্যদিকে কৃষাণ-মজুর। সভ্যতার ইতিহাসই হলো এই দুপক্ষের লড়াইর ইতিহাস; যে যুগে যে পক্ষ প্রবল হয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে দখল করে সেই বিজয়ী প্রবল পক্ষই সেই যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কোন্ পক্ষ বিজয়ী হবে তাও কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তদানীন্তন অর্থনৈতিক শক্তিসংঘাতের দ্বারা। কাজেই (১) অর্থনীতিই মানুষের ও সমাজের প্রেরক ও নিয়ন্ত্রক (economic determinism), (২) অর্থনীতি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে শ্রেণীবিভাজ্যের মধ্য দিয়ে (class dichotomy), (৩) বর্তমান যুগ হলো ধনিকপ্রতিপত্তির যুগ; বুর্জোয়া শাসন, সঙ্কট ও সাহিত্যের যুগ, এ যুগে কৃষাণ-মজুরের জিহাদ শেষ হবে ধনিকের মহতী বিনষ্টিতে এবং কৃষাণ-মজুরের অনিবার্য বিজয়ে (inevitability of classless society),

(৪) অনিবার্যতার প্রমাণ ও গ্যারাণ্টি হলো হেগেল'য় ডায়ালেকটিক নীতি  
 (৫) এই নীতির ফল হবে বর্তমান কালের বিলীয়মান বুর্জোয়া ব  
 ধনিক সাহিত্যের ( ও সভ্যতার ) পরিবর্তে উদীয়মান শ্রেণীর ( কৃষাণমজুরের )  
 শ্রেণী-সাহিত্য বা প্রলেটারীয় গণ-সাহিত্যের অসপন্ন প্রতিষ্ঠা ( decadence  
 of bourgeois & the rise of proletarian literature ) । এই  
 পাঁচটি সিদ্ধান্তকে ছেকে চুষক আকারে মার্ক্সবাদীদের বক্তব্য দাঁড়াল এই  
 যে, কেবলমাত্র কৃষাণ-মজুরের শ্রেণী-জীবনকে নিয়েই চলবে নবযুগের  
 সাহিত্যসৃষ্টি । কিংবা কৃষাণমজুরের স্বার্থের দিক থেকে যে সাহিত্য রচনা  
 হবে তাই হবে সত্যিকার যুগসাহিত্য ।

এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান বক্তব্য হল এই যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির  
 মধ্যের বিরোধটি নিতান্ত কাল্পনিক বই কিছু নয় ; এদের পরস্পরের যোগা-  
 যোগটি অতি নিবিড়, এবং একে অণ্ডের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে  
 এরা চিৎকাল জড়াজড়ি করে আছে । তাছাড়া এদের পরস্পরের মধ্যে  
 কোন দ্বন্দ্ব তো নেই-ই, বরং এককে বাদ দিয়ে অপর ক্ষণকালও বাঁচতে  
 পারে না । ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে একটা চিরকম্প ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে  
 আসছে সমাজ-জীবনের প্রত্যেক স্তরে । সেই ভারসাম্যটির বিচ্যুতি ঘটলেই  
 সমাজ-জীবনে ঘটে বিপ্লব । সামাজিক ক্রমবিকাশের একটা গতি আছে, সেই  
 গতিমুখে কখনো কোনো দিকে আতিশয্য হলেই ভারচ্যুতি ঘটে থাকে ।  
 তাই কোন যুগে ব্যষ্টির ওপরে পড়ে জোর, ব্যক্তিবাদ হয় প্রবল ; কোনো  
 কালে সমষ্টির ঘটে প্রাবল্য, গোষ্ঠী হয়ে দাঁড়ায় প্রধান । ১৯ শতকে  
 ব্যক্তিত্ববাদ চরমে উঠেছে, যার ফলে ধনতন্ত্র ও স্বার্থপূজার অয়জয়কার  
 আরম্ভ হয়েছে । আজ তার প্রতিক্রিয়ার মুখে সমাজতন্ত্র এসেছে, এসেছে  
 সমষ্টির ডাক ; অবাধ ব্যক্তিপ্রাধান্যকে খর্ব করবার রব উঠেছে চারদিকে ।  
 ব্যক্তিকে টিপে মারতে হবে, কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আজ অসাম্য, সভ্যতা ও  
 সাহিত্য উভয়েরই আদালতে । তাই আজ কম্যুনিষ্ট চান এমন সাহিত্য

যখানে ব্যক্তির স্থান নেই, যেখানে শ্রেণীরূপী সমষ্টির হবে ষোড়শোপচার জা। কিন্তু চাইতে গিয়ে মার্ক্সবাদী হয়ে পড়েন ভাবপ্রবণ এবং আতিশয্য গাষে তার সিদ্ধান্ত হয়ে পড়ে একদেশদর্শী। তবে মার্ক্সীয় মতবাদের কোন স্থায়ী, প্রামাণ্য ব্যাখ্যান নাই; মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে মার্ক্সবাদীদে, ধোও নানা মুনি আছেন। তবে যারা গোড়া সম্প্রদায় তাদের কথাই এখানে হচ্ছে। (১) মিঃ আপওয়াড ( Upward ), (২) মিঃ রাল্ফ্ ফক্স ( Ralph Fox ), (৩) মাইকেল গোল্ড ( Michael Gold ), মিরস্কী ( Mirsky ) (৪) ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল ( Christopher Caudwell ) (৫) গ্রেনভিল হিক্স প্রমুখ লেখক এই গোড়া শ্রেণীবাদের সমর্থক। এদের মতে ব্যক্তি হিসাবে মানুষের কোনো মূল্য নাই, শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই তার অস্তিত্ব ও ব্যবহারের অর্থ আছে। এদের এই গোড়ামি ও আতিশয্য হলো ১৯ শতকীর ব্যক্তিপ্রাধান্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরা বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক প্রগতির দিকে চোখ বন্ধ করে আছেন। মানুষের মন যে একটি জটিল মিশ্র সত্তা, তার মানসিকতা যে নানা বর্ণের আলোকসম্পাতে বিচিত্র ও বহুরঙীন একথা এরা ভুলে যায়। মানুষের ওপরে তার অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়ে, একথা ঠিক। জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষ যে পারিপার্শ্বিক নিজের চারদিকে সৃষ্টি করে তার প্রয়োজন ও তাগিদ তার মনকে ও ব্যবহারকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু শ্রেণী-প্রভাব ছাড়াও বহু বিচিত্র অবস্থার প্রভাব তার ওপরে অহরহ কাজ করছে; যেমন তার বংশ, রক্ত ও দৈহিক উত্তরাধিকার ( race ), যেমন তার দেশ ও কাল,

(১) "The mind in chains" by Upward. (২) "The Novel and the People" by Ralph Fox. (৩) "Illusion and Reality"—by Christopher Caudwell. (৪) "The great tradition"—by Grenville Hicks.

তার পুরুষ-ও-স্ত্রীত্ব বা লিঙ্গভেদ (sex), তার পরিবার-গত স্থান ও পদ-মর্যাদা (status), তার ধর্ম ও জাতি (caste)। সে কেবল ব্যবসায়ীই নয়, ধনিক ও শ্রমিকই নয়; মঙ্গোলীয় বা নিগ্রো রক্ত তার মধ্যে আছে, তার প্রভাব আজ জনন-শাস্ত্র (genetics) স্বীকার করবে; সে পুরুষ কি নারী তারও প্রভাব তার মানসিক গড়নকে অনুরঞ্জিত করবে, একথা যৌনশাস্ত্র আজ বলবে; সে পিতা কি ভ্রাতা কি স্বামী, মাতা কি জায়া কি কন্যা এই পারিবারিক সম্পর্ক-জালের চাপও তার চেতনাকে কিছু আভিভূত করবে, একথা মনস্তত্ত্ব অস্বীকার করে না; সে নাস্তিক কি আস্তিক কি ফেটীশ-পূজক, তান্ত্রিক কি ইহুদী কি বৈষ্ণব, এসব ব্যাপারের প্রভাবও কম নয়, সমাজতত্ত্ব একথা স্বীকার করবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব মিশ্র পদার্থ, তাকে কেবল একটা দিক থেকে, একটা cross section হিসাবে দেখলে, সে দেখা আংশিক ভাবে সত্য হবে। কেবল ব্যবসায়গত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে তাকে দেখলে তার ব্যক্তিত্বের সবটুকু ধরা পড়ে না। ব্যক্তি হিসেবে, মানুষ হিসেবে তার ব্যক্তিত্বের একটা দিক আছে। রাসেল বলেছেন, যার দাঁত ব্যথা হয় সেই জানে ব্যথার অনুভূতিকে; এ তার একান্ত নিঃসন্দেহ; এখানে প্রত্যক্ষ ভাগ দেবার উপায় খেমন নেই, এখানে অণু কারুর ভাগ নেবারও পথ নেই। গোলাপ দেখে বা সূর্যাস্ত দেখে যে আনন্দের উপলব্ধি কারুর হয়, তা তারই বিশিষ্ট উপলব্ধি। বাইরের সমাজের সঙ্গে, অপরাপর মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক না এক সূত্রে যোগ আছে। কিন্তু সমস্ত মানুষের সঙ্গে সকল যোগসূত্রের বাইরে একটা নিরালা অন্তর্লোক আছে যেখানে অপরের প্রবেশপথ নেই। সেখানে মানুষ একক। বাহির ও ভিতর, এই দুইয়ের সমবায়েই মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ। এদের একে অন্নের উপরে সততই প্রভাব-পাত করছে, এই অগোচ্যতাকে স্বীকার করেও ভিতর ও বাহির দুইয়েরই সঙ্গার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করে উপায় নেই। সমুদ্রবেষ্টিত

দ্বীপ অপর দ্বীপ বা দেশ থেকে পৃথক্, সমুদ্র তাদের মধ্যে অতুরাল  
 চেনা করে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। কিন্তু সমুদ্র আবার, অত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে,  
 দুইয়ের মধ্যে যোগসেতু হিসেবেও রয়েছে। সমুদ্র বাবধানও বটে,  
 সংযোগও বটে। তেমনি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যও যেমন সত্য, তেমনি সত্য  
 তার সমষ্টির অন্তর্ভুক্তি ও সংযোগ। মানুষ যেমন একক ও পৃথক  
 তেমনি মানুষ বহুর সহযোগী এবং সমাজেরও অংশীদার। ব্যক্তির  
 সুখদুঃখও যেমন সত্য, তেমনি সমষ্টিজীবনের সাধারণ সুখদুঃখও সত্য ;  
 ব্যক্তি নানা ক্ষেত্রে নানা লোকের সঙ্গে সমান সুখদুঃখের ভাগী ; সেই  
 কারণে বহুর লোকের সঙ্গে ব্যক্তির গোষ্ঠীবন্ধন ঘটে, এবং ব্যক্তি তাই  
 বিবিধ গোষ্ঠী-জীবনের ( group life ) অন্তর্ভুক্ত, ফলভাগী এবং প্রভাব-  
 গালিত। তার বিবিধ সম্পর্ক-বন্ধনের মধ্যে কেবল জীবিকাসম্পর্কিত সম্বন্ধ  
 ও সংযোগই তাকে মাটির ঢেলার মত ষোল আনা গড়ে তুলবে, একথা  
 কোন বিজ্ঞানই সমর্থন করে না। কারণ এ হলো নিছক একদেশদর্শন  
 মাত্র এবং যাকে বলে 'over-simplification' সেই আতিশয্য  
 দােষেরই নামান্তর।

সাহিত্য কেবল মানুষের অর্থনৈতিক শ্রেণী-চরিত্রেরই প্রকাশ মাত্র,  
 একথা এই একদেশদর্শী গোঁড়ামী বই আর কিছু নয়। মানুষের  
 মনোভাব তার শ্রেণী-স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সত্য। কিন্তু সে  
 কতটুকু? তাছাড়া সেই প্রভাবকে অপর্যাপ্ত স্বার্থ, তাগিদ ও প্রভাব  
 ধর্ষ এবং এমন কি, বিলুপ্তও করতে পারে। কেন পারে তার জবাব  
 দিয়েছে সমাজতন্ত্র। সমাজে ও জীবনে বিবিধ শক্তি ও স্বার্থ কাজ  
 করছে, ক্রমবিকাশের মূলে রয়েছে এই বিচিত্র ও অসংখ্য শক্তিসমূহের  
 সমবেত ও পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত। এই পারস্পরিকতা ( reciprocity )  
 হলো অগ্ণকার সমাজতন্ত্রের সর্বস্বাকৃত তথ্য। মার্ক্সীদের অর্থনৈতিক  
 শ্রেণীবাদ দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের সামাজিক ক্রমবিকাশবাদের ওপরে।

এই বিবর্তনবাদের ভিত্তি হলো একরৈখিক ( unilinear ), অপরিবর্তনীয় ( irreversible ) কার্যকারণক্রমের গিওরা যা' আজকার দর্শনে ও বিজ্ঞানে অচল। অর্থনীতি যেমন জীবনের অপরাংশকে প্রভাবিত করছে, অপরাংশগুলোও তেমনি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে। শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ সাহিত্যে থাকবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল রকমের গোষ্ঠীজীবনের স্বার্থই সাহিত্যের মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হবে, একথাও অনস্বীকার্য। অধিকন্তু কেবল গোষ্ঠীজীবনই নয়, ব্যক্তি-জীবনেরও আশানিরাশার কাহিনী সাহিত্যে ভাষা পাবে। সমষ্টিজীবন দানা বেঁধে উঠেছে ছোটবড় নানাবিধ গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে। ছোট বড় নানা আকারের সমকেন্দ্রিক বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েও ব্যক্তির একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তাই আজ মার্ক্সীয়দের মধ্যে যারা যুক্তিশীল তারা ব্যক্তিকে নিয়েও সাহিত্য হতে পারে একথা স্বীকার করেছেন। বিখ্যাত মার্ক্সবাদী জন্ স্ট্রাচীও ( Strachey ) বলছেন, "Literature for the most part, attempts to illuminate some particular predicament of a particular man or a particular woman at a given time and place." এই স্বীকৃতির জন্ গোঁড়া মার্ক্সীয়রা খুশী হননি। এমন কি গ্রেন্ভিল্ হিক্‌স্ এর জন্ স্ট্রাচীকেও এক হাত নিতে ছাড়েননি। কিন্তু আমেরিকার আর একজন মার্ক্সীয় সাহিত্যিকও ব্যক্তির মূল্যকে স্বীকার করে স্ট্রাচীকে সমর্থন করেছেন। তার নাম ফ্যারেল ( J. T. Farrell )। তিনি বলছেন, সামাজিক শক্তিগুলো এমন ভাবে দানা বেঁধে উঠে কাজ করে না যাতে এক একটা বিপুল আকারের পিণ্ড বিরুদ্ধ দিক থেকে এসে পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে। মানুষকে কেবল পিণ্ডের অংশ হিসেবে দেখলে আবার পুরোগো যান্ত্রিকতারই সমর্থন করা হয়—"the treatment of them as such is a fall back to the materialism that preceded Marx.....We cannot



treat social forces as mechanical and the basis of this is the common intellectual conception of cause and effect as rigidly opposite poles.”, (৬) ফ্যারেলের মতে সাহিত্য শ্রেণীকে নিয়েও হতে পারে, ব্যক্তিকে নিয়েও হতে পারে। আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যের মূল্য যে কম একথাও স্বীকার্য নয়। উপন্যাসের শ্রেণীভাগ করে হিক্‌স্‌ যে “সমষ্টি-কেন্দ্রিক” উপন্যাসের নামকরণ করেছেন তাও ফ্যারেলের মতে অবৈজ্ঞানিক। (৭)

জীববিজ্ঞা ও সমাজবিজ্ঞা দুইই স্বীকার করে থাকে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনি প্রভেদ-ও আছে। কোনো কোনো বিষয়ে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকে আবার অল্পদিক থেকে থাকে অসাদৃশ্য। জীবিকা-স্বার্থের সাদৃশ্য যাদের মধ্যে রয়েছে তাহা হলো মার্ক্সীয় “শ্রেণী”। তেমনি অল্পবিধ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অল্পরকমের গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কেবল এক ধরনের সাদৃশ্যটিকেই চোখের ওপরে

(৬). “A note on Literary criticism” by James T. Farrell.

(৭) “Therefore, because a novel happens to deal with the particular predicament of a particular man or woman...it does not necessarily follow that it is tainted with individualism, nor, because it is tainted with individualism, does it necessarily follow that it belongs in a lower category than the collective novel ;..... Actually there is nothing astounding in the fact that novelists are likely to go on writing about the individuals, because, after all, the world is made up of individual human beings.”—(ibid, pp. 111-112).

রেখেই সাহিত্য সৃষ্ট হবে, কেবল অর্থ নৈতিক শ্রেণীর স্বার্থ নিয়েই সাহিত্য গড়ে উঠবে, এ দাবি ও কল্পনা ভিত্তিহীন। আরেকটা কথা আছে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির একটা প্রভেদও আছে; সকল সাদৃশ্যের পিছনেই জেগে রয়েছে এই প্রভেদ বা অসাদৃশ্য। এইদিক থেকে দেখলে প্রত্যেকটা ব্যক্তিরই আছে একটা বিশিষ্টতা বা uniqueness. এইখানে প্রত্যেকটা ব্যক্তি স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও রীতিতে, উভয়ক্রমেই, এই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি। আকৃতিতে যেমন প্রতিটা ব্যক্তি প্রতি ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন, প্রকৃতিতেও তাই প্রতি মানুষের একটা পৃথক স্বকীয়তা আছে। (৮) এই কারণে মোটামুটি ভাবে শ্রেণী হিসেবে কোন মানুষ-সংহতির ব্যবহার সূচন ও সমপ্রকৃতিক হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধেও কোন ব্যক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যৎ-বাচন চলে না। ব্যক্তির প্রায়শই বিশিষ্টপ্রকৃতি ও স্বতন্ত্রধর্মী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে (statistical average'এর) পদ্ধতি ঋনিক দূর কার্যকরী হলেও, বেশী দূর নয়। যেখানে মানুষ স্বতন্ত্রধর্মী সেখানে তার ব্যবহার শ্রেণী-ব্যবহার না হয়ে হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিক ব্যবহার বা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য স্বয়ংসিদ্ধ। এই ব্যক্তিদর্শনকে নিয়ে যে সাহিত্য-রচনা হয়, তার শ্রেণীস্বার্থ-সম্পর্কিত মূল্য কম হলেও সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও ব্যক্তি হিসেবে বা মানুষ হিসেবে সাদৃশ্য আছে; শ্রেণী-স্বার্থের পার্থক্যকে বাদ দিয়ে যদি

(৮) “Besides being members of classes and groups, they are intractable individual entities, each uniquely different and in some respects, from every other human being on this planet.....In other words, in every individual there is an aspect of uniqueness and intractability and this makes him not completely predictable in every potential situation.” (ibid, pp 117).

মানবীয় সাদৃশ্যকে মাত্র ভিত্তি করে সাহিত্য তাকেই রূপ দেয়, তবে সে সাহিত্যকে কুসাহিত্য বলবার কোনই যুক্তি নেই। কিষাণ আর জমিদারের, মজুর আর ধনিকের মধ্যে মানুষ হিসেবে কতকগুলি সমধর্ম আছে। বৃহত্তর গণের ( genus ) মধ্যে ক্ষুদ্র জাতি ( species ) অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে ; জাতি হিসেবে পরস্পরের বিরোধ বা প্রভেদ থাকলেও সবগুলি ব্যক্তিই গণ হিসেবে বৃহত্তর মানবসমাজের অংশ। দাম্পত্য-প্ৰীতি, বাৎসল্যপ্ৰেম, আত্ম-রক্ষাপ্ৰবৃত্তি ইত্যাদি বহু বিষয়ে মানুষ বিরোধী শ্রেণীভুক্ত হয়েও সমস্বভাব হতে পারে। এই বিশ্বমানবিক মানবধর্মও সাহিত্যের অনবগ্ন বিষয়বস্তু হতে পারে। শ্রেণী-সংগ্রাম এই মানবধর্মকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে না। (৯)

যারা শ্রেণী-সাহিত্য নিয়ে মেতে উঠেছেন তারাও এক ধরনের রোমান্টিক ভাবধ্বংসতার মোহে আটকা পড়েছেন। তবে তাদের এই মন্তব্য আজ কিষাণমজুরকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, এই যা তফাৎ। কোনো সাহিত্যে রাজরাজড়াদের নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখা যায় ; কিংবা ধনীদের বিলাস-ঐশ্বৰ্যের সসন্ত্রম বর্ণনায় সাহিত্য প্রায়শঃই মুখরিত হয় এ-ও দেখা যায়। কিন্তু মার্ক্সীয় সাহিত্যিকদের আধুনিক রচনায় দরিদ্রের, এমন কি দারিদ্র্যের সপ্রশংস স্তুতিবাচনে আজ রোমান্টিক ভাবালুতারই অন্য রূপ দেখা দিয়েছে। এ সেই সংকীর্ণ বাতিক যা সব জটিলতাকে সরল ফর্মুলায় বেধে সহজ সাহিত্য সৃজন করতে চাইছে ; সাহিত্য হলো মানব-মননার দিগন্তপ্রসারী অরণ্য ; এখানে আলোতে-ছায়াতে, লতাপাতা-পল্লবে, কীটপতঙ্গজন্তুজানোয়ারে কণ্টকে-ফুলে-ফলে, মেঘবর্ষণে আর তুফানে-বিদ্যতে অজস্র জটিলতা। একে

(৯) “The class struggle however does not in any sense produce so complete a differentiation of human beings that there are no similarities between men who objectively belong to different social classes.” (ibid 125 pp, )

সংক্ষিপ্ত নিয়মে পরিণত করতে চান এরা, দারিদ্র্যের ঘর্মজলে আর বন্ধিতের দীর্ঘশ্বাসে। কিন্তু এ যুগ-সাহিত্য হবে না, এ হবে সহজিয়া ভাব-সাহিত্য (‘literature of simplicity’), এই নব রোমান্স রচনা করবে কেবল, “songs of stench and sweat” “it tends to idealise the worker and the worker-writer.” শ্রেণী-সাহিত্যের তিন রূপ হতে পারে, (১) কিশাণমজুর লেখকের রচনা, (২) কিশাণমজুর সম্পর্কে রচনা (৩) কিশাণমজুরের স্বার্থের দৃষ্টিভূমি থেকে রচনা, অর্থাৎ কিশাণমজুরের স্বার্থকে সমর্থন করে রচনা। লেখক কিশাণমজুর হলেও তার রচিত সাহিত্য কিশাণ মজুরের স্বার্থকে সমর্থন না-ও করতে পারে। কেবল কিশাণমজুর সম্পর্কে রচনা হলেই নয়, তাদের শ্রেণী-স্বার্থকে সমর্থন করে রচনা হওয়া চাই। তাই তৃতীয় পর্যায়ের সাহিত্যই সত্যিকার শ্রেণী-সাহিত্য। এই শ্রেণী-সাহিত্য এক শ্রেণীর সাহিত্য হতে পারে, কিন্তু একমাত্র সাহিত্য নয়। কারণ ‘শ্রেণী’ নামক সংজ্ঞা বা categoryটা সাহিত্যবিচারে একমাত্র মাপদণ্ড নয়, একথা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। গোড়া শ্রেণীবাদীরা অপর সাহিত্যকে স্বীকার করেন না। বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহিত্যিকরা যা’ লিখে থাকেন তা যতই বাস্তব ও সত্য হোকনা কেন, তার মূলপ্রেরণা, এদের মতে, স্বার্থসিদ্ধি বই কিছু নয়। জয়েসের লেখায় যে বাস্তব ও অবিকল বর্ণনা আছে তার কারণ হ’লো, মিরস্কির (Mirsky) মতে, জয়েসের অতিরিক্ত ও অন্তায় বস্তু প্রীতি বা সম্পত্তি-প্রীতি। জয়েসের বাস্তবতার কারণ নাকি জয়েসের লুক্ক ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তি। এরই নাম মার্ক্সীয় সাহিত্যসমালোচনা! আন্দ্রে জিদ (Andre Gide) একজন নামকরা মার্ক্সীষ্ট। ১৯৩৫ সালে তিনিও লিখেছিলেন, সকল শ্রেণীকে অতিক্রম করে সকল শ্রেণী-স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান আছে সত্যিকারের সাহিত্যের। (১০) হেনরী হাজলিট

(১০) “In every enduring work of art .....one that is capable of appealing to the appetite of successive generations, there is to be found a good deal more than mere response to the momentary needs of a class or a period.”—Andre Gide.

( Henry Hazlitt ) আমেরিকার নামজাদা সমালোচক। তিনিও সাহিত্যে এই শ্রেণীমত্ততার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এমন কি ট্রটস্কী পর্যন্ত বলেছেন, “Personal lyrics of the smallest scope have an absolute right to exist within the new art.” ব্যক্তির অনুভূতি নিয়ে অনুপম সাহিত্য হয়েছে, এবং চিরদিনই হবে। শ্রেণী সত্য, শ্রেণীপ্রভাবও সত্য, কিন্তু শ্রেণীকে অতিক্রম করে মানুষ উর্ধ্বলোকে উঠিতে পারে, যে লোকে মানুষ কেবল শ্রেণী নয়, দেশ, কাল, জাতি, লিঙ্গ ও বয়স ইত্যাদি সকল গণ্ডীর বন্ধন ও সংস্কারের অতীতে স্থিতিলাভ করতে পারে। একথা হ্যাজলিটও স্পষ্টভাবে বলেছেন।

(১১) মার্সেল প্রাস্তুর লেখা ফরাসী পরিবেশের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছে এবং ইংলণ্ডে বাস করলে তার লেখার মধ্যে কিছু ইতরবিশেষ হতোই। কিন্তু তাই বলে প্রাস্তুর-এর ফরাসীত্বের দরুণ কি আমেরিকার পাঠকদের কাছে প্রাস্তুর-এর সাহিত্যিক মূল্য কমেছে কিছু? ড্রেজার ( Dreiser ) পুরুষ বলে মহিলাদের কাছে তার লেখা কিছু কম প্রিয় নয়। তেমনি জর্জ ইলিয়াট বা দেলেদার লেখা পুরুষেরা পড়বে না এমন হতে পারে না। অর্থাৎ শ্রেণী, লিঙ্গ, দেশকালের উর্ধ্বে একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে সাহিত্যিক রসের অব্যাহত থাকবার কোনই বাধা হয় না।

(১১) “The great writer with great imaginative gifts may universalise himself. If not in a literal sense, then certainly in a functional sense, he can transcend the barriers of nationality, age and sex. But certainly he can, in the same functional sense and to the same degree, transcend the barrier of classes.” ( H. Hazlitt in an article in 1932 ).

শ্রেণীর প্রভাব বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে কোন যুক্তিশীল সমালোচকই বাদ দিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে শ্রেণীকেই সাহিত্যবিচারের একমেবাধিতীয়ম্ মানদণ্ড করে দাঁড় করানোর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই নেই। ইতিপূর্বে অর্থাৎ মার্ক্সীয় সাহিত্য সৃষ্ট হবার আগেও সমালোচকেরা পারিপার্শ্বিকের ও এমন কি, শ্রেণীর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুর্থোপ্ (Courthope) তার বিখ্যাত এক প্রবন্ধে (“Poetry and the people”) শ্রেণীপ্রভাবের গুরুত্ব সম্বন্ধে লিখেছিলেন।

(১২) এমন কি, বুর্জোয়া উদারনীতির বর্তমান বিশৃঙ্খলা যে সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তিবাদের সংঘর্ষ থেকে জন্মেছে এবং তাই তদানীন্তন কাব্য যে এই বিশৃঙ্খলার ছাপ বহন করেছে, তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করা এক কথা, আর তার অন্ধ মাহাত্ম্য কীর্তন করা হলো অন্য ব্যাপার। মার্ক্সীয় সমালোচনার আতিশয্য দোষ এবং একদেশদশিতা তাই বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি ট্রটস্কীও এ সম্বন্ধে মার্ক্সীয় গোঁড়ামার তীব্র সমালোচনা করেছেন। শ্রেণীসংস্কৃতি বলে কোন বস্তু নেই, কাজেই প্রলেটারীয় সংস্কৃতি বা সাহিত্য বলেও আলাদা কিছু থাকবার কল্পনা করবার কোনই অর্থ নেই। যে শক্তি ও আনন্দের উপাদানকে মানুষ যুগে যুগে সঞ্চয় করেছে সেই সব উপাদানকে কোন বিশেষ শ্রেণীর সংস্কৃতি বলে ছাপ মেরে দেবার কোনই কারণ নেই। ইলেকট্রিসিটি, স্টীমএঞ্জিন, এরোপ্লেন, মোটর, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি হলো আধুনিক সভ্যতার উপাদান

(১২) “All through the history of England we see a tendency in the life of the nation to concentrate itself in....some particular class which becomes for the time being the sovereign power, rallies round itself all the faculties of the people.....” (Courthope).

এর মূলে বহুলোকের অবদান রয়েছে। সর্বমানবের কল্যাণে এদের ব্যবহারে ও প্রয়োগে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। তবে বর্তমান যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্য বাণিজ্য ও রাষ্ট্রে রয়েছে; তাই এসব মানব-ব্যবহার্য উপাদান কতিপয় ধনিকের দখলে ও ভোগে আটক আছে। সর্বহারাদের এতে কোন অধিকার নেই। কৃষাণ-মজুরের রাজ হলে এই যুগান্তরের ক্রমসঞ্চিত ঐশ্বর্য কৃষাণ-মজুরের ভোগেও আসবে। যা ছিলো সংখ্যালব্ধের আয়ত্তে, তা হবে অগনিতের উপভোগ্য। যে সংস্কৃতি বা সভ্যতা আজ একশ্রেণীর একচেটিয়া, সেই সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়বে সকল স্তরের মধ্যে। শুধু এই হবে পার্থক্য। কাজেই “বুর্জোয়া” বা “প্রলেটারীয়” বলে মার্ক্সমারা কোন সংস্কৃতি নেই; এ হোল শব্দের দুই প্রয়োগ মাত্র। আসল কথা, আজিকার বুর্জোয়ার অধিকৃত ও উপভোগ্য সংস্কৃতিকে আমরা চাই প্রলেটারীয়ের দখলে এনে দিতে। অনাগত বিপ্লব হবে এই হস্তান্তরের বাহক। কাজেই বিপ্লবোত্তর সংস্কৃতিকে ‘সমাজতান্ত্রিক’ বা ‘প্রলেটারীয়’ সংস্কৃতি নাম দেওয়া একান্ত নিরর্থক। অর্থ নৈতিক বা বাণিজ্যিক পরিভাষাকে সাহিত্যিক ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করলে অর্থবিভ্রাট ঘটবেই। সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে যারা রাজনৈতিক লেবেল দিয়ে খণ্ডিত করে দেখেন তারা সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা করেন। ফ্যারেলের ভাষায় “When one freezes the categories of bourgeois and proletarian and insists that they be standards of measurements in literature, one shuts out the enduring element that Gide speaks of.” এঙ্গেল্‌স্ (Engels) মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক জড়বাদকে যান্ত্রিক জড়বাদে পরিণত করেছেন, ‘বুর্জোয়া’, ‘প্রলেটারীয়’ ইত্যাদি পরিভাষাকেও কাষ্ঠকঠিন অনড় সংজ্ঞায় দাঁড় করিয়া দিয়েছেন। এর ফলে মার্ক্সবাদীরাও ‘বুর্জোয়া’ ইত্যাদি লেবেল ব্যতীত সংস্কৃতি, সাহিত্য বা সমাজ-জীবনকে

ভাবতেও পারে না। এই গোড়ামীর পথ এঙ্গলস-ই দেখিয়েছেন। তিনিই প্রথম “প্রলেটারীয় সংস্কৃতির” কথা রাজনীতি ক্ষেত্রে আমদানী করেছেন। কিন্তু এই ধরণের ভাগাভাগি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চলে না। বিশেষতঃ যে মনোভাব বুর্জোয়া সংস্কৃতি বিলীয়মান বলে নাসিকা কুঞ্চিত করে, তা কেবল বিশুদ্ধ অজ্ঞতা বই অণু কিছু নয়। প্রলেটারীয় সংস্কৃতি বলে যে নতুন সংস্কৃতির কাহিনী মার্ক্সবাদীরা প্রচার করে থাকেন তা সোনার পাথর বাটিরই মতন কল্পনার অলৌক সৃজন। ট্রটস্কির মত গোড়া মার্ক্সবাদীও একথা স্বীকার করেছেন। ডিক্টেটরী যুগের অন্তে নতুন সমাজ সংগঠন হবে শ্রেণীহীনতার ভিত্তিতে। সে যুগের সংস্কৃতি হবে সর্বমানবের সংস্কৃতি, ‘প্রলেটারীয়’ নামক শ্রেণীচিহ্নে লঙ্ঘিত সংস্কৃতি নয়। (১৩) এমন কি মার্ক্স স্বয়ংও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেণীবাদের গোড়া সমর্থক ছিলেন বলে মনে হয় না। তথাকথিত “বুর্জোয়া”-মার্ক্স বলে মার্ক্স এ যুগের ও পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যকে অগ্রাহ করেন নি; বরং সাহিত্যকে

(১৩) “There is no workers’ culture and that there will never be any and in fact there is no reason to regret this. The worker acquires power for the purpose of doing away for ever with class culture and to make way for human culture; we frequently seem to forget this. The main task of the proletariat intelligentsia in the immediate future is not the abstract formation of new culture,.....but definite culture-bearing, i.e, systematic, planful and of course, critical imparting to the backward masses of the essential elements of the culture which already exists.”

( Trotsky—Literature & Revolution. )



রাজনৈতিক মতসংঘর্ষের উর্ধ্বে রেখে তিনি অবিমিশ্র সাহিত্যরসাস্বাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। এস্কাইলাস্ (Æschylus), হোমার থেকে দান্তে, সেক্‌স্পিয়ার, সারভেন্‌টে (Cervantes), গ্যয়েটে (Goethe), হায়নে (Heine), ইত্যাদির বইগুলো তাঁর দৈনন্দিন শান্তি এবং সারাজীবনের সাস্বনার উৎস ছিল। পল লাফার্গ বলেছেন, মূল গ্রীক ভাষায় এস্কাইলাসের বই মার্ক্স অন্ততঃ বছরে একবার আগাগোড়া পড়তেন। “বুর্জোয়া” কবিতা-সাহিত্যেই ছিলো তাঁর অফুরন্ত আনন্দ। (১৪) রোমান্সের নামে আমাদের আধুনিক মার্ক্সবাদীরা আঁকে ওঠেন; কিন্তু সারভেন্‌টের ও বাল্‌জাকের (Balzac) রোমান্সগুলিকে মার্ক্স সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন; বাল্‌জাকের “La comedie Humaine” এর প্রতি তার প্রশংসা ছিলো অপারিসীম। (১৫) তাছাড়া স্কট (Scott), ফিল্ডিং (Fielding), ডুমা (Dumas) ইত্যাদিও তাঁর প্রিয় ছিলো; “Old mortality” এবং দিদেরো’র (Diderot) “Le Neveu de Rameau” কে মার্ক্স প্রতিভাদীপ্ত অসাধারণ সৃষ্টি, (masterpiece) বলে মনে করতেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতামতে এরা সবাই মার্ক্সের কাছে ঘৃণ্য reactionary মাত্র, কিন্তু সাহিত্যলোকে এরা তার কাছে নম্র প্রতিভা। এতেই প্রমাণ হয় যে সাহিত্যবিচারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা judgmentই

---

(১৪) “.....he would read A Eschylus again in the original text, regarding this author and Shakespeare as the two greatest dramatic geniuses the world had ever known, for Shakespeare he had an unbounded admiration.” (Lafargue).

(১৫) “The greatest masters of romance were for him Cervantes and Balzac....His admiration for Balzac was so profound that.....” (Riazanov).

চূড়ান্ত নয়, মূল্যবিচারে সাহিত্যের আছে নিজস্ব কতকগুলি মানদণ্ড ও আদর্শ। ফ্রান্জ্ মেহরিং ( Franz Mehring ) বলেছেন, “In his literary judgments he was completely free of all political and social prejudices, as his appreciation of Shakespeare and Walter Scott shows.....” লেনিন-পত্নী ক্রুপস্কায়ার স্মৃতি-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অবসর কালে লেনিনও এই বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল ও decadent সাহিত্য থেকেই চিরজীবন আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করে গেছেন। কিন্তু অচকার মার্ক্সবাদীরা মার্ক্সের থেকেও বেশী মার্ক্সিস্ট এবং লেনিন থেকেও বেশী লেনিনিস্ট। কাজেই ‘বুর্জোয়া’ বলতেই তাদের উদগত বিতৃষ্ণা দমন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রাণহীন আড়ষ্ট শ্রেণীবাদে এদের বিচার-শক্তি ও উপভোগ-প্রবৃত্তি উভয়কেই পঙ্গু করে ফেলেছে। ক্রুপস্কায়ার বইয়ে এর শিক্ষাপ্রদ ও আমোদজনক দৃষ্টান্ত রয়েছে! একদল কমুনিস্ট “তরুণ”কে লেনিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, “তোমরা পুশ্কিন ( Pushkin ) পড়ো?” জবাবে তরুণ মার্ক্সিস্টরা বললেন “না, না, পুশ্কিন বুর্জোয়া! আমাদের হলো মায়াকভস্কী।” লেনিন মুচকি হেসে বললেন, “আমি কিন্তু পুশ্কিনকেই বেশী ভালবাসি!” বেচারি লেনিন! গণ্ডুষ জলে ফরফরায়মান খুঁদে মাছরা চিরকাল এবং সকল দেশেই এই রকমের হয়ে থাকেন। তারা একটু অধিক আতিশয্য ব্যাধিতে ভোগেন। কিন্তু তাই বলে বৈজ্ঞানিক বিচারে আতিশয্য বা উচ্ছ্বাসের স্থান নেই।

সমাজে আজ ধনীদরিদ্রের শ্রেণীসংগ্রাম প্রখর হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যৎ সমাজে কিষণ-মজুরের স্বার্থকে জয়যুক্ত করে নতুন অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। কিন্তু তাই বলে মানুষের সংস্কৃতি ও সমস্ত সভ্যতাকে শ্রেণী-বাদের লোহার ছাঁচে ফেলে মাপতে বা গড়তে হবে, এই Nouveau-মার্ক্সীয় সমালোচনা-রীতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। একই যাহ্নদও দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই সবকিছুর সম্পূর্ণ সমাধান করা চলে না।

একটা সীমা পর্যন্ত এ নীতি কিছুটা কার্যকর হতেও পারে, কিন্তু তার পরে এ অধৈতী পদ্ধতি অচল। সমাজ ক্ষেত্রের যে পদ্ধতি বা standard তাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে ছবছ প্রয়োগ করার স্বপক্ষে কোনই লজিক নেই। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও আজ মার্ক্সবাদীরা ডায়ালেকটিক ও শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্র হাতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং “বুর্জোয়া” সাহিত্যের যুগ্ম-দণ্ডের হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু ট্রটস্কীর লেখনীতেই বেরিয়ে পড়েছে মার্ক্সীয় স্বীকৃতির সত্যভাষণ, “It is very true, one cannot always go by the principles of Marxism in deciding whether to reject or accept a work of art.” ১৯১৭ সালের পরের জগতে যে সব নতুন ঘটনাবিবর্তন হয়েছে তার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত হলো এই যে বাস্তব পরিস্থিতির চাপে মার্ক্সবাদীদের সাহিত্যিক গোড়ামীর একদিন সংশোধন হবে।

---

# পারিশিষ্ট

(১) হবহাউস-ছইলার-গিন্সবার্গ-সংকলিত-সংখ্যাতালিকা

( ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## শাসন-ব্যবস্থা

শ্রেণী	দৃষ্টান্তের সংখ্যা	বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রব্যবস্থা	নামমাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা
নিম্ন-শিকারী	৩৬	৮	১৭
উচ্চ-শিকারী	৭৫	২০.৫	১৯
কৃষিজীবী (১)	৩৭	৭	১০
পশুপালক (১)	১৬	১	২
কৃষিজীবী (২)	১১৯	৩৪	১২
পশুপালক (২)	১৬	২	•
কৃষিজীবী (৩)	৯৬	১৬.৫	•

## পারিবারিক-ব্যবস্থা

নিয়ম শিকারী	২৩	১৪	১০	২৪	২৩	১৪	৩৫	৩৬	১৫	১১	২২	৩২	১৫	১৪
উচ্চ শিকারী	১৪	১২	৪২	৬	৬৬	৬	৪১	০৭	৩	৪৪	৪৪	২৬	২৬	২৬
কৃষিক্রীষী (১)	৫.৫	৬	৩৩	৬	৭৮	৩৩	২২	৪৬	৭১	২২	২২	৭১	৭১	২২
পশুপালক (১)	৩	৬	৬৩	১১	৩৫	৭	১৩	৬৩	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬
কৃষিক্রীষী (২)	১২	৩১	৩৩	২	৬২	১৭	৬৬	৪৩	৩১	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
পশুপালক (২)	১	৬	৩৭	২.৫	৪১	০	৩৩	২৬	৩	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭
কৃষিক্রীষী (৩)	২০	২.৫২	৬৩	৭	০৬	১১	২৫	৩২	০১	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩	৪৩

মাতৃক্রমিক

পিতৃক্রমিক

ক্রয়-বিবাহ

বলপ্রয়োগে  
বিবাহ

কন্য়ার সম্মতিক্রমে  
বিবাহ

অহায়ী বিবাহ

হায়ী বিবাহ

সাধারণ সম্পত্তি  
শতকরা অংশ

ব্যক্তিগত সম্পত্তি  
শতকরা অংশ

কন্য়ার অসম্মতিতে  
বিবাহ

বহুবিবাহ

একবিবাহ

## (২) এই পুস্তকে উল্লিখিত গ্রন্থ-তালিকা

- Baldwin Mark—Social and Ethical Interpretations.  
 Barnes, H. E.—Recent Political Theories ( article ).  
 Bergson, H—Two Sources of Religion and Morality.  
 Bluntschli—The Theory of State.  
 Buckle—Civilisation of England.  
 Bukharin—Historical Materialism.  
 Cole—Social Theory.  
 Comte. A—A new programme of Sociology  
     —Sociology and action.  
 Croce—What is living and what is dead of Hegel.  
 Dewey, John—Liberalism and Social Action.  
 Durkheim—Elementary forms of Religion.  
 Ellwood—Introduction to Social Psychology,  
     —Psycho-logy of Human Society.  
 Engels—Feurbach.  
     —Origin of Family, Private Property and State.  
     —Anti-Duehring.  
 Espinas—Ancient Society.  
     —The Origin of Technuology.  
 Frazer—Golden Bough. ( Abridged Ed. )  
 Ginsberg—Studies in Sociology.  
     —Art in 'Humar Affairs'.

Ginsberg, Hob House, Wheeler—The Material Culture and Social Interpretations of the Simpler Peoples.

Gidding—The Responsible State.

Hook, Sydney—Towards Understanding of Karl Marx  
—Hegel and Marx.

Haldane, J. B. S.—Marxism and Science.

Kid, B—Social Evolution.

Kropotkin—Mutual Aid, A factor in Evolution.

Lenin—Lenin on Religion.

Lowie, R—Primitive Society.

Malinowski—Art in 'Human Affairs'.

—Crime and Custom.

Marx—Poverty of Philosophy.

—Eleven Theses on Feuerbach.

—Critique of Political Economy.

Morgan, Lewis—Ancient Society.

Muller-Lyer—Evolution of Modern Marriage.

Novicow—The Critique of Social Darwinism.

Perry—Origin of Civilisation.

Plekhanov—Fundamental Problems of Marxism.

Rivers—Social Organisation.

—History of Melanasiatic Society.

Ross—Principles of Sociology.

Russell—Freedom and Organisation.

Seal, B. N—New Essays in Criticism.

- Seligman—Economic Interpretation of History.  
Sorokin—Crime and Punishment  
—Social and Cultural Dynamics I.  
Spencer, H—Principles of Sociology I.  
Stalin—Dialectical Materialism  
—Letters of Engels.  
Toynbee, A—Study of History.  
Trotter—Instincts of Herd in Peace and War.  
Wallis—Introduction to Anthropology.  
Ward—Primitive Sociology.
-











